নারায়ণ সান্যাল

নেতাজী রহস্য সন্ধানে

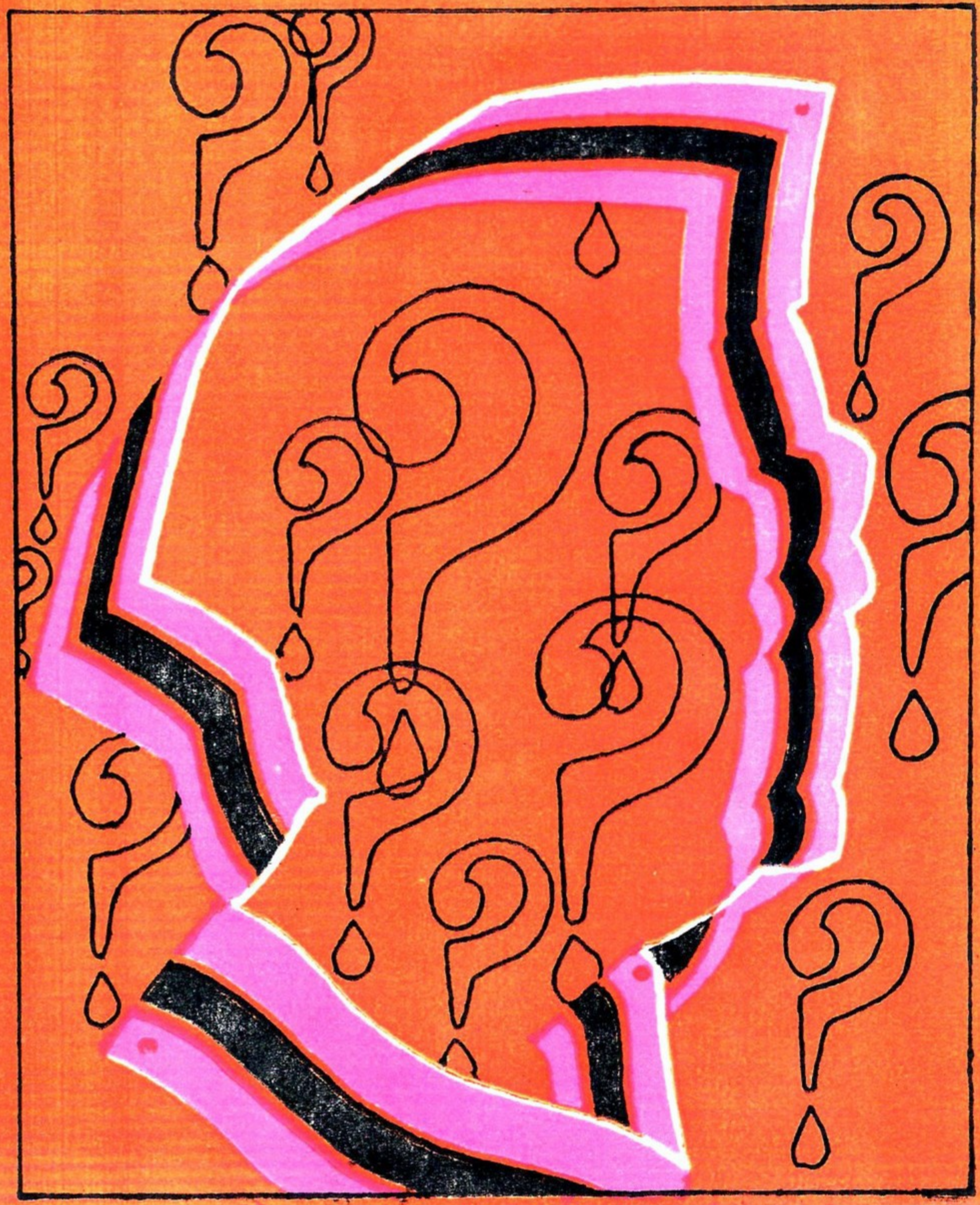

নেতাজী রহস্য সন্ধানে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা 700 073

NETAJI RAHASYA SANDHANE
A Treatise on Netaji in Bengali
by NARAYAN SANYAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 75.00

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর 1970
প্রথম দে'জ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি 1986
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর 1990
তৃতীয় (নেতাজী জন্মশতবর্ষ) সংস্করণ : মার্চ 1996
চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি 2000
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারি 2003

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী
প্রুফ নিরীক্ষা : শ্রীমতী সুচিত্রা সান্যাল, শ্রীসুবাস মৈত্র

দাম : ৭৫ টাকা

ISBN-81-7612-562-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
13 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা 700 073

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ। পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
2 চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা 700 012

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
13 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা 700 073

যুক্তি-পরম্পরার সূচী

	পৃষ্ঠা
রেঙ্কোজী মন্দিরে চিতাভস্মের বাস্তবতা নিয়ে লেখকের সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের আলোচনা	1-25
রেঙ্গুনে শেষ সপ্তাহ—নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রস্তুতি (দ্বিতীয় সপ্তাহ; অগাস্ট 45)	25-46
আইয়ারজী স্মৃতি-অনুসরণে [17.8.45 সন্ধ্যা পর্যন্ত]	46-49
এ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ	
নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু-সংবাদে ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়ার জাত নির্ণয়	51-62
লোকসভায় নেতাজী সম্বন্ধে প্রশ্ন ও জওয়াহরলালের জবাব, আইয়ারজীর জবানবন্দী (5.3.1952),	62-70
নেতাজী তদন্ত কমিটি গঠন, কমিটির সদস্য নির্বাচন	
বোম্বাইয়ের গভর্নর হরেকৃষ্ণ মহতাবের ভূমিকাধন্য হারিন শাহের গ্রন্থে মিথ্যা প্রচার	70-84
তদন্ত -কমিটির সদস্য সুরেশচন্দ্র সঙ্গে শাহ্নওয়াজের মত-পার্থক্য (1956)	84-102
17.8.45 থেকে 19.8.45 পর্যন্ত তিন দিনের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা	102-108
(1) 17.8.45—সাইগঙ ত্যাগ [আইয়ারের স্মৃতি ১০৮/কমিটির রিপোর্ট ১০৮/সুরেশচন্দ্রের মতে ১০৯/হায়াশিদার স্মৃতি ১১০]	102-104
(2) 17.8.45 তুরেনে রাত্রিবাস [কমিটির বক্তব্য ১১০/হায়শিদা-রহমান-আরাই-তাকাহাসি, নোনো, কোনো, কর্নেল সাকাই -য়ের স্মৃতি ১১০ সুরেশচন্দ্র ১১১]	104-106
(3) 18.8.45— সকালে তুরেন বিমানবন্দর ত্যাগ [কমিটি ১১২/ হায়াশিদা ১১২]	106
(4) 18.8.45– সকালে তাইহকুতে উপনীত [কমিটি ১১২/ হায়াশিদা ১১৩]	106-108
(5) 18.8.45—বেলা দুটো আটত্রিশ, তাইহকু ত্যাগ এবং তথাকথিত দুর্ঘটনা	108
18.8.45 থেকে চিতাভস্ম টোকিওতে আনয়ন পর্যন্ত	
A. বিমান-যাত্রীরা বিমানে কীভাবে বসেছিলেন? [হাবিব১১৫/নোনোগাকি ১১৬ / ক্যাঃ আরাই ১১৭/জাপান সরকার ১১৮/ চক্ষকসার ১১৯]	108-114

B.বিমানটি কত উঁচুতে উঠেছিল?
[বিভিন্ন যাত্রীর মতামত] 115
C. রানওয়ে থেকে কতদূরে বিমানটি ভেঙে পড়ে?[ঐ] 115
D.বিস্ফোরণের কোনো শব্দ শোনা গিয়েছিল কি?[ঐ] 115-116
E. বিমানটি পতনের পর কি দু-টুকরো হয়ে যায়?[ঐ] 116
F. তথাকথিত দুর্ঘটনার পর নেতাজীর
দৈহিক অবস্থা ও পোশাক [ঐ] 116-117
G.তথাকথিত দুর্ঘটনায় কে কে মারা গেলেন? 117-118
H. বিমান দুর্ঘটনার কারণ কী? 118-121
I. দুর্ঘটনার পরে কোন ফটো কি আদৌ তোলা হয়েছিল? 121-123
J. চিকিৎসা ও মৃত্যু বর্ণনা [(1) হাসপাতালে আগমন,
(2) কোন ঘরে কী ভাবে ছিলেন, (3) চিকিৎসা,
(4) মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী কি আদৌ আছে? 123-128
K. দাহকার্য —তাইহকুতে কেন?
[(1) কেন টোকিও নিয়ে যাওয়া হল না?
য়োনেজিরু নোগুচির 'সুভাষ প্রশস্তি'
(2) কোন তারিখে দাহকার্য হল? 128-142
(3) কে কে উপস্থিত ছিলেন?
(4) মহাশব শশ্মানে নিয়ে যাওয়া
(5) দাহকার্য (6) চিতাভস্ম টোকিও প্রেরণ
L. ব্রিটিশ ও মার্কিন মিলিটারী গোয়েন্দা দলের
গোপন রিপোর্ট। কয়েকটি অমিমাংসিত সংশ্লিষ্ট
প্রশ্নের বিষয়ে তথ্য ও বিশ্লেষণ 142-156
1. নেতাজীর যে হাতঘড়িটি ভুলাভাই, জওহরলালের
হাত ঘুরে শরৎ বসু পেয়েছিলেন 156-160
2. নেতাজীর সহযাত্রী বলে বর্ণিত যাঁরা মৃত
তাঁদের বিষয়ে কতদূর কী জানা গেছে? 160-164
3. স্বতঃপ্রণোদিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণে
কেন অস্বীকার করলেন কমিটি? 164-166
4. সুরেশচন্দ্র স্বাক্ষরিত মারাত্মক দলিলটিতে কী ছিল? 166-167
5. নেতাজীর সঙ্গে যে বিপুল ধনসম্পদ ছিল তার
পরিণতি। ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহের প্রবন্ধ
এবং পরিবেশিত তথ্যের বিশ্লেষণ। লেখকের 167-199
মতে নেতাজীর সম্বন্ধে শেষ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য
এবং এ বিষয়ে যুক্তি-নির্ভর শেষ কথা

নারায়ণ সান্যাল রচিত গ্রন্থ (নভেম্বর 1995 পর্যন্ত)
বিষয়ভিত্তিক

[illegible] কিশোর সাহিত্য

[illegible] 86
[illegible] 79
[illegible] 66
[illegible] 25
[illegible] 67
[illegible] 55
[illegible] – 51
[illegible] 26

[illegible]

[illegible]
[illegible] – 5
[illegible] 8

[illegible]

[illegible] 76
[illegible] 60
[illegible] 50
[illegible]
[illegible] 74
[illegible]
[illegible] – 83
[illegible] 10

[illegible]

[illegible] 32
[illegible] 33
[illegible] 39
[illegible]
[illegible] 40
[illegible]
[illegible] 38

5. চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য

অজন্তা অপরূপা — 19
কারুতীর্থ কলিঙ্গ— 29
ভারতীয় ভাস্কর্যে
মিথুন — 52
লা জবাব দেহলী
অপরূপা আগ্রা — 56
রোদ্যাঁ — 63
প্রবঞ্চক —71
Immortal Ajanta — 61
Erotica in Indian
Temples —62

6. ভ্রমণ সাহিত্য

দণ্ডকশবরী —11
পথের মহাপ্রস্থান —16
জাপান থেকে ফিরে —27

7. স্মৃতিচারণধর্মী

পঞ্চাশোর্ধ্বে —41
ষাট-একষট্টি —64
আবার সে
এসেছে ফিরিয়া—80

8. মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী

অন্তর্লীনা—18
তাজের স্বপ্ন —20
মনামী —9

9. গোয়েন্দা কাহিনী

সোনার কাঁটা —34
মাছের কাঁটা —35
পথের কাঁটা —42
ঘড়ির কাঁটা —46
কুলের কাঁটা —47
উলের কাঁটা —68
সারমেয় গেণ্ডুকের
কাঁটা —77
অ-আ-ক-খুনের কাঁটা —72
কাঁটায় কাঁটায় এক —84
কাঁটায় কাঁটায় দুই — 85
রিস্তেদারের কাঁটা — 92
কৌতূহলী কনের
কাঁটা — 93
'যাদু এ তো বড়
রঙ্গ'র কাঁটা— 94
ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর
কাঁটা —96
অভি + নী-অল'-এর
কাঁটা— 95
দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা —97
যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা — 98

10. প্রয়োগ বিজ্ঞান

Handbook of
Estimating – 12
গ্রামের বাড়ি — 54
গ্রামোন্নয়ন
কর্মসহায়িকা —53
বাস্তুশিল্প —99

11. গবেষণাধর্মী

নেতাজী রহস্য
সন্ধানে —22
চীন-ভারত লঙ মার্চ— 43
পয়োমুখম্ —73

।। কৈফিয়ৎ ।।

সচরাচর আমার গ্রন্থের প্রথম দিকে একটা করে কৈফিয়ৎ লিখে থাকি: অর্থাৎ এ বইটি কেন লিখলাম। 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে'-গ্রন্থের মুখপাতে, লক্ষ্য করে দেখছি, সে জাতীয় কোনও কৈফিয়ৎ লিখিনি। 1970 সালে রচিত ও প্রকাশিত এ-গ্রন্থের বেশ অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছে। 1985 সালে একটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর প্রকাশিত হয় দে'জ-এর প্রথম সংস্করণ '86 সালের বইমেলায়। '90 সালে আবার একটি সংস্করণ করতে হয় এবং বর্তমান নেতাজী জন্মশতবর্ষে পুনরায় একটি সংস্করণ করতে হচ্ছে।

বইটি কেন লিখেছিলাম তা গ্রন্থমধ্যেই বলেছি। ইতিমধ্যে অনেক পাঠক সাক্ষাতে এবং পত্রযোগে আমার কাছে বিগত পঁচিশ বছর ধরে জানতে চেয়েছেন আমার শেষ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মতো কোনও নতুন তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি কি না। জবাবে তাঁদের যা জানিয়েছি, তা এখানে লিপিবদ্ধ করতেই এই কৈফিয়ৎ :

আজ্ঞে না, বিগত আড়াই দশকে আমি এমন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি যা পাঠক-পাঠিকাকে নতুন করে জানাতে পারি।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের কোনও পরিবর্তন এই জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণে করা হয়নি। কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি বা বর্ণশুদ্ধি সংশোধন করা ছাড়া।

উপরে : বিমানযোগে নেতাজীর আবির্ভাব
[বাঁ হাতে গোল ঘড়ি লক্ষণীয়]
নিচে : হবিবুর রহমান কর্তৃক সংগৃহীত-নেতাজীর তথাকথিত চৌকো ঘড়ি

[illegible] ছবি।

বামে—বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণে—ভগ্নাধারের সম্মুখে কর্নেল হবিবুল্ল

বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ—তাইহোকু

[কঃ রহমান কর্তৃক শানওয়াজ কমিটিকে প্রদত্ত—ফটোগ্রাফারের নাম জানা যায় না। তাং আগষ্ট ১৯৪৫]

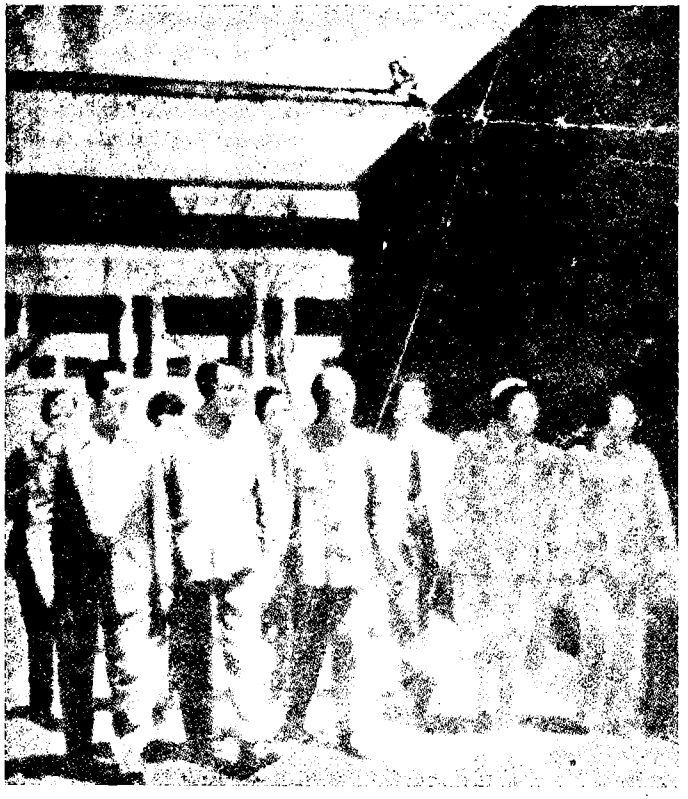

উপরে : তাইহোকুতে বিধ্বস্ত বিমান (শাহ-নওয়াজ কমিশন সংগৃহীত)
নিচে : কভিপয় ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেট (লেখক কর্তৃক সংগৃহীত)

Chinise Government delegates led by the Secretary-General of the Yunan People's Council (third from left) entering the northern Burmese town of lweje to discus border matters.

লালচীনের কতিপয় প্রতিনিধি বর্মাসীমান্তের সন্নত
সর্বাগ্রে কার ফটো ?

[লেখক কর্তৃক 1970-এ সংগৃহীত : ফটোগ্রাফারের নাম জানা যায় না।
তাং—ফেব্রুয়ারী 1956

1970 সালের দশই সেপ্টেম্বর অবশেষে এসে উপনীত হলাম আমার তীর্থপ্রান্তে। টোকিও শহরের পূর্বপ্রান্তে শহরতলি অঞ্চলে রেঙ্কোজী মন্দিরে। সঙ্গে ছিলেন বর্ষীয়সী জাপানী মহিলা মাদাম কিকুকো ইমোরি আর তরুণবয়স্ক জাপানী সাংবাদিক ইয়োইচি য়োকোবোরি। মাদাম ইমোরি মাসখানেক আগে কলকাতায় এসেছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যখন পূর্ব-এশিয়ায় ইতিহাস রচনা করেছে তখন তিনি একবার নেতাজীর প্রায় 45 জন সহকর্মীকে টোকিওতে নিজগৃহে স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্তা ইমোরি টোকিওতে অবস্থিত নেতাজী আকাদেমির প্রেসিডেন্ট। পূর্ব-এশিয়ায় নেতাজীর নানান কীর্তিসমন্বিত একটি দীর্ঘ তথ্যচিত্রের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর জমানো মার্কিন ডলার দিয়ে তিনি নেতাজীর এই তথ্যচিত্রটি ক্রয় করেছেন এবং কলকাতার নেতাজী-ভবনকে সেটি উপহার দেবার জন্য অগাস্ট '70 কলকাতায় এসেছিলেন। সেই কলকাতার নেতাজী-ভবনেই মাদাম কিকুকো ইমোরির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শিশিরকুমার বসু। সেই সূত্র ধরেই টোকিও পৌঁছে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

মাদাম ইমোরি টোকিওতে নেতাজীর স্মৃতিবিজড়িত যা কিছু আছে, প্রাচীন সহকর্মী এখনো যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের কাছে আমাকে নিয়ে যান। সব ঘুরিয়ে দেখান। শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসেন রেঙ্কোজী মন্দিরে। কিন্তু মাদাম ইমোরি ইংরাজি জানেন না। দোভাষীর কাজ করছিলেন সাংবাদিক য়োকোবোরি। তিনিও নেতাজী তথা ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী, যথেষ্ট পড়াশুনাও করেছেন। বহু পুরাতন সংবাদপত্রের কাটিং সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন দেখলাম তাঁর ফ্ল্যাট-ফাইলে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় রেঙ্কোজী মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে আমরা তিন জনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। ছোট্ট মন্দির। মন্দিরে তথাগত বুদ্ধের একটি ধ্যানীমূর্তি — মূল গর্ভগৃহের দক্ষিণপার্শ্বে একটি ছোট্ট প্রকোষ্ঠে রাখা আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত চিতাভস্ম। আকারে ঘরটি মাত্র আট ফুট বাই পাঁচ ফুট হবে — নিরতিশয় ক্ষুদ্র। একটি দরজা ও একটি জানলা। একটিমাত্র ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। টেবিলের উপর সাজানো আছে

জাপানী প্যাগোডার আকারে একটি ধাতব আধার — তার ভিতর নাকি সঞ্চিত আছে সেই অমূল্য সম্পদ। সম্মুখে একটি ধূপাধার — সে সন্ধ্যায় আমরাই একমাত্র তীর্থযাত্রী, কিন্তু আমরা আসার পূর্বেই সন্ধ্যায় কেউ ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়ে গেছে। দু'টি মোমবাতি জ্বলছিল। ভস্মাধারের একপাশে ফ্রেমে বাঁধানো সেই পরিচিত মানুষটির একটি আলোকচিত্র। দর্শনান্তে আমরা তিনজনে তিনটি ধূপকাঠি জ্বেলে দিলাম। দর্শকের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় দেখলাম যাত্রীরা অনেক কিছু লিখে দিয়ে এসেছেন। মাদাম ইমোরি খাতাখানা আমার সামনে বাড়িয়ে ধরলেন। লিখে দিলাম — 'জয়তু নেতাজী'।

উল্টেপাল্টে দেখলাম খাতাখানা। ভি.আই.পি. কারও স্বাক্ষর নজরে পড়ল না। ফ্ল্যাশ-বাল্‌ব-ওয়ালা ক্যামেরা সঙ্গে ছিল না। পনের সেকেন্ড সময় দিয়ে হাতে ধরে যে ফটোটি তুললাম ভাবিনি তাতে কিছু উঠবে, কিন্তু উঠেছিল আমার তীর্থসঞ্চয়! সে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম টোকিও শহরের উপর তখন নেমে এসেছে গোধূলির ম্লানিমা। নিয়ন-বাতির সঙ্কেত ফুটে উঠছে এখানে-ওখানে। য়োকোবোরি প্রশ্ন করলেন এবার ফিরে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত কি না।

বললাম, বিশিষ্ট অতিথিরা এখানে বসে যেসব বাণী রেখে গেছেন, মন্দির কর্তৃপক্ষের আপত্তি না থাকলে, আমি সেগুলি দেখতে চাই। আপত্তি হল না। দেখলাম। জওয়াহরলাল, সঞ্জীব রেড্ডি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ইন্দিরা গান্ধী — এঁরা কে কী লিখে গেছেন দেখলাম এবং অনুলিপি করে নিলাম।

পণ্ডিত জওয়াহরলালের বাণী লেখা আছে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ফটোতে। জওয়াহরলালেরই ফটো। তার নিচে ইংরাজিতে লেখা —

"বুদ্ধের বাণী মনুষ্যসমাজে শান্তির বারি সিঞ্চন করুক।

স্বাঃ জওয়াহরলাল নেহেরু, 13.10.57"

প্রিয় সহকর্মীর চিতাভস্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সুভাষ-বন্ধু জওহরলাল ভুলে গিয়েছিলেন বাম-দক্ষিণের দ্বন্দ্ব, ক্ষমা করেছিলেন সেই 'ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক'কে — যিনি ব্রিটিশ-ভারতের শত্রু জাপানের সহযোগিতায় যুদ্ধকালে বিব্রত ব্রিটেনকে আক্রমণ করেছিলেন। শান্তির ললিত বাণী ছাড়া আর কোন কথাই মনে ছিল না সেদিন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলালের।

পরের বাণীটি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের—কলকাতায় যাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই ইতিহাসের ছাত্রটির। দুর্ভাগ্যক্রমে সুদূর জাপানে এসেও তিনি রাষ্ট্রভাষা হিন্দির মোহমুক্ত হতে পারেননি। দুর্বোধ্য দেবনাগরী হরফে তিনি কী যে লিখে গেছেন তা ওঁরা আজও কেউ জানেন না। য়োকোবোরি তাঁর নোটবই বার করে কলম উঁচিয়ে বললেন, ঐ বাণীটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে শোনান তো!

সলজ্জে বললাম, ছাপা হিন্দি হরফ পড়তে পারি—টানা হাতের লেখা আমিও পড়তে

পারি না। আমি নিজেই বুঝতে পারছি না রাজেন্দ্রপ্রসাদজী কী লিখে গেছেন।

এর পরেরটি সঞ্জীব রেড্ডির, ইংরাজি ভাষায় : "নেতাজীর পবিত্র চিতা-ভস্মের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সৌভাগ্যে আমি ধন্য। — 4.10.58।"

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষর রেখে গেছেন 26.6.69 তারিখে। ইংরাজিতে লিখেছেন, "বুদ্ধের আলোকবর্তিকা যেন আমাদের পথ দেখায়—সত্যের পথে, শান্তির পথে, সেবার পথে পরিচালিত করে।"

✡ ✡ ✡

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আবার তাগাদা দিলেন য়োকোবোরি; জানতে চাইলেন, এবার যাবার জন্য প্রস্তুত আছি কি না।

আবার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলি, এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যেতে চাই।

মাদাম কিকুকো ইমোরি আমার ইচ্ছানুযায়ী এগিয়ে গিয়ে একজন জাপানী মহিলাকে কী-যেন বললেন। বলিরেখাঙ্কিত এই বর্ষীয়সী মহিলার মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি হল না। জবাবে তিনি কিছু বললেন। অনূদিত হলে শুনলাম, প্রধান পুরোহিত রেভারেন্ড মোচিজুকি উপাসনায় বসেছেন, সাক্ষাৎ করতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

দেরি হবে শুনে ওঁরা ইতস্তত করেছিলেন। আমিও বিপদে পড়লাম। আমার কাছে বৈদেশিক মুদ্রা অল্প থাকার অজুহাতে মাদাম ইমোরিই বরাবর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত আমি ব্যবসায়ী নই, সরকারী কাজেও যাইনি, নেহাৎই সাধারণ যাত্রী, তাই বৈদেশিক মুদ্রা আমার কাছে ছিল অতি অল্প। অর্থাভাবে কখনও কখনও অনাহারেই ভ্রমণ করতে হচ্ছিল আমাকে। ফলে মাদাম ইমোরির সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হইনি। অথচ প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই বা কেমন করে ফিরে আসব? বিপদমুক্ত হলাম য়োকোবোরির প্রশ্নে, দেরি যখন হবে তখন ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়া যাক, কী বলেন?

আমি তৎক্ষণাৎ বলি, নিশ্চয়। আমি এখান থেকে টিউব রেলে ফিরে যেতে পারব—পথের নির্দেশ আমাকে দিয়ে দেবেন দয়া করে।

য়োকোবেরি বলেন, তা হবে না। আজ রাত্রে মাদাম আপনাকে সায়মাশে নিমন্ত্রণ করেছেন। আহারান্তে আপনাকে এশিয়া সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে আমরা ফিরে যাব।

আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলি, না না । তা হবে না!

আমার আপত্তির কথাটা বুঝতে পেরে মাদাম যা বললেন তা যখন য়োকোবোরি অনুবাদ করে শোনালেন তখন বুঝলাম — মাদাম আমাকে নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করেছেন আমার অনাহারের আশঙ্কা করে নয়, একটি বিশেষ কারণে। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে আহারে নিমন্ত্রণ করছেন না আদৌ, তাঁর ইচ্ছে আমাকে নাকামুরা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়া।

— নাকামুরা? সেটা তো একটা বেকারি!

—না, বর্তমানে সেটা আর শুধু বেকারি নয়। একতলায় ও দোতলায় রেস্তোরাঁ। উপরে রুটির কারখানা।

এই নাকামুরা রুটির কারখানাতেই আশ্রয় পেয়েছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। 1916 খ্রীষ্টাব্দে। মাদাম সোমার স্মৃতিবিজড়িত সেই নাকামুরা! মাদাম ইমোরি বললেন, রাসবিহারী ভাল রাঁধুনী ছিলেন — তিনি একটি ভারতীয় ডিশ এখানে চালু করে যান। তাঁর নামে সে খাবার আজও চলে — তার নাম 'বোস কোর্মাকারি'! উনি আজ রাত্রে আমাকে তাই খাওয়াবেন।

ইতিমধ্যে য়োকোবোরি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ফিরে এসেছেন। সেই কিমোনো-পরা বৃদ্ধা জাপানী মহিলা আমাদের আপ্যায়ন করে নিয়ে এসে বসালেন পাশের একটি ঘরে। কাঠের মেঝে। আগাগোড়া মাদুর বিছানো। মাঝখানে লম্বাটে একটা নিচু কাঠের টেবিল — তার চারপাশে কুশাসন পাতা। আমরা পা মুড়ে জাপানী কায়দায় টেবিলের চারপাশে বসলাম। যে বৃদ্ধা আমাদের সে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন শুনলাম তিনি প্রধান পুরোহিতের সহধর্মিণী। তাঁর আদেশে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাদের এক পট চা ও গোটাকতক কাপ দিয়ে গেল। কাপ নয়, জাপানী বৌল। তাতে হাতল নেই। বৃদ্ধা আমাদের প্রত্যেককে বৌলে চা ঢেলে দিলেন। গরম কিন্তু র-চা। দুধ-চিনির বালাই নেই।

ঘরটাকে ভাল করে দেখতে থাকি। দেওয়ালে জাপানী ছবি। কাগজ ও সিল্কের ওপর আঁকা। হঠাৎ খেয়াল হল একটু আগে ভুল বুঝেছি,— বলেছি ঘরের মেঝেতে আগাগোড়া মাদুর পাতা। এখন লক্ষ্য করে দেখি— না ঘরের একদিকে মাদুর নেই। সেখানে কাঠের একটি নিচু মেজ, তার উপর ফুলদানিতে কিছু ফুল সাজানো। পিছনের দেওয়ালে একটি ছবি। উরুবিল্ব গ্রামে বোধিবৃক্ষের নিচে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেব। পশ্চাদপটের ঐ বুদ্ধমূর্তির অর্ঘ্যরূপেই যেন এই ফুলদানিতে রাখা আছে সামান্য কয়েকটি ফুল, একটি শুকনো গাছের ভাঙা ডাল আর কয়েকটি পাতা। চকিতে মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী' দিনলিপিতে লেখা কয়েকটি পঙক্তি—

"ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ-করা কাষ্ঠখণ্ড ঝকঝক করছে, সেই দিকের দেওয়ালে একটি ছবি ঝুলছে এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানির উপর ফুল সাজানো। ওই যে ছবিটি আছে ওটা আড়ম্বরের জন্য নয়, ওটা দেখবার জন্য। সেইজন্য যাতে ওর গা ঘেঁষে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারই ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিষকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভরতি করে দেওয়া হয়, তেমনি— কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই; ওদের জন্য থার্ড ক্লাসের গাড়ি নয়,

ওদের জন্য রিজার্ভ করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।''

আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে এ রচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে জাপানের উপর দিয়ে। শুধু হিরোশমা-নাগাসাকি নয়, সমগ্র জাপান বোমা-বিধ্বস্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল মাটিতে। কিন্তু জাপানী গৃহের অভ্যন্তরে গৃহসজ্জার সেই বিশাল ব্যঞ্জনাটি আছে অটুট। ওয়াজেদ আলী উপস্থিত থাকলে হয়তো আমার সেই মুগ্ধ দৃষ্টিটির দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'জাপানের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।'

✡ ✡ ✡

সম্বিত ফিরে পেলাম য়োকোবোরি আমার বাহুমূল স্পর্শ করায়। ইতিমধ্যে প্রধান পুরোহিত রেভারেন্ড মোচিজুকি প্রবেশ করেছেন ঘরে। আমরা তিনজনে সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন করলাম। অশীতিপর বৃদ্ধ। মুণ্ডিত মস্তক। সৌম্যদর্শন। পরিধানে—না, গৈরিক কাষায় নয়, ঢিলেঢালা একটি জাপানী কিমানো। তিনিও পা মুড়ে বসলেন চায়ের আসরে। টেনে নিলেন চায়ের একটা বৌল। মাদাম চা দিলেন। য়োকোবোরি আমার পরিচয় দিলেন জাপানী ভাষায়। আমি যে সরকারী কর্মচারী এবং পেশায় বাস্তুকার, এ-কথা য়োকোবোরি নিজেই জানতেন না, তাই আমার পরিচয় দিলেন বাঙালী সাহিত্যিক হিসাবে। জানালেন, সুভাষচন্দ্রের শেষজীবন নিয়ে আমি একটি গ্রন্থ সম্প্রতি রচনা করেছি।

হাসলেন রেভারেন্ড মোচিজুকি। আশীর্বাদ করলেন আমাকে।

য়োকোবোরিকে বললাম, রেভারেণ্ডকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি আমার কৌতূহল নিরসনের জন্য তাঁর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিবেদন করতে চাই, এতে কি তিনি বিরক্ত হবেন?

আমার প্রশ্ন অনুবাদিত হয়ে যখন জবাব ফিরে এল, শুনলাম —আমি মোটেই বিরক্ত হব না, তবে আমিও কতগুলি প্রতিপ্রশ্ন করব। আশা করি তাতে আগন্তুক বিরক্ত হবেন না। উনিই আগে প্রশ্ন করুন।

অনুমতি পেয়ে আমি একে একে নিবেদন করতে থাকি আমার প্রাণের নিরুদ্ধ আকুতি। যা জানবার জন্য বস্তুত শূন্যহাতে সহস্র সহস্র মাইল অতিক্রম করে এসে উপনীত হয়েছি এই তীর্থপ্রান্তে। নানান জাতের প্রশ্ন—

প্রশ্ন: আপনাকে এই ভস্ম কে, কবে প্রথম এনে দেন?

উত্তর : 1945 সালের শরৎকালে জাপানী সমর-দপ্তরের একজন অফিসারের সঙ্গে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক।

প্রশ্ন: তাঁরা কি তখন বলেছিলেন—এই আধারে কী আছে?

উত্তর: নিশ্চয়ই। তাঁরা বলেছিলেন, এর ভিতর ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রিয় জননেতা

নেতাজীর চিতাভস্ম আছে। আমাকে তাঁরা অনুরোধ করেন আমি যেন এটি গোপনে গচ্ছিত রাখি।

প্রশ্ন: গোপন কেন? তার পূর্বে কি নেতাজীর মৃত্যুর কথা জাপানী বেতারে ঘোষিত হয়নি?

রেভারেন্ড যেন একটু ক্ষুব্ধ হলেন আমার এ প্রশ্নে, কিন্তু শান্তভাবেই জবাব দিলেন, গোপন কেন তার জবাব দিতে পারে সমর দপ্তর। সম্ভবত ওরা আশংকা করেছিল মার্কিন সামরিক বাহিনী বিজয়গর্বে টোকিও শহরে প্রবেশ করে তাদের এক নম্বরের শত্রু নেতাজীর চিতাভস্মের প্রতি অসম্মান দেখাবে। ভারতীয় স্বাধীনতাকর্মীর প্রতি জাপানের শ্রদ্ধা ছিল এবং আছে; বোধকরি তাই এই গোপন ব্যবস্থা।

প্রশ্ন: আপনি কি চান এই চিতাভস্ম আমরা ভারতবর্ষে নিয়ে যাই?

য়োকোবোরি আমার প্রশ্নটা অনুবাদ না করে আমাকেই প্রতিপ্রশ্ন করেন, কিন্তু নিয়ে গিয়ে আপনারা কী করবেন? আপনারা জাপানীদের মত ভস্ম সংরক্ষণ করেন না। পবিত্র নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। তাই নয় কি?

আমি বলি, হ্যাঁ তাই।

— তা হলে আমার মনে হয় এ চিতাভস্মের কিছুটা অংশ আপনারা নিয়ে যান, কিছুটা জাপানেই থাক।

আমি জবাবে বলি, মিস্টার য়োকোবোরি, আমি সাধারণ যাত্রী। কোন ভাবেই আমি কারও প্রতিনিধি নই। না ভারত সরকারের, না ভারতীয় জনসাধারণের। সুতরাং এ জাতীয় আলোচনায় যোগদান করার আমার কোনও অধিকার নেই। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম রেভারেন্ড মোচিজুকির মনোগত ইচ্ছাটি কী।

এবার য়োকোবোরি আমার প্রশ্নটি অনুবাদ করলেন। জবাবে প্রধান পুরোহিত বললেন, আমি নিশ্চয়ই চাইব অপনারা এ চিতাভস্ম নিয়ে যাবেন। এ তো বস্তুত গচ্ছিত সম্পত্তি। আমি অছি মাত্র। পঁচিশ বছর ধরে আমি এটি পাহারা দিচ্ছি। তবে এ সম্পদ আমি ভারতবর্ষকে প্রত্যর্পণ করব তিনটি শর্তে।

— কী তিনটি শর্ত?

উত্তর : এক — জাপান সরকার রাজি হবেন। কারণ একজন জাপানী জঙ্গী অফিসারই এটি আমাকে রাখবার জন্য প্রথম অনুরোধ করেছিলেন।

দুই — ভারত সরকার মেনে নেবেন আমি মিথ্যাবাদী নই। সত্যই নেতাজীর চিতাভস্ম আমি গচ্ছিত রেখেছি।

তিন — ভারতবর্ষ আমাকে প্রতিশ্রুতি দেবে যে, সেখানে যখন এ চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হবে তখন একে কোন অসম্মান দেখানো হবে না।

: আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

আমি বললাম, আপনার প্রথম শর্ত সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে আমি বলব, আপনি কিছু ভুল বুঝেছেন। আপনাকে কোন ভারতীয় মিথ্যাবাদী বলেনি, বা ভাবে না। যারা মনে করে এ চিতাভস্ম আদৌ নেতাজীর নয়, তারাও বিশ্বাস করে যে, আপনার পক্ষে সে কথা জানা সম্ভবপর নয়। আপনাকে একটি আধার এনে বলা হয়েছিল যে, এতে নেতাজীর চিতাভস্ম আছে। আপনি সেটি সযত্নে রক্ষা করেছেন। এজন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আপনি প্রতিদিন নেতাজীর স্মৃতির উদ্দেশে ধূপ জ্বেলেছেন, এজন্য ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমি থামতেই উনি বলেন, আমি আপনার কাছে বস্তুত আমার তৃতীয় শর্তটির সম্বন্ধে কিছু শুনবার জন্যই প্রতীক্ষা করছি।

আমি সে প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে বললাম, আপনি কি জানেন ভারত সরকার সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি. ডি. খোসলা মহোদয়কে এ বিষয়ে একটি তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছেন?

— না! কিন্তু ভারত সরকার তো একবার তদন্ত করেছেন।

এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক খবর আমার জানা ছিল, তা নিবেদন করলাম। এ বৎসর মাত্র এগারোই জুলাই নূতন অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়েছে। রেভারেন্ড মোচিজুকি সে খবর জানতেন না দেখা গেল।

সব কথা জানিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করি, আপনি বলেছেন — এ সম্পদ আপনি গোপনে লুকিয়ে রাখবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। সে গোপনতা প্রথম কবে ভাঙল?

উত্তর: আন্দাজ উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সালে। ঐ সময় জনাচারেক আমেরিকান মিলিটারী পুলিস অথবা সিকিউরিটি-ম্যান এ মন্দিরে হঠাৎ একদিন হানা দেয়। আমাকে ডেকে বলে, তারা গোপন সংবাদ পেয়েছে যে, এখানে আমি নেতাজীর চিতাভস্ম লুকিয়ে রেখেছি। তারা জানতে চায় এ কথা সত্য কি না। আমি মিথ্যা কথা বলিনি। ওরা দেখতে চাইল। আমার বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। বাধ্য হয়ে ওদের নিয়ে গেলাম ঘরের ভিতর। ওরা অবশ্য মন্দিরে প্রবেশ করার আগে জুতো খুলেই এসেছিল।

এই প্রথম মিলিটারী পুলিসের আবির্ভাবের যে বর্ণনা পাওয়া গেল তা চমকপ্রদ। সব কথা রেভারেন্ড মোচিজুকি একাই বলেননি। তাঁর সহধর্মিণীও কিছু বলেন, কিছুটা বলেন আর এক জাপানী ভদ্রলোক। তাঁর পরিচয় জানি না, মন্দিরেরই কেউ হবেন—অথবা প্রতিবেশী। মোটকথা, কিছু পূর্বে তিনিও এসে বসেছিলেন টেবিলে এবং চায়ের আসরে যোগ দেন। আমরা আলোচনায় মগ্ন থাকায় তাঁর পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে য়োকোবোরি আমাকে দেবার সুযোগ পাননি।

ওঁদের মিলিত স্মৃতিচারণের চুম্বকসার যখন য়োকোবোরি আমাকে অনুবাদ করে

শোনালেন তখন জানতে পারলাম — মিলিটারী পুলিস যখন নেতাজীর ভস্মাধারের দিকে এগিয়ে যায় তখন রেভারেন্ড মোচিজুকি নাকি সেই আধারটিকে জড়িয়ে ধরে কিমোনো দিয়ে চাপা দেন। তিনি ভেবেছিলেন, ওরা বন্দুক উঁচিয়ে ওটা কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙল ওদের দলপতির আশ্বাসে। ওরা বলে গেল, ভস্মাধারটি ওরা নিয়ে যেতে আসেনি। বরং আরও বলে গেল, কোন বিপদের আশঙ্কা হলে রেভারেন্ড মোচিজুকি যেন ওদের সাহায্য নেন। একটি টেলিফোন নাম্বারও তারা দিয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই বাক্সের ভিতর কী আছে তা আপনি নিজে দেখেছেন?

য়োকোবোরি আমার প্রশ্ন অনুবাদ না করে বললেন — পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু যখন আসেন, অর্থাৎ 13.10.57 তারিখে, তখন আমি নিজেই উপস্থিত ছিলাম। তখন বাক্সটি খুলে নেহেরুজীকে ভিতরটা দেখানো হয়।-ওর ভিতর মানুষের মাথার করোটির অংশের কিছুটা আছে, বাকিটা ভস্ম।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমি ক্রমাগত জেরা করে যাই। অবিচলিত গাম্ভীর্যে এবং বৌদ্ধ অর্হৎ-এর স্বাভাবিক প্রশান্তিজড়িত মৃদু হাস্যের সঙ্গে রেভারেন্ড মোচিজুকি আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি তিনি।

বুঝতে পারছিলাম ক্রমে ক্রমে আমার প্রশ্নগুলি শালীনতার সীমা প্রায় লঙ্ঘন করতে শুরু করেছে; কিন্তু দুরন্ত কৌতূহলের মুখে কিছুতেই লাগাম পরাতে পারছিলাম না। ব্রিটিশ গোয়েন্দা দল এখানে এসেছিলেন কি না? কর্নেল হবিবর রহমান এখানে কবে প্রথম আসেন? তিনি কতটা বিচলিত হয়েছিলেন, কী রকম আচরণ করেছিলেন? জওয়াহরলালজি এখানে এসে কী রকম আচরণ করেন? সুরেশচন্দ্র কতটা অভিভূত হয়েছিলেন? প্রতি বৎসর এখানে তেইশে জানুয়ারী কোনও অনুষ্ঠান হয় কি না? টোকিও -বাসী ভারতীয়রা সেদিন আসে কি না? টোকিওস্থ ভারতীয় এম্ব্যাসী থেকে কেউ আসেন কি না, পুষ্পার্ঘ পাঠান কিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখন কৌতূহলের প্রচণ্ড বন্যায় প্রশ্ন করে গেছি, ভেবে দেখিনি এতে নিজের বিপদই ডেকে এনেছি আমি। সেটা বুঝতে পারলাম যখন আমার প্রশ্নবাণ শেষ হল। যখন উনি জানতে চাইলেন আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে কি না। আমি বললাম, না, নেই!

রেভারেন্ড মোচিজুকি তখন বললেন, এবার অতিথিকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই। আমারও মনে অনেকগুলি প্রশ্ন সঞ্চিত হয়ে আছে।

এ তো শর্তই ছিল। আমি এবার উত্তরদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। বর্ষিত হতে লাগল প্রশ্ন। শুধু রেভারেন্ড মোচিজুকি নন, চারজন জাপানী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ক্রমাগত তাঁদের প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে গেলেন। কে কোন প্রশ্নটা পেশ করেছিলেন তা নোটবইতে লেখা নেই। তবে প্রশ্নোত্তরগুলি সে রাত্রে হোটেলে ফিরে এসেই লিখে

ফেলেছিলাম।

আমার বেশ মনে আছে ওঁদের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে দিতে আমি ঘেমে উঠেছিলাম। ক্রমশ আমার কান গরম হয়ে উঠেছিল, একটা নিরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করছিল আমার। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ইতিপূর্বে অত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন পেশ করা আমার অন্যায় হয়েছিল। ভদ্রতা ও সৌজন্যের আচ্ছাদন আমিই নিজে হাতে ইতিপূর্বে অপসারণ করেছি; ফলে, ওঁরাও খোলাখুলি প্রশ্ন করতে আর কোন সঙ্কোচ বোধ করছেন না। ওঁদের নিরুদ্ধ কৌতূহল ওঁরা আজ নিবৃত্ত করতে চান। কিন্তু সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার ক্ষমতা আমার কোথায়? ওঁদের প্রশ্নগুলির উত্তর আমি জানি না বলে আমার কান গরম হয়নি — জানি বলেই হয়েছিল। চারজন বিদেশীর কাছে আমি ঘরের কেচ্ছা জানাব কোন মুখে? আর তথাগতের মন্দিরচত্বরে, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাছে, নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্মের অনতিদূরে বসে সজ্ঞানে অনৃত-ভাষণই বা করব কেমন করে?

জানি না, আপনারা হলে কেমনভাবে এর জবাব দিতেন।

প্রধান পুরোহিতের প্রশ্ন: আমি জানি, একশ্রেণীর ভারতবাসী বিশ্বাস করে না যে, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে আমি যে পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন যত্ন করে রক্ষা করে এসেছি তাই আসলে নেতাজীর চিতাভস্ম। এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে, ভারত সরকার যদি এই সম্পদ নিয়ে যেতে চান এবং আমি তা দিয়ে দিই — তা' হলে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, এ নিয়ে কোন 'এজিটেশান' হবে? একে কি অসম্মান দেখাবে কলকাতাবাসী?

উত্তর দিতে আমার ইতস্তত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কলকাতা ছাড়ার আগেই জেনে গেছি — বিবেকানন্দের মূর্তিতে কালি দেওয়া হয়েছে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে! বললাম, কলকাতাবাসীর অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চেতনা একটা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে আছে। এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণীই করা চলে না। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এমন কিছু কেউ করবে না যাতে নেতাজীর অসম্মান হয় — তারা নেতাজীর চিতাভস্ম বলে বিশ্বাস করুক অথবা না করুক।

প্রশ্ন: নেতাজীর অগ্রজ শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু যখন 1956 সালে এ মন্দিরে আসেন তখন নেতাজীর চিতাভস্মের সম্মুখে তিনি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। আমার স্ত্রী তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেন। প্রথম মিনিট পনের তিনি কোন কথাই বলতে পারেননি। অথচ শুনেছি যে, ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, আমার এ গচ্ছিত সম্পদ নেতাজীর পূতাস্থি আদৌ নয়। এ অসঙ্গতির কারণ কী?

উত্তরে আমি বললাম, কোন একজন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে অপর একজনের পক্ষে নির্ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে যে কথা মনে হচ্ছে তা অকপটে নিবেদন করি। সুরেশচন্দ্র এ মন্দিরে এসেছিলেন দ্বৈতসত্তা নিয়ে। এক — তিনি নেতাজীর দাদা, বসু পরিবারের প্রতিনিধি; দুই — তিনি অনুসন্ধান

কমিটির সদস্য, তিনি বিচারক। যিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি নেতাজীর অগ্রজ — তাঁর চোখের জল শুধু বসু পরিবারের নয়, সমগ্র সেন্টিমেন্টাল সুভাষদরদীর চোখের জল। তারা সেই উনিশ শ' একচল্লিশ সাল থেকে তাদের প্রিয় জননেতাকে আর দেখেনি। আর যিনি বিচার করে রায় দেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, তিনি ন্যায়াধীশ — তাঁকে চোখের জল ফেলতে নেই। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা তো আমার মনে আসছে না।

আমার এ জবাব শুনে রেভারেন্ড মোচিজুকি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তিনি কী যেন ভাবছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। তারপর প্রশ্ন করেন, জওয়াহরলাল নেহেরুও কি বিশ্বাস করতেন যে, এটা নেতাজীর পূতাস্থি নয়? নেতাজীর মৃত্যু হয়নি?

বললাম, আজ্ঞে না। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা নেতাজীর পূতাস্থি।

— আপনি বলতে পারেন কবে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন? এ মন্দির দর্শনের আগে, না পরে?

আমি বলি, ঠিক কবে ও কিভাবে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা জানি না। তবে এ মন্দিরে আসার অনেক আগেই তাঁর সে ধারণা হয়েছিল।

— আপনি কেমন করে জানলেন?

নোটবই দেখে বলি, 1952 সালে পাঁচই মার্চ তারিখে তিনি ভারতীয় লোকসভায় বলেছিলেন, "I have no doubt in my mind. I did not have it then, and I have no doubt today of the fact of Netaji Subhas Chandra Bose's death." অর্থাৎ "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ পূর্বেও ছিল না, এখনও নেই।"

— কত তারিখ বললেন?

— 1952 সালের পাঁচই মার্চ।

— আশ্চর্য! তা' হলে তার পাঁচ বছর পরে 13.10.57 তারিখে এ মন্দির পরিদর্শনে এসে তিনি নেতাজীর চিতাভস্মের সম্মুখে সামরিক বা অসামরিক কোন অভিবাদন করলেন না কেন? তিনি নিজে তো বিশ্বাস করতেন এটা নেতাজীরই চিতাভস্ম— আপনারা করুন বা না করুন।

দেখলাম চারজোড়া বিদেশী চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঢোক গিলে বললাম, বোধকরি প্রিয় সহকর্মীর চিতাভস্মের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতজী এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, লৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা তাঁর স্মরণ ছিল না।

একটা অপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ শ্রমণের মুখে। তিনি কিছু বললেন না আর।

কিন্তু মাদাম ইমোরি প্রশ্ন করেন, কিন্তু 'ভিজিটার্স বুক'-এ তিনি নেতাজীর নাম পর্যন্ত

উল্লেখ করলেন না কেন? তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করলেন না কেন?

বললাম, জওয়াহরলালজী ছিলেন অন্তরে দার্শনিক। ভারতীয় দর্শন মৃত্যুকে কী চোখে দেখে তা তো আপনারা জানেন। তাই মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি কামনা করেছেন — বুদ্ধের শরণ নিয়েছেন।

এ জবাবটা বোধকরি রেভারেন্ড মোচিজুকির মনঃপূত হল। তিনি বুদ্ধমূর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে আসে ঘরে।

সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাদাম ইমোরি প্রশ্ন করেন, কলকাতায় বা ভারতবর্ষে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের জন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন কি তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর?

কুণ্ঠিতস্বরে বলি, আমি ঠিক জানি না।

— তার মানে, নেই। থাকলে নিশ্চয়ই আপনি সংবাদ রাখতেন, যেহেতু আপনি ঐ বিষয়ে গ্রন্থ লিখছেন। কিন্তু কারণটা কী? আপনারা কি আজও বিশ্বাস করেন না যে, নেতাজীর অধীনে আজাদ হিন্দ বাহিনী সত্যি একটা স্বাধীন ফৌজ ছিল? তথাকথিত জাপানী ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই? তারা শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যই হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে?

বললাম, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। এ নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বছরে বছরে আমরা সভাসমিতি করি। তাঁদের শ্রদ্ধা-নিবেদন করি। বোধ করি ভারতীয় ঐতিহ্যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করার রেওয়াজ নেই বলেই কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়নি।

সজ্ঞানে অনৃতভাষণ করেছিলাম। য়োকোবোরি বললেন, কিন্তু নেতাজী তো নিজেই সিঙ্গাপুর সমুদ্রতটে ওদের উদ্দেশে একটি শহীদস্তম্ভ তৈরি করেছিলেন।

বললাম, জানি। সে স্তম্ভ ব্রিটিশবাহিনী সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেই উড়িয়ে দেয়।

ভাবলাম, এ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে পারা গেল। কিন্তু ঠিক তা হল না। পরবর্তী প্রশ্নটায় আবার সেই পূর্ব-প্রশ্নেরই রেশ থাকল। মাদাম ইমোরি বললেন, দিল্লীতে লালকেল্লার সম্মুখে নেতাজীর একটি মূর্তি তৈরি হয়েছে শুনেছিলাম। যখন গতমাসে ভারতবর্ষে যাই তখন লালকেল্লার সম্মুখে সেই মূর্তিটি দেখে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে সেটা দেখে আসতে পারিনি। সেই মূর্তির একটি আলোকচিত্র কি আপনি ভারতে ফিরে গিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন?

সলজ্জে বললাম, আপনি ভুল শুনেছেন। দিল্লীতে লালকেল্লার সম্মুখে নেতাজীর কোন মূর্তি তৈরি করা হয়নি। বস্তুত দিল্লীতে নেতাজীর কোন মূর্তি কোন রাস্তায় আছে বলে আমি জানি না। (বর্তমান সংস্করণে যোগ করা সঙ্গত মনে করছি — লালকেল্লার কাছাকাছি একটি রাস্তার ধারে নেতাজীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিষ্ঠা নিয়ে খোঁজ করলে হয়তো সন্ধান পাবেন।)

য়োকোবোরি বললেন, কিন্তু লালকেল্লার সম্মুখে নেতাজীর একটি মূর্তি তৈরি হচ্ছে

বলে শুনেছিলাম যেন। সে তা অনেকদিন হয়ে গেল?

বললাম, সে কথা আমিও শুনেছি। এ বছরও সংবাদপত্রে দেখেছি মূর্তি তৈরি করার প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়েছে।

ওঁরা নিজেদের মধ্যেই কী কথা যেন বলাবলি করলেন। আমি আর সাহস করে জানতে চাইলাম না ওঁদের কী আলোচনা হল।

কথাপ্রসঙ্গে মাদাম ইমোরি বললেন, গতমাসে ভারত ভ্রমণকালে তিনি কলকাতায় একটি জাপানী সিমেটেরীতে গিয়েছিলেন। তার অধ্যক্ষকে তিনি একশ মার্কিন ডলার দান করে এসেছেন, বলেছেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোন প্রাক্তন সৈনিকের পূতাস্থি রাখার প্রয়োজনে যেন সে অর্থ ব্যয়িত হয়। তাতে নাকি কবরখানার অধ্যক্ষ বলেন, 'আর আমি যদি তেমন কোন আজাদী সৈনিকের সন্ধান না পাই?' তার জবাবে নাকি মাদাম ইমোরি বলে আসেন, তাহলে এ টাকায় মদ্যপান করবেন!

অপরিচিত জাপানী ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলুন তো। আপনি বলেছেন যে, সরকারী তদন্তে দু'জন বলেছেন যে, এ চিতাভস্ম নেতাজীর, একজন তা মেনে নিতে পারেননি। তা'হলে সরকারীভাবে ভারতবর্ষ এটাকে নেতাজীর চিতাভস্ম বলে মানে, কি মানে না?

বললাম, সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এটি নেতাজীরই চিতাভস্ম, যদিও তৃতীয় বেসরকারী সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু বলেছেন এটি নেতাজীর চিতাভস্ম নয়; তাই অনেকে এ কথাটা বিশ্বাস করে না। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী এ ভস্ম নেতাজীরই।

: কিন্তু সরকার যখন মেনে নিয়েছেন তখন সরকারীভাবে নেতাজীর এ চিতাভস্মকে সম্মান জানাতে বাধা কোথায়? প্রতি বৎসর নেতাজীর জন্মদিনে ভারতীয় এম্ব্যাসী থেকে এখানে অর্ঘ্যদান করতে আসার আপত্তি কিসের?

বললাম, আমি ঠিক জানি না।

— আপনি বললেন, জওয়াহরলালজী এখানে এসে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, নেতাজীর পূতাস্থির সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা তাঁর স্মরণ ছিল না —

বাধা দিয়ে আমি বলি, দেখুন, আমি তো সে সময় উপস্থিত ছিলাম না —

আমাকে বাধা দিয়ে উনি বলেন, কিন্তু আমি তো ছিলাম! আমার স্পষ্ট মনে আছে তিনি কোনরকম অভিবাদন না করেই যখন এ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন রেভারেন্ড মোচিজুকি তাঁকে অনুরোধ করেন একটি ধূপকাঠি জেলে দিতে। উনি যেন বিরক্ত হলেন। আমরাই কাঠিটা জেলে দিলাম — কিন্তু ধূপদানিতে সেই কাঠিটি গুঁজে দেবার মতো সময়ও যেন তাঁর ছিল না। জ্বলন্ত কাঠিটা টেবিলের প্রান্তে রেখে দিয়ে তিনি হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

আবার একই কথা বলি, যে দৃশ্য আমি দেখিনি কেমন করে তার ব্যাখ্যা করব?

এতক্ষণ রেভারেন্ড মোচিজুকি যেন ধ্যানস্থ হয়ে ছিলেন। এবার সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর পণ্ডিত জওহরলালের মধ্যে সৌহার্দ্য কেমন ছিল?

বললাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওঁরা দু'জনেই ছিলেন জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর দুই প্রিয় শিষ্য। তাঁর দু'টি হাত। এক গুরুর দুই শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হতে পারে তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেন আপনারা।

অশীতিপর বৃদ্ধ মোচিজুকির দু'টি চোখ কৌতুকে নেচে উঠল যেন। তিনি জাপানীভাষায় কিছু একটা স্বগতোক্তি করলেন। ওঁরা তিনজনেই হেসে ওঠেন।

আমি য়োকোবোরিকে প্রশ্ন করি, উনি কী বললেন? য়োকোবোরি হাস্য সম্বরণ করে বলেন, ও কিছু নয়।

— কিছু নয় মানে? আপনারা সকলেই হাসছেন। আমাকেও হাসবার সুযোগ দিন।

য়োকোবোরি তখন যেন বাধ্য হয়েই বললেন, শ্রদ্ধেয় রেভারেন্ড বললেন, মহান জননেতা লেনিনের দুটি প্রিয় শিষ্য ছিল — স্ট্যালিন আর ট্রট্স্কি। তথাগত বুদ্ধই বলতে পারেন, নেতাজী আর জওহরলালের সম্প্রীতি অত গভীর ছিল কি না।

এবার আমিও হেসে উঠি উচ্চৈঃস্বরে; এবং ঐ কৃত্রিম হাসিই আমাকে সুযোগ এনে দিল সভাভঙ্গের। উঠে পড়ি আমরা। হাসতে হাসতেই বেরিয়ে আসি পথে। যদিও আসলে তখন কান্না পাচ্ছিল আমার।

কিন্তু রেঙ্কোজী মন্দিরের এই অনুসন্ধান আমার তীর্থযাত্রার শেষ ফলশ্রুতি। সে কথা সবার শেষে বলবার। আগের কথা আগে বলি :

নেতাজীর কর্মবহুল জীবনের শেষ প্রদীপ্ত অধ্যায়টি নিয়ে সম্প্রতি একটি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। পূর্ব-এশিয়ার রণাঙ্গণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর শেষ প্রচেষ্টার কথা। নেতাজীর কয়েকজন সহকর্মী আর অনুচরের অভিজ্ঞতার নিরিখে রচনা করতে চেয়েছিলাম 'প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী'। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষদর্শীরা একেবারে শেষের দিনটি সম্বন্ধে নীরব। নেতাজীর ব্যক্তি-জীবনের একেবারে শেষ দিনটিতে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন শুধুমাত্র একজন — তদানীন্তন ভারতীয় বর্তমানে পাকিস্তান-নাগরিক — কর্নেল হবিবর রহমান (সম্প্রতি প্রয়াত)। তাঁর জবানবন্দী সাধারণ ভারতীয় নিরঙ্কুশভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে ঠেকে যেতে হয়েছিল আমাকেও। বাধ্য হয়ে সে গ্রন্থের ভূমিকায় আমি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলাম :

"নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান নিয়ে প্রচণ্ড মতানৈক্য ভারতবর্ষে বিদ্যমান। পরিশিষ্টের স্বল্প-পরিসরে এ-রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শৌখিন মজদুরি হবে বলে আশঙ্কা হওয়ায় আপাতত নীরব থাকলাম। এ বিষয়টি একটি পৃথক গ্রন্থের বিষয়বস্তু হবার দাবী রাখে। জানি না, সে গ্রন্থ রচনার সৌভাগ্য আমার হবে কি না।"

ঐ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরে আমি পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে

ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করবার উদ্দেশ্যে রওনা হই। এ আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস। ফলে কোনরকম সরকারী সাহায্য আমি পাইনি। পাওয়ার কথাও নয়। না, একেবারে পাইনি বলে চলা না—সরকার সাম্প্রতিককালে বিদেশ-ভ্রমণেচ্ছু ভারতীয়দের জন্য পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা শিথিল করায় আমার পক্ষে এ বিদেশ-যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। সে যাই হোক, জাপানে 'এক্সপো' হচ্ছিল বলেই রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, হংকং, টোকিও, তাইপে প্রভৃতি যে সকল স্থানে শতাব্দীর একপাদ কাল ধরে এই রহস্যময় ঘটনার সূত্র ছড়ানো আছে সেই সব দেশে যাবার সুযোগ পাই। কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী এবং কতিপয় জাপানী আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা শুনে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে আমি তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তাঁদের সাহায্য না পেলে নিতান্ত অনাহারেই আমার এ অভিযান ব্যর্থ হত।

সে যাই হোক, আমার এই তথ্যানুসন্ধান ফলশ্রুতি বর্তমান গ্রন্থ। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে কোন চমকপ্রদ গোপন সূত্র আমি আবিষ্কার করিনি। নূতন কোন কথা শোনাব বলে দাবিও করছি না। আমি শুধু তথ্যগুলি একত্রে সাজিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে চাই। আমার সে প্রচেষ্টা সার্থক হ'ক বা না হ'ক, আশা করব, এটাকে আপনারা অন্তত 'শৌখীন মজদুরি' বলবেন না।

নেতাজীর তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কী ফল, তা এ দেশের সাধারণ পাঠক জানেন না। বিভিন্ন গ্রন্থে, বিভিন্ন রিপোর্টে, কীটদষ্ট সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সে ইতিহাস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে। দশটা-পাঁচটার কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ পাঠক এইসব বিক্ষিপ্ত রিপোর্ট সহজে সংগ্রহ করতে পারেন না। অথচ নেতাজীর সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর যে শ্রদ্ধা, যে দরদ, যে কৌতূহল, তার সীমা-পরিসীমা নেই!

অপর পক্ষে নেতাজীর এই শেষ অন্তর্ধান বিষয়টি নিয়ে একাধিক লেখক অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন সব বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছেন যাতে পাঠক আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ, আবেগবঞ্চিত এবং তথ্যনির্ভর কোন নিরপেক্ষ গ্রন্থ আমার নজরে পড়েনি। অধিকাংশ লেখকই একটা-না-একটা সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথমেই মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত করতে সওয়াল করে গেছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়েছে, এজন্যই এ পঁচিশ বছরের ভিতরে একবারও বাঙালী পাঠক নিরাসক্ত চিত্তে, নিরপেক্ষ বিচারে এ শতাব্দীর সবচেয়ে রহস্যঘন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পাননি।

তার একটি কারণও আছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও, কথাটা নির্জলা সত্য। এ পর্যন্ত যাঁরা এ অনুসন্ধানের বিষয়ে কোন গ্রন্থ বা রিপোর্ট রচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশই কোন না কোন রাজনৈতিক চেতনার বশবর্তী হয়ে এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যগুলি সংগ্রহ, গ্রন্থন এবং তা প্রকাশ করেছেন। যেন নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণিত বা

অপ্রমাণিত করাই লেখককে বেশি করে প্রভাবিত করেছে। নিজ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি আছে তাঁরা সেগুলি অবাঞ্ছনীয়ভাবে গোপন বা বিকৃত করেছেন। যেন তাঁরা বিতর্কসভায় বক্তা অথবা বিচারালয়ের আইনজীবী! সত্য উদ্‌ঘাটন নয়, মামলা জেতাই তাঁদের যেন মূল লক্ষ্য।

(তার চেয়েও লজ্জার কথা—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, সাম্প্রতিককালে ব্যক্তিগত স্বার্থেও কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, এমনকি ফটো জাল করার মতো নিম্নশ্রেণীর হস্তলাঘবতা।)

1956 সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'নেতাজী ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট'-এ অনুসন্ধান কমিটির দুজন সদস্য সর্বশ্রী শাহ্‌নওয়াজ খান ও এস. এন. মৈত্র., আই. সি. এস., যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা দেশবাসী মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। না পারাই স্বাভাবিক। সরকারী ব্যয়ে এরকম একটি রিপোর্ট যে কেমন করে ছাপা হতে পারে তাই ভেবে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান কমিটির তৃতীয় সদস্য নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন 'ডিসেন্টিয়েন্ট রিপোর্ট' বা মতান্তর বক্তব্য। তাতে তিনি বলেছেন, কোন কোন কারণে তিনি অপর দু'জন সদস্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কেন তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যু একটা মিথ্যা প্রচার। কিন্তু সে রিপোর্টেও অনেকগুলি জিজ্ঞাসার চিহ্ন অমীমাংসিত থেকে গেছে। সুরেশচন্দ্র সে কথা জানতেন এবং বস্তুত অকপটে স্বীকারও করে গেছেন। তিনজন সদস্য যেসব নথিপত্র জবানবন্দী সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা শেষ পর্যায়ে সুরেশচন্দ্রকে দেখতে দেওয়া হয়নি। যে মুহূর্তে তিনি কমিটির অন্য সদস্যদ্বয়ের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না বলে জানালেন সে মুহূর্ত থেকেই ঐসব নথিপত্র দলিল তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। ফলে তাঁর মতান্তরের রিপোর্ট স্বতই অসম্পূর্ণ। তাই উপসংহারে তিনি বলে যান:

"আমি সবিনয়ে শ্রদ্ধেয় স্বদেশবাসীকে বলব—আমার সুশিক্ষিত সহকর্মীদের রিপোর্ট বা আমার এ রিপোর্ট আপনারা গ্রহণ করবেন না। আপনারা সরকারের কাছে দাবি তুলুন — কমিটির সংগৃহীত সমস্ত নথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে। আপনারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে সেগুলি খুঁটিয়ে পড়ুন, দেখুন, বিচার করুন। তারপর যদি জনগণের রায়ে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়নি, তা'হলে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে যারা সজ্ঞানে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাঠগড়ায় তুলে বিচারের আয়োজন করুন।"

তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। কেন? সে-সব কথা যথাস্থানে নিবেদন করব। ঐ দুটি রিপোর্ট প্রকাশিত হব' পূর্বে ও পরে কয়েকজন কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 1956 সালে প্রকাশিত সাংব'

শ্রীহারিন শাহ্-এর লেখা 'ভার্ডিক্ট ফ্রম ফরমোসা — গ্যালান্ট এন্ড অফ নেতাজী' বোধ করি এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ। লেখক সাংবাদিক হিসাবে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের আমন্ত্রণে ফরমোসা দ্বীপে যাবার সুযোগ পান। তিনি তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যক্ত করেন এই গ্রন্থে। তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে চান যে, নেতাজী একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, ফরমোসা দ্বীপেই তাঁর দাহকার্য সারা হয় এবং তাঁর চিতাভস্ম টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর গ্রন্থটি সরকারী অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত।

ঐ একই বৎসরে অতঃপর প্রকাশিত হয় শাহ্নওয়াজ কমিটির সরকারী রিপোর্ট এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর প্রতিবাদ রিপোর্ট। শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন গোস্বামী একটি পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন নেতাজী রহস্য বিষয়ে। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডিশনাল স্পেশাল অফিসার, হোম অ্যান্টিকরাপশন বিভাগ। তাঁর গ্রন্থটির প্রকাশকাল গ্রন্থের কোথাও লেখা নেই। কিন্তু যেহেতু শ্রীশাহন্ওয়াজ খান তাঁর রিপোর্টে পুস্তিকাটির উল্লেখ করেছেন, তাতেই বোঝা যায় যে, সেটি 1956 সালের অগাস্টের পূর্বে প্রকাশিত।

অনেক পরে ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ইংরেজিতে কতকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন, যার সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয়ে ''নেতাজী রহস্য'' নামে একটি পুস্তিকায় (116 পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়। অতি সাম্প্রতিক কালে একজন জাপানী লেখক শ্রীতাৎসুয়ো হায়াশিদা 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু — হিজ গ্রেট স্ট্রাগল অ্যান্ড মার্টারডাম'—নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীহায়াশিদাই নাকি জাপান সরকারের নির্দেশে নেতাজীর চিতাভস্ম তাইহকু থেকে টোকিও নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাই শুধু আমাদের শোনাননি, এ বিষয়ে তদন্ত করে যা জেনেছেন তা-ও পরিবেশন করেছেন।

এই কয়টি গ্রন্থ আমাদের কাছে সহজলভ্য। এ ছাড়া মার্কিন সরকারের অনুসন্ধান রিপোর্ট, ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার গোয়েন্দাদের তদন্তের ফলশ্রুতি আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি না। তা'ছাড়া আরও কেউ কেউ এ বিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখেননি—সহজলভ্য তথ্যের উপর ইচ্ছামত রঙ ফলিয়েছেন।

উপরিলিখিত লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রী হারিন শাহ্, শাহ্ওয়াজ খান, এস. এন. মৈত্র এবং হায়াশিদা প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে 18.6.45 তারিখে। অপর পক্ষে সর্বশ্রী সুরেশচন্দ্র বসু, সৌরীন্দ্রমোহন গোস্বামী, ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ প্রভৃতির মতে নেতাজীর মৃত্যু ঐভাবে হয়নি।

আমি এ গ্রন্থে নেতাজীর তথাকথিত দুর্ঘটনা, চিকিৎসা, মৃত্যু, দাহকার্য এবং তাঁর চিতাভস্মের বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব। বিভিন্ন অনুসন্ধানকারীর পরিবেশিত তথ্য ও যুক্তি, বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিও যতটুকু সম্ভব যুক্ত করব। বিভিন্ন গ্রন্থের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-য়ে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থকে একটি সংখ্যা দিয়ে সূচিত

করেছি। পরিবেশিত তথ্যের মূল উৎস কী, বোঝাবার জন্য ব্র্যাকেট যোগে দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি পরিশিষ্ট 'ক'-অনুযায়ী গ্রন্থ সংখ্যা, দ্বিতীয়টি সেই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা। আশা করি গবেষক ও নিষ্ঠাবান পাঠক ঐ সূত্র ধরে সহজেই পরিবেশিত তথ্যের মূলে প্রবেশ করতে পারবেন। পরিশিষ্ট 'খ'-য়ে বিভিন্ন ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে সাজানো আছে। এই তালিকাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার, না-হলে কালভ্রান্তি হতে পারে।

অভারতীয়, বিশেষ করে জাপানী নামের বাঙলা বানান হয়তো আমি ঠিকমত লিখতে পারিনি। তা'ছাড়া পাঠকের পক্ষেও অপরিচিত এই নামগুলি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা হওয়ায় তাঁদের নামের একটি তালিকা, ইংরেজি বানানসমেত, পরিশিষ্ট 'গ'-তে সন্নিবেশিত করেছি। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ঐখানে যুক্ত করেছি।

পাঠককে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, সম্পূর্ণ নিরাসক্তচিত্তে প্রতিটি বিষয়বস্তুর বিচার করুন। প্রথম থেকেই কোন সিদ্ধান্তে আসবেন না, খোলা মনে কালানুক্রমিকভাবে পরিবেশিত তথ্যগুলি লক্ষ্য করে যান। কোন ভাবাবেগে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে দেবেন না। জানি, এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের মনের কোণে একটা শ্রদ্ধা-বিজড়িত ভালবাসা আছে, যার ফলে নিরাসক্ত চিত্তে এর বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সেই প্রিয় সুভাষচন্দ্রকে কেউ সজ্ঞানে ছোট করতে চাইছে, অস্বীকার করতে চাইছে, এটা অনুভব করলে আমরা নিরাসক্ত থাকতে পারি না। ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে পড়ি। তবু আমি অনুরোধ করব, এ গ্রন্থ তাঁর কাছেই সার্থক হবে যিনি নিরাসক্ত মনে সমস্ত তথ্য বিচার করতে পারবেন। অবশ্য উচ্ছ্বাসকে এড়িয়ে শুধুমাত্র তথ্যনির্ভর রচনা আমার কলম থেকে আদৌ বার হবে কিনা — সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে — এ নিয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু সেই চেষ্টাই করব আমি। এবং আশা করব, নব নব বিশ্লেষণে আপনারা সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্ত-জীবনীর শেষ পৃষ্ঠাটি লিখতে বসেছি; কিন্তু তাঁর চালচিত্রটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে ঘটনার পারম্পর্য ঠিক বোঝা যাবে না।

বর্মা রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সাহায্যে নেতাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জাপানী বাহিনীর আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হয় 1942 সালের পনেরই ফেব্রুয়ারি। নেতাজী তখন জার্মানীতে। প্রায় দেড় বৎসর পরে ডুবোজাহাজে করে নেতাজী জার্মানী থেকে সমুদ্রপথে পূর্ব-এশিয়ায় চলে আসেন এবং মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন চৌঠা জুলাই, 1943 তারিখে। 23.10.43 তারিখে নবগঠিত আজাদ হিন্দ্ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নেতাজী একটি জনসভায় আমৃত্যু সংগ্রামের শপথ নেন।

এর পর দু'টি বৎসর ধরে নেতাজীর বাহিনী তিলতিল করে এগিয়ে আসে জাপানী

বাহিনীর সঙ্গে কদমে কদমে পা ফেলে। সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন, মান্দালয়, কালেওয়া হয়ে তাঁর সেনাবাহিনী ভারত-ভূখণ্ডে প্রথম পদার্পণ করে 18.3.44 তারিখে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে নেতাজী স্বহস্তে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং ঐ দু'টি দ্বীপের নামকরণ করেন স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ।

নেতাজীর বাহিনী জাপানী বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসে আসাম সীমান্তে। ভারতভূমির দেড়শ' মাইল ভিতরে চলে আসেন তাঁরা; প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার হাত থেকে এই বিজয় বাহিনী ছিনিয়ে নেয় এবং অধিকারে রাখে। মালয় ও বর্মা প্রবাসী ভারতীয় প্রবাসীরা বাইশ কোটি টাকা দান করেছিল নেতাজীর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টায়। সমস্ত পূর্ব-এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেদিন ছিলেন মুক্তিমন্ত্রের অগ্রদূত, মুকুটহীন সম্রাট।

তারপর যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হল। জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয় হল 1945 সালের প্রথম দিকেই। ইঙ্গো মার্কিন বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সমস্ত সমর-সম্ভার ও সৈন্য অপসারণ করল পূর্ব গোলার্ধে — জাপানের বিরুদ্ধে। মুসোলিনির মৃত্যু হয়েছে, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। রাশিয়া তখনও অবশ্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ইঙ্গো-মার্কিন সমর-বাহিনীর সমস্ত চাপ এসে পড়ল জাপান ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর ওপর। পঁয়তাল্লিশ সালের প্রথম থেকেই তাই নেতাজীকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে হয়েছে।

কিন্তু তারও আগে, বস্তুত চুয়াল্লিশ সালের জুন মাস থেকেই ধরা যেতে পারে, বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, 1939 থেকে 1944-এর জুন মাস পর্যন্ত অক্ষশক্তিই ছিল প্রবল পক্ষ—তারাই আক্রমণ করেছে এবং মিত্রশক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিল আত্মরক্ষায় তৎপর। যুদ্ধের গতি মোড় নিল বস্তুত 6.6.44 তারিখে, যাকে ইঙ্গো-মার্কিন ভাষায় বলা হয় 'ডি-ডে' বা 'লঙ্গেস্ট ডে'। ঐ দিন লক্ষ লক্ষ মিত্রপক্ষের সৈন্য নর্ম্যান্ডি উপকূলে জার্মান ভূখণ্ডে পুনরবতরণ করল ডানকার্কের লজ্জাজনক পলায়নের প্রতিশোধ নিতে।

মিত্র বাহিনীর এই প্রতি-আক্রমণের প্রভাব সুদূর ইয়োরোপ থেকে এসে প্রতিফলিত হল উদয়-সূর্যের দেশে, জাপানে। এতাবৎকাল জঙ্গী জাপানের একচ্ছত্র সমরনায়ক জেনারেল তোজো পদত্যাগ করলেন 26.7.44 তারিখে অর্থাৎ 'ডি-ডে'র মাত্র একমাস কুড়ি দিন পরে। তোজোর স্থলাভিষিক্ত জাপানের প্রধানমন্ত্রী কোইসো নূতন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা আলোচনা করতে নেতাজীকে টোকিওতে আমন্ত্রণ করেন 9.10.44 তারিখে এবং সেই আমন্ত্রণ অনুসারে নেতাজী তাঁর বর্মা রণাঙ্গনের সমরোদ্যমকালে তৃতীয় বারের জন্য টোকিও উপনীত হন 29.10.44 তারিখে।

এ পর্যন্ত যা বলেছি — তা ইতিহাসের কথা — সর্বজনবিদিত। এবার যা বলব তা

নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান সংক্রান্ত রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত, যা অনুসন্ধান করে জেনেছি। ফলে এখান থেকে আমাকে একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হবে।

জাপানের নূতন প্রধানমন্ত্রী কোইসোর আমন্ত্রণ যখন হিকারী কাইকানের (আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত জাপানী দপ্তর) রেঙ্গুর-দপ্তর পান এবং নেতাজীর রেঙ্গুনস্থ সদর-দপ্তরে পাঠিয়ে দেন নেতাজী তখন রেঙ্গুনে ছিলেন না — ছিলেন সম্মুখ রণাঙ্গনে। মোমিও হাসপাতালে যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈন্যদের পরিদর্শন করে নেতাজী রেঙ্গুনের পথে রওনা হন এগারোই অক্টোবর (9/163)। রেঙ্গুনে ফিরে এসে তিনি সমর-সচিব এবং সেনাপতিদের নিয়ে এক মন্ত্রণাসভায় বসলেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারের অনেক মন্ত্রী এবং সদস্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সর্বাধিনায়কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমরাঙ্গনের তদানীন্তন পরিস্থিতি নেতাজী যে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি (7/394-97, প্রথম প্রকাশ)। নেতাজীর পরবর্তী সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা বর্ণনার একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে।

এই অধিবেশনেই নেতাজী একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন — পরবর্তী পর্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নির্দেশ দেবার জন্য একটি ক্ষুদ্র সমর-পরিষদ গঠন করা হল। অনুমান করা যায় এই সময়েই কুশাগ্রবুদ্ধি নেতাজী আশঙ্কা করেছিলেন যে, অক্ষশক্তি শেষ পর্যন্ত হয়তো বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবে। জার্মানির পতন আসন্ন — ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী পশ্চিম প্রান্ত থেকে এবং রাশিয়ান বাহিনী পূর্ব-দিগন্ত থেকে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছে। নেতাজী এ কথাও অনুমান করেছিলেন যে, জার্মানির পতনের পর ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী যখন পূর্ব-এশিয়ায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে তখন জাপানের পক্ষে সে সর্বাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করা বেশিদিনের জন্য সম্ভবপর হবে না। তোজোর পদত্যাগে সেই অশুভ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি অনেক আগেই ভবিষ্যতের ঘটনাবর্ত অনুধাবন করতে পারতেন। ফলে বেশ অনুমান করা যায়, এই সময়েই (অক্টোবর 1944) তিনি নূতন সমরক্ষেত্রের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। জাপান তাঁর সমর প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে; কিন্তু জাপানের পরাজয় হলে তাঁকে জাপানের সহযোগিতা ত্যাগ করে নূতন ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এ কথা তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় যে, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা; এবং জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে তাঁর সামরিক সম্পর্ক ততদিনই বজায় থাকবে যতদিন তিনি ওদের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিতে পারবেন।

মনে রাখা দরকার যে, এই সময়ে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণাত্মক চুক্তি বজায় ছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁর সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁর পক্ষেই তখন

অনুমান করা সহজ ছিল যে, নাৎসি জার্মানির আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে সাম্যবাদী রাশিয়া বাধ্য হয়ে হাত মিলিয়েছিল ধনতন্ত্রবাদী ইঙ্গো-মার্কিন জোটের সঙ্গে। অক্ষশক্তির পতনের পর এই আঁতাত তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। ফলে ইঙ্গো-মার্কিন দল বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতবর্ষের পক্ষে তখন সাহায্য করতে পারে একমাত্র রাশিয়া। তাই স্বতই নেতাজী তাঁর পরবর্তী কর্মক্ষেত্র হিসাবে এই সময় থেকেই রাশিয়ার কথা চিন্তা করতে থাকেন। জাপানের পতন হলে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়ে নূতন করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। বস্তুত টোকিও যাত্রা করার আগেই তাঁর অনুরাগী ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি এ কথা বলে যান যে, এখন থেকেই রাশিয়ায় গিয়ে নূতন করে সমরোদ্যমের কথা চিন্তা করার সময় হয়েছে।

নেতাজীর রণনীতি যে একটা মারাত্মক মোড় নেবে এ কথা অনুমান করেই তিনি ঐ সময়ে তাঁর সমর দপ্তরকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন। বস্তুত তৃতীয় এবং শেষবার টোকিও'র পথে যাত্রা করার পূর্বেই তিনি রেঙ্গুনের সেই গোপন সভায় তাঁর সমর-পরিষদকে ঢেলে সাজালেন এবং সংক্ষিপ্ত আকার দিলেন। জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত হয়ে রাশিয়ার দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা তিনি সঙ্গোপনে রেখেছিলেন। তাই তাঁর সমর-পরিষদকে সংক্ষিপ্ত করে মাত্র একাদশজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়ে তিনি দ্রুত সমর-পরিষদ গঠন করেন। এই দ্বাদশজন সভ্য হচ্ছেন:

(1) মেজর জেনারেল জে. কে. ভোঁসলে।

(2) মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি।

(3) মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি। চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবৃত হবার পর মেজর জেনারেল কিয়ানি নবগঠিত সমর-পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন।

(4) মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ। ইনি সাময়িক আজাদ হিন্দ্ সরকারের একজন সচিব ছিলেন। চুয়াল্লিশ সালের শেষের দিকে যখন নেতাজী দুই মাসকাল টোকিওতে অবস্থান করেন তখন তিনি তাঁর স্থলে সাময়িকভাবে সর্বাধিনায়কের কাজ করেন।

(5) কর্নেল ইশান কাদির।

(6) কর্নেল হবিবর রহমান—নেতাজীর শেষ বিমানযাত্রায় একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী হিসেবে এঁর কিছু পরিচয় প্রয়োজন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি ছিলেন ক্যাপ্টেন। মীরপুর জেলার এক বিখ্যাত মুসলমান রাজপুত বংশে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন 'অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলের' কম্যান্ডান্ট। কর্নেল হবিবর তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বলতেন 'জিনা হ্যায় তো মরনা শিখো', অর্থাৎ 'বাঁচতে হলে মরতে শেখো'। শাহনওয়াজ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন: 'নেতাজী যেসব অফিসারকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন কর্নেল হবিবর

তাঁদেরই একজন। ধীর, স্থির তাঁর স্বভাব—অথচ পর্বতের মত দৃঢ়। নেতাজীর প্রতি ছিল তাঁর অন্তহীন শ্রদ্ধা এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক নিঃস্বার্থ কর্মী।' (8/519)

নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার ইনি তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শী। বিভিন্ন সময়ে এঁর জবানবন্দীর প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। এ গ্রন্থে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনি স্বাধীন ভারতের নাগরিক নন—পাকিস্তানের নাগরিক। আমৃত্যু ইনি একই কথা বলে গেছেন।

(7) কর্নেল গুলজারা সিং।

(8) মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান—শাহ্‌নওয়াজ রিপোর্টের নিয়ামক হিসাবে এঁরও বিস্তারিত পরিচয় আমাদের জানা থাকা দরকার। কর্নেল গুলজারা সিং-এর মতো ইনিও একটি বিগ্রেড পরিচালনার দায়িত্ব পান—সেটি সুভাষ বিগ্রেড। শাহ্‌নওয়াজ খানও ছিলেন ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান বাহিনীতে। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় তিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন। আত্মজীবনীতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনপুরুষ ধরে তাঁরা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান বাহিনীতে চাকরি করেছেন। প্রথম যুগে ব্রিটিশ-বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল — এবং তিনি তাঁর বন্ধুদের আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান না করবার জন্য পরামর্শ দেন। পরে তিনি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে যোগদান করেন এবং প্রথমে সুভাষ বিগ্রেড পরিচালনা করেন। আরও পরে চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবরে যখন প্রথম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানিকে নূতন সমর-পরিষদের সেক্রেটারি-জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় তখন প্রথম ডিভিশনকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় এই শাহ্‌নওয়াজের ওপর। 17.5.45 তারিখে ইনি ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। 14.6.45 তারিখে দিল্লীতে প্রেরিত হন। সহস্র সহস্র আজাদী সৈনিক ও অফিসারের ভিতর যে তিন জনের বিরুদ্ধে লালকেল্লায় ব্রিটিশ সরকার বিচার শুরু করেন ইনি ভাগ্যক্রমে সেই তিন জনের অন্যতম। ফলে তাঁর চেয়ে যাঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন — তাঁদের চেয়ে শাহ্‌নওয়াজ খান ভারতবর্ষে সমধিক বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ভোঁসলে, চ্যাটার্জি, কিয়ানি ভ্রাতৃদ্বয়, লোগনাথন, আজিজ আহম্মদ, নাগর, আল্লাগাপ্পান, মালিক প্রভৃতি সমরনায়কেরা স্বাধীন ভারতবর্ষে সে সম্মান পাননি, যা পেয়েছেন এই ভাগ্যবান। পরে কংগ্রেসের টিকিটে ইনি লোকসভার সদস্য হন এবং যে সময়ে তাঁকে নেতাজী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় সেই সময় তিনি ছিলেন পরিবহন ও রেলমন্ত্রীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি। রিপোর্টটি লেখার পরে ইনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

(9) কর্নেল আই. জে. কিয়ানি।

এই নয়জন সামরিক সদস্য ছাড়া দু'জন অসামরিক সদস্য গৃহীত হয়েছিলেন সমর-

পরিষদে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীরাঘবন ও শ্রীপরমানন্দ। স্বয়ং নেতাজীকে নিয়ে সদস্য সংখ্যা দ্বাদশজন।

এই নবনির্বাচিত একাদশজনের ওপর সমর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে নেতাজী জাপানের নূতন প্রধানমন্ত্রী কোইসোর আমন্ত্রণে টোকিও যাত্রা করেন 29.10.44 তারিখে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিনজন সামরিক অফিসার --- মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি, মেজর জেনারেল কিয়ানি এবং কর্নেল হবিবর রহমান।

এই সময়েই যে নেতাজী জাপানের পরাজয়ের আশঙ্কা করছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাশিয়ার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন তার সন্দেহাতীত প্রমাণ এই, যে, এই যাত্রাপথে নেতাজী সাংহাইতে একরাত্রি অবস্থান করেন এবং সেখানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কর্ণধার তথা আই. এন. এ.-র উপদেষ্টা আনন্দমোহন সহায়জীকে বলেন (1/6) যে, আনন্দমোহনজী যেন টোকিওতে তদানীন্তন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত মিঃ জ্যাকব মালিকের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রয়োজনবোধে নেতাজীর রাশিয়া গমনের পথ যেন সুগম করে রাখা হয়।

নেতাজী স্বয়ংই টোকিওতে যাচ্ছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, তা'হলে তিনি স্বয়ং কেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বললেন না, কেন আদেশ করলেন আনন্দমোহন সহায়কে?

তার সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, আনন্দমোহন সহায়জী দীর্ঘকাল টোকিও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন এম্ব্যাসিতে তিনি সুপরিচিত। নেতাজীর টোকিও অবস্থানকালে তাঁর গতিবিধি থাকবে সুনির্দিষ্ট। জাপানের সঙ্গে তখনও তিনি চুক্তিবদ্ধ। যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তখন জাপানের অনাক্রমণাত্মক চুক্তি বহাল ছিল এবং কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিল অটুট — তবু রাশিয়া সে সময় মিত্রপক্ষের অংশীদার। তাই নেতাজীর পক্ষে স্বয়ং এ প্রস্তাব নিয়ে রাশিয়ান এম্ব্যাসিতে যাওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল না। নেতাজীর আদেশক্রমে আনন্দমোহনজী টোকিওতে যান এবং জাপানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শিগেমিৎসু এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ওজেওয়ার সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু উভয়েই তাঁকে বলেন, সেই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে রাশিয়ান এম্ব্যাসির দ্বারস্থ হওয়া বৃথা। ফলে শ্রী সহায় টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর ফিরে এসে তাঁর ব্যর্থ অভিযানের কথা নেতাজীকে নিবেদন করেন।

উপরিলিখিত সংবাদটি পাচ্ছি শাহ্‌নওয়াজ খানের রিপোর্টে (1/7)। পয়লা ও তেসরা মে, ছাপান্ন সালে সাইগনে অনুসন্ধান কমিটির কাছে আনন্দমোহনজী যে জবানবন্দী দেন তাতেও এ খবরটি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি সন্দেহের অতীত।

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাসেই নেতাজী রাশিয়ায় আশ্রয় নেবার কথা শুধু কল্পনাই করেননি, তাকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগীও

হয়েছিলেন।

আনন্দমোহনজীর ব্যর্থতার পরে নেতাজী অন্যভাবে যে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করতে ব্রতী হয়েছিলেন তারও প্রমাণ আছে। এ তথ্যটি পাচ্ছি 5.4.56 তারিখে প্রদত্ত শ্রীদেবনাথ দাশের জবানবন্দীতে। অনুসন্ধান কমিটির কাছে শ্রীদাশ জানান যে, নেতাজী সাময়িক আজাদ হিন্দ্ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সরকারীভাবে জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর তরফে রাশিয়ান এম্ব্যাসির সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে। পঁয়তাল্লিশ সালের জুন মাসে জাপান সরকার এই প্রস্তাবের জবাবে জানায়: "নিষ্ক্রিয় সরকার মনে করেন যে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে আপনার বিষয়ে যোগাযোগ করার সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত এবং তাই জাপান সরকার এ কাজে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছেন।"(1/7)

শ্রী দেবনাথ দাশ তাঁর জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে নেতাজী একাধিক বিকল্প পথের চিন্তা করেন। প্রথমত, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন এবং ভারতীয় বাহিনীর ভিতরে একটি সর্বাত্মক বিপ্লবের চেষ্টা করা —অর্থাৎ মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন প্রভৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে ধরনের চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, নেতাজী কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সমেত কম্যুনিস্ট চীনের ইয়েনান অঞ্চলে আত্মগোপন করবেন এবং নূতন ঘাঁটি স্থাপন করবেন। তৃতীয়ত, সরকারী বা বেসরকারী জাপানী সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন।

এই তৃতীয় পন্থাটি নেতাজীর বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনি রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার চেয়ে মাঞ্চুরিয়ায় যাওয়ার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। মাঞ্চুরিয়ার দূরত্ব অল্প — বিমানযোগে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র। তাই মাঞ্চুরিয়া তখন জাপানী বাহিনীর করতলগত। ফলে নেতাজীর পক্ষে সেখানে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অথচ জাপান যদি পরাজিত হয় তাহলে মাঞ্চুরিয়া নিঃসংশয়ে রাশিয়ান বাহিনী অধিকার করে নেবে—ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী নয়। ফলে নেতাজী সহজেই রাশিয়ান সমরনায়ক তথা রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। সম্ভবত তিনি প্রথমে বন্দী হবেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দিলে এবং তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে সাম্যবাদী রাশিয়া নিশ্চয় তাঁকে আশ্রয় দেবে। এই বিশ্বাসে ঐ সময় থেকেই তাঁর দৃষ্টি মাঞ্চুরিয়ার দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল।

নেতাজী এই সময়ে শ্রীদেবনাথ দাশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান যেন তাঁর আত্মগোপনের সংবাদ পেলেই শ্রীদাশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আত্মগোপন করেন এবং গোপন ঘাঁটি থেকে নেতাজীর নির্দেশে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যান। বস্তুত বেতার সঙ্কেতের 'ওয়েভ-লেংথ' পর্যন্ত তিনি শ্রীদাশকে জানিয়ে যান। যথাসময়ে এ আদেশ

শ্রীদাশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

আপাতত আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মাঞ্চুরিয়ায় আত্মগোপনের পরিকল্পনা বহু পূর্ব থেকেই নেতাজী করেছিলেন। তার প্রমাণ অনুসন্ধান কমিটির কাছে দেওয়া শ্রীদেবনাথ দাশের জবানবন্দী (সাক্ষী 2, নয়াদিল্লী, 5 4 56)।

নেতাজীর আত্মগোপনের কথাই এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু তাঁর কেন্দ্রীয় সমর দপ্তর কোথায় থাকবে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনি। সে সিদ্ধান্তও এই একই সময়ে গৃহীত হয়। এ তথ্যটি পাচ্ছি অনুসন্ধান কমিটির কাছে পরিবেশিত জেনারেল ইসোডার জবানবন্দীতে (সাক্ষী 35, 10.5.56, টোকিও)। জেনারেল ইসোডা ছিলেন হিকারী কাইকানের প্রধান। হিকারী কাইকান হচ্ছে জাপান সরকার ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের মধ্যে সংযোগকারী সংস্থা। জাপান সরকারের সঙ্গে নেতাজীকে যোগাযোগ করতে হত এই হিকারী কাইকান মারফৎ।

জেনারেল ইসোডা বলেছেন, প্রথমত স্থির হয়, আজাদ হিন্দ্ সরকারের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি সাংহাইতে অপসারিত হবে। সাংহাই থেকে মাঞ্চুরিয়ার বিমানবন্দর দাইরেন খুব কাছে। কিন্তু নানান কারণে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সম্ভবত এতে জাপান সরকারেরই আপত্তি ছিল কারণ নিপ্পন সরকার মনে করতেন যে, নেতাজী যদি তাঁর দপ্তর অতটা উত্তর-পূর্বে অপসারিত করেন তবে সেখান থেকে বর্মায় যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ্ সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করা নেতাজীর পক্ষে কঠিন হবে।

তাই দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব হল যে, নেতাজী তাঁর কেন্দ্রীয় দপ্তর বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দক্ষিণে অবস্থিত সাইগনে অপসারিত করবেন। সাইগন থেকে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন নিকটবর্তী এবং জাপানী সমর দপ্তরের দক্ষিণ-পূর্ব কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক কাউন্ট তেরাউচির সদর দপ্তরও তখন ছিল এই সাইগনে। নেতাজীর ইচ্ছানুযায়ী আরও স্থির হয়েছিল যে, সাইগনে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি স্থাপিত হলে তার দু'টি শাখা অফিসও খোলা হবে — একটি সাংহাইতে, দ্বিতীয়টি পিকিং অথবা উত্তর-চীনের অন্য কোনও শহরে।

উত্তর-চীনে শাখা অফিস খোলায় নেতাজী উদগ্রীব ছিলেন শুধু মাত্র এই কারণে যে সেখান থেকে তাঁর পক্ষে রাশিয়ান ভূখণ্ডে যোগাযোগ করা সহজতর হবে। জাপান সরকার এই প্রস্থাবেও প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল। ইঙ্গো-মার্কিন জোটের বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে নেতাজীর কোনও যোগাযোগ সংস্থাপিত হ'ক এটা জাপান সুনজরে দেখত না। কিন্তু জেনারেল ইসোডা তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে, তিনি যখন নেতাজীর মনোবাঞ্ছার কথা বিশদভাবে জাপান সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন তখন জাপানের আর আপত্তি রইল না। তিনি বলেছিলেন যে, নেতাজী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাপানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে ও সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুত; কিন্তু যেহেতু তাঁর মৌল লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা, তাই প্রয়োজনবোধে একেবারে শেষ সময়ে যাতে তিনি রাশিয়ার আশ্রয় নিয়ে নূতন করে সেই

স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন, তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা। মোটকথা এতে জাপান রাজি হল মে মাসের মাঝামাঝি।

মনে রাখতে হবে, মে মাসের মাঝামাঝি বলতে আমরা সেই সময়ের কথা বলছি, যখন ব্রিটিশ বাহিনী মৈখটিলার পথে রেঙ্গুন শহর দখল করেছে। নেতাজী রেঙ্গুন শহরে তাঁর সৈন্যদলের পাশেই ছিলেন প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত। 24.4.45 তারিখে তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন, শহরের পতনের বস্তুত ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্বে। মে মাসের মাঝামাঝি তিনি পদব্রজে ব্যাংককে চলে আসেন।

ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে ফিরে যান 18.6.45 তারিখে। পাঁচ সপ্তাহ তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেতারে ভারতীয় জননেতা — বিশেষ করে গান্ধীজী, জওয়াহরলাল ও আজাদকে সাবধান করে অনুরোধ করেছিলেন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে, ভিক্ষালব্ধ 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস' গ্রহণ না করতে। 8.7.45 তারিখে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর শহীদদের জন্য একটি শহীদস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তরও তিনি স্থাপন করেন।

উপরিলিখিত পরিকল্পনা অনুসারে তিনি কেন্দ্রীয় দপ্তর সাইগনে অপসারিত করার প্রাথমিক ব্যবস্থাও করতে থাকেন। এই সময়ে প্রদত্ত নেতাজীর বক্তৃতায় দেখতে পাই তিনি দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিদের সেই দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়, দ্বিতীয়টি সফল হয়নি। নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনী বর্মা মালয়-আসামের অরণ্যে যে রক্তদান করেছে তা ব্যর্থ হতে পারে না, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এরপর ভারতবর্ষকে নিজ অধিকারে রাখতে পারবে না, যুদ্ধে সে জয়লাভ করুক বা না করুক। অনতিবিলম্বেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুই বৎসরের মধ্যেই বস্তুত ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল।

যে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় সেটি এই — নেতাজী সিঙ্গাপুর থেকে এই সময়ে বক্তৃতায় বলেন যে, জার্মানির পতনের পর ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী সর্বশক্তি দিয়ে যখন জাপানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন অন্তত ছয় মাস কাল জাপান সে আক্রমণ প্রতিহত করবে। তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল না হবার একটিমাত্র কারণ। নেতাজীর পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভবপর ছিল না যে, তাঁর বক্তৃতাদানের এক মাসের মধ্যেই মার্কিন ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলবেন। মার্কিন বোমারু বিমান থেকে হিরোশিমায় বোমা বর্ষণ করা হয় 6.8.45 তারিখে এবং তার চারদিন পরে 10.8.45 তারিখে রাশিয়া তার অনাক্রমণাত্মক চুক্তি অগ্রাহ্য করে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বেশ অনুভব করা যায় যে, এই দুইটি আকস্মিক দুর্ঘটনা নেতাজীর পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়। যদি তিনি কয়েক মাস সময় পেতেন তা'হলে সহজেই তাঁর কেন্দ্রীয়

দপ্তর সাইগনে অপসারিত করে আনতেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতাদের পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে আত্মগোপনের আদেশ দিয়ে কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শাখা-অফিস সাংহাই অথবা পিকিঙে চলে যেতেন। সেখান থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মাঞ্চুরিয়া তথা রাশিয়ায় গিয়ে নূতন করে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করতেন।

কিন্তু তা হল না। হিরোসিমায় বোমা বিস্ফোরণের নয় দিন পরে এবং রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র পাঁচ দিন পরে জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। নেতাজীর পরিকল্পনা এই আকস্মিক আঘাতে ব্যর্থ হয়ে গেল।

2.7.45 তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুর থেকে সেরামবাম আসেন। "কথা ছিল দু'দিন পরেই উনি ফিরে আসবেন; কিন্তু বিশেষ কারণে বেশ কিছুদিন সেরামবামে আটকে গেলেন উনি। সেও এক করুণ অধ্যায়। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার একটি চীনা নারী গোয়েন্দার মোহবিস্তারের শিকার হন। কতকগুলি সামরিক তথ্য ঐ নারী-গোয়েন্দা মারফত শত্রুপক্ষে চলে যায়। গোয়েন্দা আর অফিসার দু'জনেরই গোপন সামরিক বিচার হয়। তিনজন বিচারক ছিলেন সেই সামরিক কোর্ট-মার্শালে। মেজর জেনারেল আলাগাপ্পান, কর্নেল নাগর আর হবিবর রহমান। নেতাজী স্থির থাকতে পারলেন না। কারণ শোনা গেল, জাপান সরকার নাকি ওঁদের ওপর খুব চাপ দিচ্ছিল চীনা মেয়েটিকে জাপানের হাতে ছেড়ে দিতে। জাপানের বক্তব্য প্রাঞ্জল — বিশ্বাসঘাতক আজাদী সেনাপতির বিচার আজাদ হিন্দ্ অফিসার করে করুক; মেয়েটি ভারতীয় নয়; জাপানের সমর প্রচেষ্টায় সে বাধা দিয়েছে, তার বিচারকর্তা নিষ্পন্ন সরকার।

যুক্তি প্রাঞ্জল, কিন্তু 'মানুষ' নেতাজী এই সামরিক যুক্তিটিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। গুপ্তচরটি যদি নারী না হয়ে পুরুষ হত, তা'হলে তিনি এতটা বিচলিত হতেন না। কিন্তু দেশী হক, বিদেশী হক, সে যে নারী, এই কথাটাই তিনি ভুলতে পারছিলেন না। সর্বনাশা খেলায় সে আমাদের যত ক্ষতিই করে থাক, তবু সে মেয়ে — জননীর জাত। সম্ভবত নেতাজীর আশঙ্কা ছিল জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিলে মেয়েটিকে প্রাণের চেয়ে কিছু বেশি দিতে হত। আর তাতেই তাঁর আপত্তি। তাই তিনি নিজে ছুটে গিয়েছিলেন সেরামবামের সামরিক বিচারসভায়।" (7/188)

উপরের ঐ উদ্ধৃতি আমারই পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে। পুনরুক্তি করতে হল একটি বিশেষ কারণে। এই সঙ্কটময় সময়ে, যখন প্রতিটি মিনিট মূল্যবান, তখন 25.7.45 থেকে 10.8.45 পর্যন্ত দীর্ঘ ষোলো দিন নেতাজী ব্যস্ত ছিলেন একটি বিদেশী মেয়ের মর্যাদা রক্ষার্থে। এই দীর্ঘ সময় যদি তিনি সেরামবামে আটকে না থাকতেন তাহলে হয়তো তাঁর পক্ষে কেন্দ্রীয় দপ্তর সাইগনে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হত এবং তিনি তাঁর শেষ নিরুদ্দেশ যাত্রার আরও অনেক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম হতেন। পাঠক বিচার করে দেখবেন, নেতাজী নিতান্তই যদি আত্মগোপনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে তার

পরোক্ষ কারণ কি একটি বিদেশী নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা?

সে যাই হোক, এই সেরামবামে থাকতেই নেতাজী 10.8.45 তারিখে সংবাদ পেলেন যে, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান রহস্যভেদ; কিন্তু প্রসঙ্গত যাঁরা নেতাজীর দুর্বার চরিত্রটিকে জেনে নিতে চান তাঁরা এই দুঃসংবাদ নেতাজী কেমন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা পড়ে দেখতে পারেন (6/47 এবং 7/689-700)।

12.8.45 তারিখে সমস্ত দিন মোটরযোগে নেতাজী সেরামবাম থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন।

চারদিন তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন। বারই অগাস্ট তারিখ সন্ধ্যা থেকে ষোলই অগাস্টের সূর্যোদয় পর্যন্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিয়ে বারে বারে গোপন-বৈঠকে বসেছেন। চৌদ্দ তারিখ সন্ধ্যায় ঝাঁসির রানী বাহিনীর মেয়েরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। নেতাজীকে ঐ দিনই বৈকালে একটি দাঁত তুলে ফেলতে হয়। তবু অসুস্থ শরীরে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন ঐ নাট্যোৎসবে। নাটক যখন অভিনীত হচ্ছে তখনই এসে উপস্থিত হলেন আজাদ হিন্দ্ সরকারের আইন-সদস্য শ্রী এ. এন. সরকার। তিনি ব্যাঙ্কক থেকে সোজা প্লেনে করে এসেছেন এবং বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে। নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীসরকার জাপানের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তৎসংক্রান্ত পরিণতির বিষয়ে একটি বিশেষ গোপন সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। নেতাজী কিন্তু অভিনয় চলা কালে সে বিষয়ে কোনও আলোচনা করলেন না।

অভিনয় শেষে নেতাজীর বাঙলোতে বসল পরামর্শ সভা। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীআইয়ারের গ্রন্থে দেখছি, ঐ সভায় নেতাজী ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। কোন্ যুক্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাও আইয়ারজী বলেছেন।

পনের তারিখে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক দুই বৎসর আগের দিনটিতে নেতাজী কর্নেল স্ট্র্যাচি আর মালিককে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটে একটি শহীদস্তম্ভ তৈরী করার আদেশ দান করেন। শহীদস্তম্ভের মডেলও তিনি অনুমোদন করে যান। "সময় অত্যন্ত কম। এ কাজ আদৌ শেষ হবে কিনা কেউ বুঝতে পারেনি। জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, ব্রিটিশ বাহিনী হয়তো দিন পনের'র মধ্যেই সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করবে, তার আগেই যদি এই স্মারক-স্তম্ভটি সমাপ্ত করা না যায় তবে ব্রিটিশ অধিকৃত মালয় উপদ্বীপে সেটিকে আর কোনদিনই তৈরী করা যাবে না। অথচ ব্রিটিশ বাহিনীর আগমনের পূর্বেই যদি এটি সমাপ্ত করা যায় তাহলে সেটাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে বিজয়ী ইংরেজ; কারণ সভ্যজগতের এই রীতি — আন্তর্জাতিক আইনই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক সৌজন্যও

বলে বিজিত জাতির শহীদ মিনারের প্রতি অসম্মান দেখানো ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কবরের ওপর পদাঘাত করতে নেই।"

এ সৌজন্যের আইন জানা ছিল আই. সি. এস. সুভাষচন্দ্রের এবং এঞ্জিনিয়ার স্ট্রাচির।

দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের আদেশে এই শহীদ মিনারটিকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত 1949 সালের নভেম্বর মাসে যখন বোম্বাই শহরে প্রাক্তন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈনিকেরা চতুর্থ সম্মেলনে মিলিত হন তখন একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁরা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরুকে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তাতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছিল লালকেল্লার সম্মুখে নেতাজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং লালকেল্লার অভ্যন্তরে — সম্ভব হলে দেওয়ান-ঈ-আম চত্বরে — সিঙ্গাপুরের সেই বিধ্বস্ত শহীদ বেদীর অনুকরণে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অনামা শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হোক। সে অনুরোধ আজও রক্ষিত হয়নি। জওয়াহরলাল অবশ্য স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে মালয় ভ্রমণকালে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের সেই সমুদ্রতটে এসেছিলেন। ঐ বিধ্বস্ত শহীদ বেদীর পাদমূলে তাঁরা দু'জনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনও করেছিলেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, শুধু বলব এতে কিছু কিছু প্রাক্তন আজাদী সৈনিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

যাক, যে কথা বলছিলাম। এই 15.8.45 তারিখে বেতারে ঘোষিত হল যে, জাপান বিনাশর্তে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এইদিন রাত্রে নেতাজীর বাঙলোতে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে গোপন অধিবেশন বসে তার বিস্তারিত বিবরণ এ-গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ এই গোপন সভার সিদ্ধান্তের সঙ্গে নেতাজীর শেষ অন্তর্ধানের রহস্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রী এস. এ. আইয়ার এই দিনটির কথা তাঁর স্মৃতিকথায় বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন:

"সিঙ্গাপুরের খোলা মাঠের মাঝখানে রানী বাহিনীর মেয়েরা প্রকাণ্ড একটা মঞ্চ খাটিয়েছে। ওরা একটা নাটকের আয়োজন করেছে। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে শামিয়ানা টাঙিয়েছে মাঠ জুড়ে। .....তিল ধারণের ঠাঁই নেই। দর্শক সংখ্যা তিন হাজারের ওপর। কথা ছিল, অসুস্থ নেতাজী দেরী করে আসবেন, কিন্তু পটোত্তোলনের পূর্বেই তিনি সদলবলে এসে গেলেন। নেতাজী মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াতেই গগন বিদীর্ণ-করা ধ্বনি উঠল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ। নেতাজী জিন্দাবাদ!

" এরপর শুরু হল অভিনয়।

".....অভিনয় যখন মধ্যপথে তখন আজাদ হিন্দ সরকারের আইন-সদস্য শ্রী এ. এন. সরকার এসে উপস্থিত। তিনি ব্যাঙ্কক থেকে সোজা প্লেনে করে আসছেন, এবং

এরোড্রম থেকে সরাসরি অভিনয়ের আসরে। নেতাজীর সঙ্গে একটি জরুরী ব্যাপারে দেখা করতে। শ্রীসরকার জাপানের আত্মসমর্পণ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তৎসংক্রান্ত পরিণতির বিষয়ে একটি গোপনবার্তা নিয়ে এসেছেন এটা অনুমান করা যায়। নেতাজী কিন্তু সে বিষয়ে কোনও কথা বললেন না। অভিনয়ের আনন্দোৎসবের মধ্যে এসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে না। উনি দর্শকের আসন থেকে অন্তরালে উঠে এসে অনায়াসে সর্বশেষ পরিস্থিতিটুকু জেনে নিতে পারতেন। তাও করলেন না। শ্রীসরকার এসে বসলেন ওঁর ঠিক পাশেই। কিন্তু অভিনয় চলা কালে এসব কথা তিনি উত্থাপনই করতে দিলেন না। সংক্ষেপে বললেন, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে খাবেন। কথা আছে।

সে রাত্রেই বিশ্বস্ত সমরসচিবদের নিয়ে শেষবারের মত বসেছিলেন নেতাজী পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণে। শ্রী এ. এন. সরকার সেদিনই সন্ধ্যায় ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছেছেন। শ্রীসরকার আসার আগে আমাদের মোটামুটি স্থির হয়েছিল যে, নেতাজী সিঙ্গাপুরেই থেকে যাবেন এবং ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে ফৌজসমেত আত্মসমর্পণ করবেন। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পূর্বে আমরা নেতাজীর উপস্থিতিতেই এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তিনি শুধু শান্ত সমাহিত চিত্তে এ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন বললেই সবটুকু বলা হয় না — সময়ে সময়ে তিনি রসিকতাও করেছিলেন।

শ্রীসরকার আসার পর আলোচনাটা অন্যদিকে মোড় নিল। কেউ কেউ বললেন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সিঙ্গাপুরেই আত্মসমর্পণ করে তো করুক, কিন্তু স্বয়ং নেতাজী তাঁর বাছা-বাছা কয়েকটি সহকর্মীসমেত আত্মগোপন করুন। তাহলে যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি নূতন ক্ষেত্র সৃষ্ট হতে পারবে। অনেকে এরকম আন্দাজ করছিলেন যে, নিতান্ত ফ্যাসিবাদের ভয়ে রক্ষণশীল ব্রিটেন এবং ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু সাময়িকভাবে আজ হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছে মার্কস্-লেনিনের রাশিয়ার সঙ্গে। যুদ্ধান্তে এ আঁতাত টিকবে না। তখন খুব সম্ভবত রাশিয়া ও ব্রিটেন বিপক্ষ শিবিরে নাম লেখাবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সেই বিশ্বসমর বেশী দূরে নয়। আজ রাশিয়ায় আত্মগোপন করে নেতাজীর পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করা যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন অচিরেই হয়তো তা সম্ভবপর হয়ে যবে।

"এবার নেতাজী নিজেই প্রতিবাদ করেন। বলেন, তোমরা ভুল করছ। ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন দু-বছরের বেশি দেরী হতে পারে না। ভেবে দেখ, আমি যদি আজ ধরা দিই তাহলে কী হবে? যুদ্ধাপরাধী বলে ইংরেজ আমার বিচার করবে। কিন্তু কোথায়? পূর্ব-এশিয়ার কোথাও আমার বিচার করতে সাহস পাবে না ব্রিটেন। সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক-রেঙ্গুনে সে বিচার পরিচালনা করা অসম্ভব। সুতরাং? দিল্লিতে। সম্ভবত ঐ লালকেল্লায়। নিঃসন্দেহে তারা আমাকে বিচারে দোষী বলে চিহ্নিত করবে। তার অর্থ মৃত্যুদণ্ড। হয় ফাঁসি অথবা ফায়ারিং স্কোয়াড। তারপর? আমি নিঃসন্দেহ যে, তার একমাসের মধ্যে ভারতবর্ষ

স্বাধীন হয়ে যাবে। কারণ যুদ্ধোত্তর ভারতে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না — আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কীর্তি-কাহিনী কিছুতেই চেপে রাখতে পারবে না ব্রিটিশ প্রচারকের দল। সমস্ত ভারতবর্ষ বিচারকালের ভিতরেই হয়ে উঠবে একটা বারুদের স্তূপ। আমার মৃত্যুই তাতে অগ্নিসংযোগ করবে। এ একেবারে অবধারিত। দ্বিতীয়ত কী হতে পারে? এই আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজ আমাকে ছেড়ে দিতে পারে। সে-ক্ষেত্রে রাশিয়ায় নয়, মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়েই আবার আমি শুরু করব আমৃত্যু আপোষহীন সংগ্রাম। সুতরাং ক্ষতি কোনদিক থেকেই হতে পারে না।

"অকাট্য যুক্তি। এ যুক্তি উনি আগেও শুনিয়েছেন। এরই জন্য উনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যান্য সমর-নায়কের সঙ্গে সিঙ্গাপুরেই উনি আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।"

"এবার কিন্তু তা হ'ল না। শ্রী সরকারের বুদ্ধিও ক্ষুরধার। তিনি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরালো। নেতাজীকে এই প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখলাম।

"সরকার বললেন, আপনি যা বলছেন তা ঠিক। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি যদি আজ আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে কী হবে? হবে ঐ একই ব্যাপার। মেজর জেনারেল ভোঁসলে, শাহ্নওয়াজ, চ্যাটার্জি, ধীলন, সাইগল অথবা আমার বিচার করবে ইংরেজ। আমাদের কয়েকজনকে অথবা সবাইকে ধরে ফাঁসি দেবে। কিন্তু তাই বলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বাকি বিশ-ত্রিশ হাজার সৈনিকের ফাঁসি হতে পারে না। অর্থাৎ ফল সেই একই। আমাদের মৃত্যুতেই হয়তো বারুদের স্তূপে আগুন লাগবে। বিদ্রোহ করবে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ভারতীয় ফৌজ। কিন্তু যদি কোনক্রমে বারুদে আগুনটা না লাগে? তখন অন্তত একজন মানুষকে দূর থেকে ছুঁড়ে দিতে হবে আগুনের সেই প্রথম স্ফুলিঙ্গটুকু। সে কাজ আমরা কেউ পারব না নেতাজী। পারবেন আপনি। যদি তখন আপনি বেঁচে থাকেন। ধরা যদি আপনাকে দিতেই হয়, দেবেন। কিন্তু আজ নয়, আজ থেকে ছয় মাস পরে। ততদিনে আমাদের বিচারের প্রহসনটা শেষ হয়ে আসবে। আজাদ হিন্দের কীর্তিকাহিনী প্রচারিত হয়ে যাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে। আমার মনে হয়, আজ আপনার আত্মসমর্পণের চেয়ে ছয় মাস পরে সেটা অনেক অনেক বেশি কার্যকরী হবে।

"নেতাজীকে চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখলাম।

"সন্ধ্যায়, অর্থাৎ পনরই অগাস্ট টোকিও রেডিও সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করল। সেই দিন রাত্রি দশটায় আমরা আবার বসলাম আলোচনাসভায়। সে আলোচনা শেষ হয়েছিল রাত তিনটেয়। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই পাঁচঘণ্টাব্যাপী আলোচনার কথা আমার কাছে বিস্মরণের অতীত। নেতাজী শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে যেতে। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় যাবেন তিনি? থাইল্যান্ড, ইন্দো-চীন, জাপান, মাঞ্চুকুয়ো অথবা খাশ রাশিয়ায়? সিদ্ধান্ত হল — মালয়ের বাইরে তো বটেই, রাশিয়ার কোন অঞ্চলে, সম্ভব হলে দাইরেনে। থাইল্যান্ড অথবা ইন্দো-চীনে গিয়ে ধরা পড়ার কোন অর্থ

হয় না, আর আত্মসমর্পণের পর জাপান পাড়ি দেওয়া বাতুলতা।

"নেতাজী বললেন, এ নিরুদ্দেশ-যাত্রার শেষ লক্ষ্য আপাতত অকথিতই থাক। অবস্থা অনুযায়ী লক্ষ্যমুখ আমাকে বদলাতে হবে।

"আমি মনে মনে বলছিলাম — তাই কী হয়? লক্ষ্যমুখ এ কাঠামোতে আর ওঁর বদলাবে না। কম্পাসের কাঁটার মত সে লক্ষ্য আজন্ম স্থির হয়ে আছে। ভারতের স্বাধীনতা। একচল্লিশ সালের সতরই জানুয়ারী মৌলবী জিয়াউদ্দীন তীর্থযাত্রায় রওনা হয়েছিলেন---সিধে পশ্চিমমুখো। আবার তেতাল্লিশ সালের আটই ফেব্রুয়ারী অর্ল্যান্ডো মাজোট্টা যাত্রা করেছিলেন পূর্বমুখে। তা হোক, জিয়াউদ্দীন-মাজোট্টার লক্ষ্য কিন্তু ছিল ওই একই, ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি।

"কে একজন বললেন, জাপানের আত্মসমর্পণের পরে জাপানী বিমানে আপনার এ যাত্রা কি যুক্তিযুক্ত হবে?

"নেতাজী তৎক্ষণাৎ হেসে বললেন: Oh, I am a fatalist!

" বিচিত্র ভবিষ্যদ্বাণী! প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। ভারতবর্ষ ফিরে আসার পরে বোম্বাইয়ের শ্রীনাথালাল পারেখ বারে বারে আমাকে একটি দিনের ঘটনার কথা বলতেন। নেতাজী যখনই বোম্বাইয়ে আসতেন নাথালালের বাড়িতে অতিথি হতেন।

" সে অনেকদিন আগেকার কথা। ফরোয়ার্ড ব্লক তখন সবে জন্ম নিচ্ছে। উনিশ শ' উনচল্লিশ সাল। নেতাজী সেবারেও নাথালালের অতিথি। কাজকর্ম সারতে সারতে সেদিন অনেক রাত্রি হয়েছে। রাত প্রায় দুটো। নেতাজী বললেন, চল নাথালাল, সমুদ্রের ধারে একটু পায়চারি করে আসি, না হলে ঘুম আসবে না।

"দু'জনে বেরিয়ে এলেন নাথালালের সেই মেরিন ড্রাইভের প্রকাণ্ড প্রাসাদ থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন সমুদ্রের দিকে। পূর্ণিমা রাত্রি। পথ সম্পূর্ণ নির্জন। সমুদ্র-গর্জন আর নারকেল গাছের আর্ত ক্রন্দন ছাড়া বিশ্বচরাচর স্তব্ধ। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটছে। আকাশ নির্মেঘ। নাথালালের স্পষ্ট মনে পড়ে, 'আনমনে পথ চলতে চলতে সুভাষবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ একটু হেসে বললেন, জান নাথালাল, কী রকম মৃত্যু হলে আমি সবচেয়ে খুশী হব? মনে কর একটা এরোপ্লেনে ঐ নীল আকাশের মধ্যে দিয়ে আমি উড়ে যাচ্ছি—হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। আমি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এসে ধরা দিলাম। পৃথিবীর সেই আলিঙ্গনেই মৃত্যু হল আমার। ভারী নাটকীয় মৃত্যু হয় তা'হলে, নয়?

"রাত্রি তিনটে। আলোচনা শেষ হল। এবার যাত্রার প্রস্তুতি করতে হয়। প্রশ্ন হল : এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় কোন কোন ভাগ্যবান নেতাজীর সঙ্গী হবেন? নেতাজী ছাড়া এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন--- মেজর জেনারেল কিয়ানি, আলাগাপ্পান, কর্নেল

হবিবর রহমান, শ্রীসরকার এবং আমি । এর ভিতর কিয়ানি যে যাচ্ছেন না, তা বোঝা গেল নেতাজীর শেষ আদেশনামায়। এইটিই সর্বাধিনায়কের শেষ আদেশ:

"আরজি হুকুমৎ-ই আজাদ হিন্দ্

টেলি: 5021, 5022, 5023 সিওনান (সিঙ্গাপুর)

তাং ষোলই অগাস্ট, 1945

—আদেশনামা—

"সিঙ্গাপুর থেকে আমার অনুপস্থিতিকালে মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারকে সর্বতোভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সুভাষচন্দ্র বসু

রাষ্ট্রপ্রধান, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার।"

অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেছেন, আইয়ারজীর স্মৃতিচারণের যে অংশটি আমি উদ্ধৃত করেছি তার প্রথমাংশেই আছে যে, শ্রী এ. এন. সরকার একটি অত্যন্ত জরুরী এবং গোপন বার্তা নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে চলে আসেন এবং বিমানবন্দর থেকে সরাসরি নাট্যোৎসবের আসরে চলে যান নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রী সরকারের আচরণে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত জরুরী কোন একটি সংবাদ বহন করে এনেছেন এবং নেতাজীর আচরণে মনে হয় ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপন। সর্বসমক্ষে তিনি তা নিয়ে আলোচনা করেননি—আড়ালে উঠে গিয়েও আলোচনা করেননি। এ বিষয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষিত হবার ভয়ে। অর্থাৎ নেতাজী শ্রী সরকারের আচরণে কেউ বুঝতে পারেনি যে, একটি গোপন সংবাদ শ্রীসরকার বহন করে এনেছেন।

কালানুক্রমিকভাবে শ্রীআইয়ার পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন; কিন্তু সেখানে ঐ গোপন সংবাদের আর কোন উল্লেখ নেই। কেন নেই? আইয়ারজী যখন গ্রন্থরচনা করেছেন তখন সে গোপনীয়তার আর কোন অর্থ নেই। তা'হলে? তার কারণ শ্রী আইয়ার নিজেই জানতেন না—কী গুহ্যবার্তা শ্রী সরকার বহন করে এনেছেন। এই গোপন সংবাদটি আমরা জানতে পারছি শ্রীহাচাইয়া (সাক্ষী নং 32, টোকিও, 8.5.56) এবং জেনারেল ইসোদার (সাক্ষী নং 35, টোকিও, 10.5.56) জবানবন্দী থেকে। অনুসন্ধান কমিটির কাছে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদেরই নির্দেশে শ্রী সরকার ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে যান, জাপানের আত্মসমর্পণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে।

ব্যাঙ্ককে অবস্থিত জেনারেল ইসোদা (হিকারি কাইকানের সর্বময় কর্তা) এবং মি. হাচাইয়া (অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারে জাপান-সরকার মনোনীত মন্ত্রী) তাঁদের বিশ্বাসভজন শ্রীসরকার মারফত নেতাজীকে গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন

যে, তাঁরা উভয়েই নেতাজীকে মালয় থেকে পূর্ব এশিয়ার কোন নিরাপদ অঞ্চলে— যেখানে নেতাজী যেতে চান সেখানে, পলায়নে সর্বতোভাবে গোপনে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বস্তুত সংবাদটি তাঁদের মতে এত গোপনীয় ছিল যে তারবার্তা বা টেলিফোনে সেটি তাঁরা ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজীকে জানাতে পারেননি। শ্রী সরকারকে সেজন্য স্বয়ং সংবাদবহ হিসাবে সিঙ্গাপুর চলে আসতে হয়েছিল। উভয়ের 1956 সালে প্রদত্ত জবানবন্দীতে এইটুকু প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা আর একটি অনুসিদ্ধান্ত যোগ করতে পারি: নিঃসন্দেহে জাপান সমর-দপ্তর এবং জাপান-সরকার তৎপূর্বে ওঁদের দুজনকে এভাবে কাজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ ওই দু'জন উচ্চপদে দায়িত্বশীল জঙ্গী অফিসার জাপান সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে এতবড় প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই নেতাজীকে দেননি।

প্রশ্ন হতে পারে, এতবড় একটি সংবাদ কেন নেতাজী গোপন রেখেছিলেন? সে রাত্রে গোপন সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তো সকলেই নেতাজীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন! তা'হলে?

আমি জবাবে বলব, এ মন্ত্রগুপ্তি নেতাজীর চরিত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে যায়। সারা জীবন তিনি যে পথে চলেছেন তা হচ্ছে, যাকে বলে, 'ক্ষুরস্য ধারা'। অপ্রয়োজনে তিনি তাঁর গোপন পরিকল্পনার কথা কখনও প্রকাশ করতেন না। সহকর্মীদের অবিশ্বাস করতেন বলে নয়, ভারতীয় সাধকের মত মন্ত্রগুপ্তি তাঁর একান্ত স্বভাবের জিনিস। হয়তো পাঠকের এটা সহজে বিশ্বাস হবে না। তাই দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

17.1.41 তারিখে যখন তিনি এলগিন রোডের বাড়ি ত্যাগ করে চলে যান তখন মাত্র পাঁচজনকে সেকথা জানিয়ে যান। যাঁরা তাঁর পলায়নে সাহায্য করেছিলেন, যাঁরা সংবাদটা তাঁর সীমান্ত অতিক্রম করা পর্যন্ত গোপন রাখতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়, বন্ধু বা সহকর্মীও এ সংবাদ জানত না। এ মন্ত্রগুপ্তি তাঁর সহজাত। দ্বিতীয় উদাহরণ 8.2.43 তারিখে যখন তিনি কিয়েল বন্দর থেকে ডুবোজাহাজে করে পূর্ব এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অনুচরের — এমনকি সহযাত্রী আবিদ হাসান পর্যন্ত—জানতেন না তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন। 1969 সালে নেতাজী ভবনে বক্তৃতাদানকালে শ্রী আলেকজান্ডার ওয়ার্থ এই ঘটনাটির প্রসঙ্গে বলেছেন —

"নাম্বিয়ার ছাড়া ফ্রি-ইন্ডিয়া সেন্টার অথবা ইন্ডিয়ান লিজিয়নের আর কেউ নেতাজী কোথায়, কেমন করে যাচ্ছেন তা জানতেন না। কিয়েল বন্দরে প্রতীক্ষমাণ একটি ডুবোজাহাজে চড়ে 8.2.43 তারিখে নেতাজী জার্মানী ত্যাগ করেন। সাত এবং আট তারিখের মাঝখানের রাতে নাম্বিয়ার, স্টেট সেক্রেটারি কেপলার এবং আমি, আমরা এই তিনজনে নেতাজী ও হাসানকে কিয়েল বন্দরে নিয়ে এলাম। আগেই বলেছি নাম্বিয়ার, কেপলার, আমি এবং সংশ্লিষ্ট মিলিটারি পুলিস ছাড়া আর কেউই নেতাজীর এই গোপন

যাত্রার কথা জানতেন না। এমন কি হাসান পর্যন্ত যখন ট্রেনে চেপে বার্লিন থেকে কিয়েল আসছিল তখন জানত না সে কোথায় যাচ্ছে। সে মনে করেছিল নেতাজীর সঙ্গে তাকে গ্রীসে যেতে হবে, আর সেই ধারণা অনুযায়ী গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করার জন্য সে একটি বইও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এ কথা সে পরে স্বীকার করেছে।''

এ থেকে অনুমান করি, তিনি তাঁর বৃদ্ধা জননীকে জানিয়ে গৃহত্যাগ করতে পারেননি — যে জননীর সঙ্গে জীবনে আর তাঁর দেখা হয়নি। এই আপাত অপ্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি পরিবেশন করতে বাধ্য হলাম নেতাজীর-চরিত্রের মন্ত্রগুপ্তির ঐকান্তিক কথা বোঝাতে। নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান-রহস্যের সঙ্গে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গে আসব আমরা।

সুতরাং আমরা দেখলাম, চুয়াল্লিশ সালের মাঝামাঝি থেকেই যদিও নেতাজী স্থির করে রেখেছিলেন যে, জাপান আত্মসমর্পণ করলে তিনি মাঞ্চুরিয়ার দিকে আত্মগোপন করবেন এবং যদিও তিনি এতদিন নানারকম ব্যবস্থা করে গেছেন,— শ্রী দাশকে গোপন বিপ্লবী দল সংগঠনের আদেশ দিয়েছেন, সর্বশ্রী সুনীল রায় ও এ. সি. দাসকে গোপন বেতারের ওয়েভ-লেংথ, ফ্রিকোয়েন্সি, কল-সাইন ইত্যাদি দিয়ে রেখেছেন (সাক্ষী নং 28,ব্যাঙ্কক. 30.4.56) তবু 12.8.45 থেকে 15.8.45 পর্যন্ত তিনি তাঁর সহকর্মীদের প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি আত্মসমর্পণ করতে চান।

এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত, তিনি তাঁর পরিকল্পনা গোপন রাখতে সর্বসমক্ষে বলছিলেন যে, তিনি আত্মসর্মপণ করতে চান। নেতাজী-চরিত্রের মন্ত্রগুপ্তির এ-এক বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পারমাণবিক বোমার আঘাতে জাপান এত দ্রুত আত্মসমর্পণ করেছিল যে, নেতাজী আশঙ্কা করেছিলেন এত শীঘ্র তাঁর পক্ষে মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাওয়া সম্ভপর হবে না। বরং তিনি মনে করেছিলেন যে, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সঙ্গে তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন তবে সহজেই তিনি শহীদ হবেন এবং তার প্রতিশোধ নিতে ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ জেগে উঠবে তাতে ইংরেজকে সাম্রাজ্য ত্যাগ করে চলে যেতে হবে অনতিবিলম্বেই। অর্থাৎ তাঁর নিজ রক্তের বিনিময়ে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। এই তাঁর আজন্মের স্বপ্ন। ফলে, এ সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু আলোচনাকালে শ্রীসরকার যে যুক্তি পেশ করেন তাও নেতাজীর মনে দাগ কাটে। তিনি নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় রওনা হয়ে পড়েন। শ্রীসরকারের গোপন সংবাদও তাঁকে প্রভাবিত করে নিশ্চয়। আইয়ারজী বারে বারে একে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গে তিনি বলেছেন, ''নেতাজী ঠিক কোথায় যাচ্ছেন তা আমাদের পরিষ্কার করে বলেননি। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আমরা জানতেম।'' গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে আইয়ারজী বলেছেন ''Out of Malaya definitely, to some Russian territory certainly, to Russia itself, if possible.''

(মালয়ের বাইরে তো বটেই , নিশ্চয়ই রাশিয়া-অধিকৃত কোন ভূখণ্ডে, সম্ভব হলে খোদ সোভিয়েট রাশিয়ায়)।

মোট কথা, পরদিন 16.8.45 তারিখে প্রত্যূষে নেতাজী তাঁর কয়েকজন সহকারী সমেত বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হলেন। মেজর-জেনারেল এম. জেড. কিয়ানিকে তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে গেলেন, ফলে কিয়ানি থাকছেন। আলাগাপ্পানও থেকে গেলেন। স্থির হল শ্রী এ. এন. সরকারও নেতাজীর সঙ্গে এ নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাবেন না। নেতাজীর সহযাত্রী হলেন:

1. কর্নেল হবিবর রহমান
2. কর্নেল প্রীতম সিং
3. শ্রী এস. এ. আইয়ার
4. এবং দোভাষী শ্রী নিগেশী।

সকাল দশটা বাজার দু'এক মিনিটের মধ্যেই সিঙ্গাপুর বিমানঘাঁটি ছেড়ে প্লেনটা রওনা হল। এবং বিকালে এসে পৌঁছলো ব্যাঙ্ককের বিমান বন্দরে। নেতাজী যে ব্যাঙ্ককে এসেছেন এ সংবাদ মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যা থেকে রাত্রের শেষ প্রহর পর্যন্ত তারপর ক্রমাগত দর্শনার্থীর দল আসতে থাকে নেতাজীর আবাসে। সবাই শ্যাম-প্রবাসী ভারতীয়। সামরিক এবং অসামরিক লোক। নেতাজী অতঃপর কী করবেন, কোথায় যাবেন, কী ভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হবে সেইসব প্রশ্নবাণ তাঁরা নিক্ষেপ করতে থাকেন। ওঁদের ক্রমাগত প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন নেতাজী কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে।

ওর মধ্যে ব্যাঙ্ককস্থিত সামরিক অফিসার এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কর্ণধারদের নিয়ে নেতাজী একটি সংক্ষিপ্ত মিটিং করেন। জেনারেল ভোঁসলে সে সময় ব্যাঙ্ককে ছিলেন। নেতাজী তাঁকেই আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে অভিষিক্ত করেন। সিঙ্গাপুরে তাঁর শেষ আদেশনামা মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানিকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান এবং ব্যাঙ্ককে মেজর জেনারেল ভোঁসলেকে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দেয়— নেতাজী জানতেন যে তিনি তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করবেন না।

অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে শাহ্নওয়াজ বলেছেন : "নেতাজীর সে সময়ে টোকিও যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আজাদ্ হিন্দ বাহিনী জাপান বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে একই সঙ্গে আত্মসমর্পণ করবে অথবা পৃথকভাবে করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত জরুরী। নেতাজী এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের ইচ্ছা যে, যেহেতু আজাদ হিন্দ্ বাহিনী একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সেনাদল সেই হেতু তারা পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করবে।

সিঙ্গাপুরে অবস্থিত জাপানী সেনাপতি এ বিষয় কোন নির্দেশ নেতাজীকে দিতে পারেননি। সম্ভবত টোকিও অবস্থিত জাপানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন।"(1/9)

এই কথাগুলি মেজর-জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ এবং শ্রীমৈত্র কেন লিখেছেন বোঝা শক্ত। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী জাপানী বাহিনীর সঙ্গে একত্রে আত্মসমর্পণ করবে অথবা পৃথকভাবে করবে এইকথা জানতে নেতাজী সিঙ্গাপুর থেকে স্বয়ং টোকিও যাচ্ছিলেন তাঁর বাছা বাছা সহকর্মীদের নিয়ে? আর যাবার আগে প্রায় এক কোটি টাকার সোনা দানা নিয়ে নেন সঙ্গে, রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কদের দায় অপরকে বুঝিয়ে দিয়ে?

কথাগুলি লিখে সম্ভবত ওঁদের মনে হয়েছে, এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি মেনে নেবে না। তাই পরে বলেছেন, "সুতরাং নেতাজীর পক্ষে প্রথমেই টোকিও যাবার একাধিক কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও তাঁর অন্তিম লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিয়ার পথে রুশদেশ। হিকারি কাইকানের প্রধান জেনারেল ইসোদার সঙ্গে নেতাজী ব্যাঙ্ককে পৌঁছে কথা বলেন। জেনারেল ইসোদা আমাদের বলেছেন, 'নেতাজী রুশ ভূখণ্ডে যেতে চাইলেন। আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি নেতাজীকে দিলাম। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হল যে, নেতাজী সর্বপ্রথম টোকিওতে যাবেন এবং এতাবৎকাল নিষ্পন সরকার নেতাজীকে যে সাহায্য করেছে তার জন্য নেতাজী ধন্যবাদ জানাবেন। তারপর মাঞ্চুরিয়ার পথে তিনি রাশিয়া চলে যাবেন'। (1/10)

অথচ এর পরের অনুচ্ছেদেই শ্রী শাহ্‌নওয়াজ বলেছেন "The plane was proceeding to Tokyo by the following route: Saigon–Heito-Taihoku (Formosa)-Dairen (Manchuria)-Tokyo, অর্থাৎ বিমানটি টোকিওর দিকে যাচ্ছিল, এই পথে : সাইগন-হেইতো-তাইহকু (ফরমোসা)-দাইরেন (মাঞ্চুরিয়া) - টোকিও।"

কোন প্লেনকে ফরমোসা থেকে টোকিও যেতে হলে পথে দাইরেন পড়ে না। ফলে, 'টোকিও' শব্দটা প্রক্ষিপ্ত। শাহ্‌নওয়াজ জোর করে বোঝাতে চেয়েছেন—"একটি ত্রিভুজের দুটি বাহুর মিলিত দৈর্ঘ্য তৃতীয় বাহুর চেয়ে কম"!! সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি নেতাজী দাইরেনেই যাচ্ছিলেন, টোকিওতে নয়। সৈন্যবাহিনী কিভাবে আত্মসমর্পণ করবে সে ব্যবস্থা তিনি করেই এসেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচনও করে এসেছেন। ফলে সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে তিনি সদলবলে নিশ্চয়ই জাপান যাচ্ছিলেন না। তা' ছাড়া যুদ্ধের সেই পরিস্থিতিতেই নিশ্চয়ই তিনি পারমাণবিক বোমা-বিধ্বস্ত পরাজিত জাপান সরকারকে মৌখিক ধন্যবাদ জানাতে দাইরেন পার হয়ে টোকিও যাচ্ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি। মিস্টার কিতাজাওয়া ছিলেন যুদ্ধকালে রেঙ্গুনে জাপানী এম্ব্যাসির একজন কর্মকর্তা। তিনি অনুসন্ধান কমিটিকে বলেছেন (1/9),

আত্মসমর্পণের আগের সপ্তাহে জাপান সরকার অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্রপ্রধানদের জানান, যে তাঁরা যদি জাপানে আশ্রয় চান তা' হলে জাপান সরকার তাঁদের আশ্রয় দিতে রাজি আছেন। এই আমন্ত্রণ অনুসারে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট লরেল, বর্মার ডাঃ বা ম' এবং মানকিঙের চীনা সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ চেন কুঙ পাও জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিতাজাওয়া বলেছেন, মিঃ হাচাইয়া নেতাজীকেও এই আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু নেতাজী জাপানে আশ্রয় নিতে সম্মত হননি। তাঁর মতে আত্মসমর্পণের পর জাপানে তাঁর আশ্রয় নেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তিনি তার পরিবর্তে রাশিয়ায় চলে যেতে চান।

অনুসন্ধান কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এর পর যা বলেছেন (।/9) তার আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ:

ষোলই অগাস্ট নেতাজী ব্যাঙ্ককে এসে উপস্থিত হলেন। মিঃ হাচাইয়া ছিলেন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের জাপানী মন্ত্রী। তিনি এই সময় নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাপান সরকারের একটি বার্তা নেতাজীকে দেন যাতে জাপান সরকার সরকারীভাবে জানান — জাপান আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বার্তায় নেতাজী জাপানের সমরোদ্যমে যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এই বার্তায় এমন কথাও ছিল যে, নেতাজীর শেষ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে জাপান সরকার সর্বতোভাবে প্রস্তুত। মিঃ হাচাইয়া আমাদের বলেছেন যে, সব কথা শুনে নেতাজী নাকি তাঁকে বলেন যে, যেহেতু জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করছে তাই তার পক্ষে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া বা অন্য কোন সাহায্য করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অধিক আগ্রহী। এ বিষয়ে অবশ্য ব্যাঙ্ককের স্থানীয় অফিসারবৃন্দ তাঁকে কোন সাহায্য করতে অশক্ত ছিল। তারা এটুকু সাহায্য শুধু করতে পারে — নেতাজীকে সাইগনে পৌঁছে দেওয়া। সাইগনে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির সদর দপ্তর। নেতাজী এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ওখানকার স্থানীয় স্টাফ অফিসার-কম্যান্ডিং কর্নেল ইয়ানো অবশ্য জানতেন যে, নেতাজী এখানে আসছেন এবং তিনি রাশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক। তিনি বলেছিলেন, সম্ভবত ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি নিজেও কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না। হয়তো এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে নেতাজীকে টোকিওতে যেতে হবে এবং সেখান থেকেই একমাত্র ব্যবস্থা করা সম্ভবপর।"

সতেরই অগাস্ট ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ও'রা দুজন ব্যাঙ্ককের বিমানবন্দরে চলে আসেন। ব্যাঙ্ককে আরও তিনজন সহযাত্রী নেতাজীর সঙ্গে যোগ দেন। ফলে এবার দু'খানি প্লেনের ব্যবস্থা করে দেন জাপানী অফিসার। প্রথম বিমানে ছিলেন নেতাজী, হবিব, প্রীতম সিং, আইয়ার এবং জাপানী লিয়াজঁ অফিসার কর্নেল কিয়ানো। দ্বিতীয় বিমানখানিতে ছিলেন জেনারেল ইসোদা, মিস্টার হাচাইয়া, কর্নেল গুলজারা সিং,

আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাশ। ভোরবেলা রওনা হয়ে দু'খানি প্লেন সাইগনে পৌঁছাল বেলা দশটা নাগাদ।

এরোড্রোমে নেমেই নেতাজী জাপানী সেনাপতিদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরামর্শ করলেন। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। স্থির হল জেনারেল ইসোদা, মিঃ হাচাইয়া এবং একজন পদস্থ জাপানী স্টাফ-অফিসার তৎক্ষণাৎ একটি প্লেন নিয়ে দালাৎ চলে যাবেন। দালাৎ অদূরেই, এবং সেটা ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির সদর দপ্তর। স্থির হল, ওঁরা গিয়ে জেনে আসবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তেরাউচি নেতাজীকে বিমান দিয়ে কতটা সাহায্য করতে পারেন। নেতাজী কোথায় যাবেন, কী করবেন তা বস্তুত নির্ভর করছে তেরাউচি তাঁকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন তার ওপর। ওঁরা তিনজনে দালাৎ চলে গেলে নেতাজী সদলবলে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিলেন শ্রীনারায়ণ দাসের আবাসে। নারায়ণদাসজী সাইগনস্থিত আই. আই. লীগের গৃহনির্মাণ বিভাগের সেক্রেটারি।

এরপর প্রত্যক্ষদর্শী এস. এ. আইয়ারজীর Unto Him A witness গ্রন্থ থেকে কিছুটা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ পরবর্তী ঘটনা কী ঘটেছিল তা অনুধাবন বা অনুমান করতে সেটা আমাদের সাহায্য করবে :

"অবশেষে নারায়ণদাসজীর বাড়ীতে পৌঁছলাম আমরা। নেতাজীকে একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া গেল। আমি ও আবিদ হাসান দখল করলাম দ্বিতীয়খানা। আর একখানায় গিয়ে উঠল হবিব আর দেবনাথ দাশ। নেতাজী পৌঁছেই জামা-জুতো খুলে স্নান করলেন এবং স্নানান্তে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। কাল সারারাত উনি দু'চোখের পাতা এক করেননি। এখন ঘণ্টা চার-পাঁচ নাগাড়ে ঘুমোতে পারলে উনি আরাম পাবেন।

" কিন্তু তা হবার নয়। আধঘণ্টা হয়েছে কি হয়নি একটা গাড়ি এসে থামল। প্রায় দৌড়ে এসে পৌঁছালেন জাপানী লিয়াজঁ অফিসার মি. কিয়ানো। বললেন, অত্যন্ত জরুরী একটা খবর আছে, নেতাজীকে ডেকে দিতে। আমরা রাজি হলাম না। হাবিব-ভাই বললে, খবরটা কী আগে বলুন। কিয়ানো বললেন, এখনি একটি প্লেন এখান থেকে ছাড়বে। তাতে একটিমাত্র সিট আছে। নেতাজী যদি তা'তে যেতে চান এখনই আসতে হবে।

"অত্যন্ত গুরুতর সংবাদ। আমরা সকলে চাইছি যত শীঘ্র সম্ভব নেতাজী সাইগন ত্যাগ করে যান। তাই বাধ্য হয়ে নেতাজীর ঘুম ভাঙানো হল। হবিব বললে, স্যার, জাপানীরা খবর পাঠিয়েছে এখনি একটি প্লেন এখান থেকে ছাড়ছে। তাতে একটি মাত্র সিট আছে—

"— কোথায় যাচ্ছে প্লেনটা?

"— তা আমি জানি না, মি. কিয়ানোও তা জানেন না বলেছেন।

"— তা হ'লে মি. কিয়ানোকে বল, যে জানে তাকে পাঠিয়ে দিতে। কোথায় প্লেনটা

যাচ্ছে না জেনে আমি কিছুই বলতে পারব না।

"বাধ্য হয়ে কিয়ানো ফিরে গেলেন। যত জোরে গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন তার চেয়ে জোরে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। আধঘণ্টা পরে আবার একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। এবার সেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া এবং ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচি। ওঁরা সোজা ঢুকে গেলেন নেতাজীর ঘরে। আমি বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। দেখতে পেলাম নেতাজী তেরাউচির সঙ্গে করমর্দন করলেন। ওঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসলেন পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে জরুরী এবং অত্যন্ত গুরুতর আলোচনায়। হবিব সে ঘরের ভেতর ছিল। আমি বাইরে। জানি না, কী আলোচনা হয়েছিল। গুলজারা এবং প্রীতম সিং তার মিনিট-দশেক আগে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। পাশের বাড়িতেই ছিল তারা। একটু পরেই নেতাজী রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আমাদের সকলকে ডাকেন। বলেন, অত্যন্ত জরুরী একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এখনই। আমাদের উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন, কই, প্রীতম আর গুলজারা কোথায়? ওদের ডাক।

"তৎক্ষণাৎ আমরা ওদের ডাকতে পাঠালাম। নেতাজী দেখলাম ভীষণ উত্তেজিত আর অশান্ত হয়ে পড়েছেন। পাঁচ সেকেন্ড হয়েছে কি হয়নি, জিজ্ঞাসা করলেন, এসেছে ওরা?

"আমি বলি, এখনই এসে যাবে স্যার!

"রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে উনি বলেন, ওদের বল, সাজপোশাক ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে না। যেমন আছে চলে আসতে। এখন একটি মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। অত্যন্ত জরুরী একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই মুহূর্তে। কাম্ এলং, হারি-আপ্।

ছুটতে ছুটতে ওরা দু'জনে এসে পৌঁছালো। নেতাজী পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। নিজে হাতে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে। কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। আমরা ওঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। বিনা ভূমিকায় উনি এক নিশ্বাসে বললেন, শোন, ওঁরা বলছেন, প্লেনটায় একটিমাত্র সীট আছে। অর্থাৎ গেলে আমাকে একেবারে একা যেতে হবে। এ-ক্ষেত্রে আমি কি সিটটা নেব?

"আমরা ছ'জন নির্বাক হয়ে রইলাম তিন থেকে চার সেকেন্ড। হবিব, গুলজারা, প্রীতম, আবিদ, দেবনাথ ভাই আর আমি। আমরা প্রত্যেকেই বোধ হয় মনে মনে বলছিলাম—হে ঈশ্বর! এ কী কঠিনতম পরীক্ষায় ফেললে আমাদের?

"আমাদেরই মধ্যে একজন কোনক্রমে ভাষা খুঁজে পায়। বলে, স্যার, এটা কেমন কথা? ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচি স্বয়ং আর একটি সিটের ব্যবস্থা করতে পারেন না? আপনি বলুন, অন্তত আর একটি সিটের ব্যবস্থা করতে। ইচ্ছে করলেই ওঁরা.....

বাধা দিয়ে নেতাজী বলেন, ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। Give me a categorical answer to my simple question. Should I or should I not accept this single seat? Yes or no. [সোজাসুজি আমার সহজ সরল প্রশ্নের জবাব দাও। ঐ

একটি আসন আমি নেব কি নেব না? হ্যাঁ কি না?।

"সহজ সরল প্রশ্নই বটে! কিন্তু জবাব দিতেই হবে। শুভানুধ্যায়ী সহকর্মীদের মতামত জানতে চাইছেন যখন উনি। আমরা কিন্তু সহজ-সরল জবাব দিতে পারলাম না। হ্যাঁ-না'র সীমানায় আবদ্ধ রাখতে পারলাম না আমাদের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-আশঙ্কাকে। বললাম, দ্বিতীয় একটি সিটের জন্য আবার চেষ্টা করে দেখুন। নেহাৎ না পেলে আপনি একাই চলে যান।

"কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন নেতাজী? প্লেনটা কোন দিকে যাবে? আমরা কেউই তাঁকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি। নিজে থেকেও তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু আমরা জানতাম; এবং এ-ও জানতাম যে তিনি জানতেন যে আমরা জানতাম। বিমানটি মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাচ্ছে। দাইরেন। নেতাজী দরজা খুলে চলে গেলেন পাশের ঘরে-যেখানে জাপানী সেনাপতিরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন তাঁর জবাবের।

একটু পরেই ফিরে এলেন নেতাজী। বললেন, আর একটি আসন ওঁরা আমাদের দিচ্ছেন। হবিব, তুমি আমার সঙ্গে এস বরং।

"আমাকে এবং গুলজারাকেও ব্যাগ নিয়ে ওঁর সঙ্গে বিমান পর্যন্ত যেতে বললেন। যদি শেষ পর্যন্ত আর একটি আসন পাওয়া যায়।

"তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম আমরা। তৈরি আমরা হয়েই ছিলাম। যে যার ব্যাগ তুলে নিলাম কাঁধে। দু'টি গাড়িতে রওনা দিলাম বিমান-বন্দরের দিকে। প্রথমটিতে নেতাজী, হবিব এবং আমি; দ্বিতীয়টিতে গুলজারা, প্রীতম, আবিদ এবং দেবনাথ দাস। আমরা পৌঁছলাম, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িখানার দেখা নেই। পাঁচ মিনিট গেল — তবু দ্বিতীয় গাড়িটা আসে না। সবাই অধৈর্য হয়ে পড়ে। প্লেনের প্রপেলারটা ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে। জাপানী সেনাপতি লেফটানেন্ট-জেনারেল শিদেয়ী ঐ প্লেনেই যাবেন, তিনিও প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছেন প্লেনে — নেতাজীর অপেক্ষায়। কুড়ি মিনিট হয়ে গেল তবু দ্বিতীয় গাড়িটা আসে না। ওঁরা নেতাজীকে বললেন আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। নেতাজী কিন্তু দৃঢ়সংকল্প । বললেন, না। ও গাড়িতে আমার অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজপত্র রয়ে গেছে।

"অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িখানা এসে পৌঁছাল। কিছু বিভ্রাট হয়েছিল পথে।

"নেতাজী সংক্ষিপ্ত বিদায় নিলেন আমাদের কাছে। আমার হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন — জয় হিন্দ্।

"কী জানি কেন আমার মনে হল, এই বুঝি ওঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ! এই বুঝি শেষবারের মতো ওঁকে বলছি — জয় হিন্দ্! এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবু আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অস্ফুটে বললাম — জয় হিন্দ্!

"হবিব আর নেতাজী উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। মিলিয়ে গেলেন প্লেনের গর্ভে।

"ছাড়ল প্লেনটা। ঠিক পাঁচটা পনের মিনিট। সতেরই অগাস্ট সন্ধ্যায়।"

তথ্য যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এইটুকুই। এরপর আসুন আমরা সেই তথ্যগুলিকে বিচার করি — দেখি, এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আমরা যুক্তিসম্মতভাবে উপনীত হতে পারি কি না:

(1) আমরা দেখেছি যে, নেতাজী দ্বিতীয় গাড়িখানার জন্য তাঁর যাত্রা কুড়ি মিনিট পিছিয়ে দেন। আইয়ারজী বলছেন, 'নেতাজী বললেন, না ও গাড়িতে আমার অত্যন্ত জরুরী কাগজপত্র আছে।' সে সময়ে আইয়ারজী জানতেন না যে, কাগজপত্র নয়, নেতাজীর সঙ্গে ছিল চারটি স্টিলের বাক্স। তার দু'টির মাপ 20" x 13" x 16 ইঞ্চি এবং দুটির 12" x 6" x 6 ইঞ্চি। এ দু'টি ভর্তি ছিল সোনার অলঙ্কারে। যে সকল অলঙ্কার মালয় ও বর্মায় নেতাজী-ফান্ডে দিয়েছিল স্বাধীনতাকামী প্রবাসী নরনারী। তার মূল্য সে-আমলের প্রায় এক কোটি টাকা। এ তথ্য অনুসন্ধান কমিটি পরিবেশন করেছেন (1/55)।

এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, নেতাজীর মন্ত্রগুপ্তি কতদূর গভীর ছিল। অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর আইয়ারজীকে পর্যন্ত তিনি জানাননি যে, তাঁর সঙ্গে এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ রয়েছে। এ মন্ত্রগুপ্তি নেতাজীর চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

(2) আমরা দেখেছি, কাউন্ট তেরাউচির সঙ্গে নেতাজীর আলোচনা হয়েছিল রুদ্ধদ্বার কক্ষে। একমাত্র "হবিব সে ঘরের ভিতর ছিল।" নেতাজীর অন্যান্য সহকর্মীরা ছিলেন বাইরে। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বময় কর্তা কাউন্ট তেরাউচির সঙ্গে নেতাজীর যে আলোচনা হয় — তা যাই হোক না কেন, জানতেন মাত্র পাঁচজন, জেনারেল ইসোদা, হাচাইয়া, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি, হবিবর রহমান এবং নেতাজী। সে আলোচনার বিষয়বস্তু আইয়ার, প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, দেবনাথ দাস এবং আবিদ হুসেন জানতেন না।

এখন প্রশ্ন : কী কথা আলোচন হতে পারে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান-পরিকল্পনার বিষয়ে।

এবার স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে দেখুন।

স্থানটা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির সদর দপ্তর। তিনিই সেখানকার সর্বময় কর্তা। তাঁর বিনা উপস্থিতিতে ব্যাঙ্ককে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদ্বয় হাচাইয়া এবং ইসোদা নেতাজীকে সদলবলে ব্যাঙ্কক থেকে সাইগনে নিয়ে আসার জন্য দু'খানি প্লেনের ব্যবস্থা করতে পারলেন — অথচ দেখা যাচ্ছে, নিজের সদর-দপ্তরে স্বয়ং সর্বাধিনায়ক নেতাজীর জন্য একটি গোটা প্লেনও দিতে পারছেন না — একটি মাত্র আসন দিচ্ছেন। তার কারণ কী হতে পারে?

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ইতিপূর্বে (ক) টোকিওর সদর-দপ্তর নেতাজীকে সরকারীভাবে জানিয়েছে যে, তাঁর শেষ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে জাপান সর্বতোভাবে প্রস্তুত। (খ) নেতাজী যদি ইচ্ছা করেন তা'হলে তাঁকে সিঙ্গাপুর থেকে রুশ ভূখণ্ডে প্রেরণ করতে

সর্বতোভাবে সাহায্য করার কথা তিন দিন পূর্বে শ্রী সরকার মারফত জানিয়েছেন হাচাইয়া এবং ইসোদা। নিঃসন্দেহে টোকিওর নির্দেশ ব্যতিরেকে নিয়মনিষ্ঠ এই দুই পদস্থ অফিসার এ জাতীয় একটি প্রতিশ্রুতি নেতাজীকে পাঠাননি। (গ) নেতাজী শ্রীসরকারের কাছ থেকে এই গোপন সংবাদটি যে পেয়েছেন তা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করেননি।

কালটা হচ্ছে ষোলই অগাস্ট। অর্থাৎ সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করার চব্বিশ ঘণ্টা পরে। যখন আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর এক-নম্বর শত্রুকে পালিয়ে যেতে জাপান সাহায্য করতে পারে না।

পাত্র হচ্ছেন স্বয়ং ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি — দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যান্ডার — যিনি একদিকে জাপান সরকারের সদর দপ্তর থেকে আদেশ পেয়েছেন নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ায় দাইরেনে নামিয়ে দিতে — অপরদিকে যিনি প্রকাশ্যভাবে কোন সামরিক আইন লঙ্ঘন করতে পারেন না।

সুতরাং স্থান-কালপাত্র বিচার করে আমরা এই আপাত-অসংলগ্ন ঘটনার একটি মাত্র ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পারি। সর্বশক্তিমান ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি নেতাজীকে একাধিক আসন দিতে অশক্ত হয়েছিলেন চূড়ান্ত গোপনীয়তার জন্য।

কাউন্ট তেরাউচি নিঃসন্দেহে নেতাজীকে বলেছিলেন যে, একমাত্র নেতাজীকেই নিরাপদে রুশ ভূখণ্ডে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি আদেশ পেয়েছেন। এই চূড়ান্ত গোপন ব্যবস্থা দ্বিতীয় কোন অ-জাপানী লোকের জ্ঞাতসারে হতে পারে না। আর তাই নেতাজীর সহকর্মীরা যখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, "স্যার, এটা কেমন কথা? ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি স্বয়ং আর একটি সিটের ব্যবস্থা করতে পারেন না?" তখন নেতাজী ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠেন, "Give me a categorical answer to my simple question!"

লক্ষণীয়, নেতাজীর সহকর্মীরা কাউন্ট-তেরাউচির কার্পণ্যে অত্যন্ত বিস্মিত অত্যন্ত ব্যথাতুর হয়েছিলেন অথচ স্বয়ং নেতাজীর কাছে সেটা মোটেই বিস্ময়কর মনে হয়নি। তিনি তেরাউচির সমস্যার কথা ঠিকই বুঝেছিলেন।

আরও লক্ষণীয়, নেতাজী দ্বিতীয়বার কাউন্ট তেরাউচির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে এক নিশ্বাসে বললেন, "আর একটি আসন ওঁরা আমাদের দিচ্ছেন। হবিব, তুমি আমার সঙ্গে এস বরং।"

অনুমান করা যায়, দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে নেতাজী ফিল্ড মার্শালকে বুঝিয়েছিলেন:

(ক) কর্নেল হবিবর রহমান প্রথমবারের আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। ফলে হবিবরের জানতে বাকি নেই যে, আত্মসমর্পণের পরে জাপান তাঁকে বিদেশে আত্মগোপন করার সুযোগ দিয়েছে।

(খ) এ কথা জেনে হবিবরের পক্ষে পিছনে পড়ে থাকার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। না হলে তাকে ক্রমাগত কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

(গ) নেতাজী একজন রাষ্ট্রপ্রধান, ফলে তাঁর একজন দেহরক্ষী সঙ্গে থাকা শোভন।

(ঘ) নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এই সংবাদের একজন ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে সে কথা বিশ্বকে বিশ্বাস করানো শক্ত হবে।

এইমাত্র যে অনুচ্ছেদটি লিখলাম তাতে আমি ধরে নিয়েছি যে, ইতিপূর্বেই একটি কল্পিত প্লেন-দুর্ঘটনার কথা তেরাউচি ও নেতাজী স্থির করে নিয়েছেন। এই অনুমানের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি আছে তা এবার বিচার করি :

নেতাজী যে দাইরেনের দিকে যাচ্ছিলেন এবং জাপান সরকার যে তাঁকে সে কার্যে সহায়তা করেছিল এটা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। যাঁরা বলেন নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তাঁরাও এ তথ্যটা অস্বীকার করতে পারেননি। স্বয়ং জওয়াহরলাল বা শাহনওয়াজও স্বীকার করছেন এ সত্য।

তাহলে প্রশ্ন হল, এমন একটা কাজ করার পূর্বে জাপান সরকার নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিল — ইঙ্গো-মার্কিন সমর-নায়কদের সে কী কৈফিয়ৎ দেবে? শ্রীসুরেশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "জাপানীরা যেহেতু ঐ একই ইঙ্গো-মার্কিনের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, তাই আমার মতে, তাদের পক্ষে কোনক্রমেই স্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, যে পরে তারা একটি ঘোষণা করে জানাবে যে ইঙ্গো-মার্কিন জোটের এক নম্বর শত্রু, যাঁকে ধরবার জন্য তারা হন্যে হয়ে আছে, সেই নেতাজীকে জাপানীরা সশরীরে অন্যত্র পাচার করেছে বা কোনভাবে পলায়নে সাহায্য করেছে। সুতরাং নেতাজীকে তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে, দেশবাসীর কাছ থেকে এবং ইঙ্গো-মার্কিন সমরনায়কদের নাগাল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে জাপানীরা যথারীতি ঘোষণা করল যে, একটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।" (2/7-8)

সরকারী অনুসন্ধান কমিটি কিন্তু তাঁদের রিপোর্টে এ সিদ্ধান্তে আসেননি। না আসাই স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর যে, নেতাজী সত্যই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। আমাদের বিস্ময় সেখানে নয়, আমরা বরং বিস্মিত হয়েছি এই কথা ভেবে যে, তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে নেতাজীকে দাইরেনের দিকে পালিয়ে যাবার সুযোগ জাপানীরা দিয়েছিল, ব্যাঙ্কক থেকে নেতাজী যে মাঞ্চুরিয়ার দিকেই যাচ্ছিলেন এটা জাপানীরা জানত। সে ক্ষেত্রে জাপানীরা নিশ্চয় একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে রেখেছিল ভবিষ্যতে বিজয়ী ইঙ্গো-মার্কিন সমর-নায়কদের সামনে দাখিল করার জন্য। কী সেই কৈফিয়ৎ? কমিটি ও সম্বন্ধে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। এখানেই আমাদের বিস্ময়।

যাই হোক, এ পর্যন্ত যা বলেছি ঘটনার ততখানি পর্যন্ত সন্দেহের অতীত। এরপর নেতাজীর আসলে কী হয়েছিল তা আমাদের জানতে হবে বিভিন্ন লোকের সাক্ষ্য থেকে, বিভিন্ন নথিপত্রের ইঙ্গিত থেকে। দুর্ভাগ্যক্রমে জবানবন্দীগুলি অধিকাংশই দীর্ঘদিন পরে লিপিবদ্ধ। ঘটনা 1945 সালের, অথচ অনুসন্ধান কমিটি এ নিয়ে তদন্ত করতে গেলেন

1956 সালে — এগারো বছর পরে। ফলে সবকিছুই কুয়াশায় ঢাকা।

প্রশ্ন হতে পারে, এই দীর্ঘ এগারো বছরের মধ্যে কি এ নিয়ে আর কেউ অনুসন্ধান করেনি? জবাবে বলব — হাঁা করেছে। কিন্তু সে অনুসন্ধানের পূর্ণ-রিপোর্ট আমরা দেখতে পাইনি। সে প্রসঙ্গে যথাকালে আসা যাবে।

18.8.45 তারিখে তথাকথিত দুর্ঘটনা ঘটেছিল, অথচ জাপান সরকারীভাবে তা বিশ্বকে জানালো পাঁচদিন পরে। তেইশ তারিখের রেডিওতে ঘোষণা করা হল এ সংবাদ। ঐ তেইশে অগাস্ট 'ডোমেই নিউজ এজেন্সি' কর্তৃক পরিবেশিত নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ জাপানের প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রে তেইশ তারিখে প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়, 'তাইহকুতে একটি বিমান দুর্ঘটনায় আঠারই তারিখে নেতাজী আহত হন — তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ঐ রাত্রেই মধ্যরাত্রিতে মারা যান। কোন কোন কাগজে বলা হয়, 'তিনি আঠারই মধ্যরাত্রে জাপানের একটি হাসপাতালে মারা যান।'

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল দুর্ঘটনার ছয়-দিন পরে অর্থাৎ 24.8.45 তারিখে। আনন্দবাজার পত্রিকা যদিও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হেডলাইন দিয়ে সংবাদটা প্রকাশ করে, কিন্তু অন্যান্য অনেক কাগজে এক বা দুই কলমে প্রথম পৃষ্ঠায় নিচের দিকে তা ছাপা হয়। কলকাতার চারটি প্রধান দৈনিকের মধ্যে তিনটিতে এ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি, চতুর্থটিতে হয়েছিল—কিন্তু ওর মধ্যে সম্পাদক বার-তিনেক বলেছেন, 'যদিও তাঁর দেশপ্রেম ভ্রান্ত পথে চলিয়াছিল।' আজকের দিনের তরুণ পাঠক হয়তো অবাক হবেন এ কথা শুনে—তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, সে সময়ে ব্রিটিশ প্রচার এবং মস্তগুপ্তির প্রভাবে নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কীর্তিকলাপ সাধারণ ভারতবাসী জানত না। ব্রিটেনের যুদ্ধজয়ে এবং জাপানের পরাজয়ে তখন ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দল আনন্দিত। সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনার কথা ঘোষিত হবার অব্যবহিত পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ পরিবেশন করি, যা থেকে ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের তদানীন্তন অবস্থা এবং যুদ্ধাবসানে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াটা অনুধাবন করা যাবে:

18.8.45, আনন্দবাজার

গুলমার্গ, সতেরই অগাস্ট — রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইসেকের নিকট নিম্নলিখিত তারবার্তা পাঠাইয়াছেন, 'মিত্রশক্তির এই বিজয় উপলক্ষে আমি আপনার সহিত চীনা জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। চীনের অদম্য জনসাধারণ আট বৎসরব্যাপী অত্যাচারী জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছে এবং অশেষ দুঃখ বরণ করিয়াছে.....(ইউ. পি.)'

" নিউ ইয়র্ক, ষোলই অগাস্ট — শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এখানে রোগশয্যা হইতে মার্শাল চিয়াং কাইসেকের নিকট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, 'আপনাদের জয়ের সংবাদে

আমার অন্তর আপনার ও চীনের বীর জনসাধারণের নিকট রহিয়াছে। আগ্রাসী জাপানের পরাজয়ে চীনে অমানিশার পর প্রত্যুষের আলো আসিয়াছে.....'(রয়টার)''

''23.8.45 আনন্দবাজার

সুভাষচন্দ্রের পৈত্রিক বাসভবন — উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে নিলাম বন্ধ।

1941 সালে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিখোঁজ হইবার পর এলগিন রোডস্থিত পৈত্রিক আবাসে তাঁহার যে এক-চতুর্থাংশ অংশ ছিল গভর্নমেন্ট তাহা ক্রোক করিয়া লন এবং এই মর্মে এক নোটিস জারি করেন যে, ক্রোকী পরওয়ানা জারির ছয় মাসের মধ্যে যদি তিনি আদালতে হাজির না হন তবে উক্ত সম্পত্তি সরকারের বাজেয়াপ্ত হইবে।

গত পনেরই অগাস্ট নীলাম বিক্রয় হইবার কথা ছিল। কিন্তু উপযুক্ত ক্রেতার অভাবে বিক্রয় স্থগিত রাখা হয়। উক্ত সম্পত্তি ক্রয়েচ্ছু দুটি লোক আদালতে হাজির হন। তন্মধ্যে একজন সম্পত্তির মাত্র এক-চতুর্থাংশ ক্রয় করিতে চাহেন।

অপর ব্যক্তি যে সমগ্র নীলামে দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য একশত টাকা মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন।''

'' 23.8.45 আনন্দবাজার

লাহোর, বাইশে অগাস্ট 'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মিত্রপক্ষ কর্তৃক বন্দী হইলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন সভাপতির প্রতি ভারতবর্ষ কিরূপ আচরণ কামনা করে তাহা মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেসী নেতার এক্ষণে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত'— আম্বালার লালা দুনীচাঁদ এম. এল. এ(কংগ্রেস) সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন। লালা দুনীচাঁদ বলেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শত্রুদেশে গিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়া যত বড় ভুলই করুক না কেন, তিনি সম্মানজনক শত্রুরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।''

এই পটভূমিকায় পরদিন চব্বিশে সমস্ত দৈনিকপত্রে সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনা তথা মৃত্যুর কথা প্রচারিত হয়। নিশি-নিশি সিম্বুম পত্রিকায় প্রকাশিত তেইশ তারিখের পত্রিকার বক্তব্যের সঙ্গে সে সংবাদের মূলত কোন প্রভেদ নেই; কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রে একথা বলা হয়নি যে, তিনি জাপানে মারা গেছেন। আনন্দবাজারে ঐ সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হয়। সর্বভারতীয় কোন নেতার শোকবার্তা প্রথম দিন কলকাতার কোন দৈনিকে প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র দু'জন স্থানীয় নেতার বাণী ছাপা হয়েছিল। ফজলুল হক বলেন, 'কী জীবনের কী পরিণতি। ভ্রান্ত উৎসাহের ফলে কী বিপুল সম্ভাবনারই না সমাধি হইল।' আর কিরণশঙ্কর রায় বলেন, 'তিনি এখন ইতিহাসের বিষয়। তথাপি ভারতবর্ষের প্রতি গৃহে গভীরতম শোক ও বেদনা দেখা দিবে।'

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হবার অব্যবহিত পূর্বে বাইশে অগাস্ট মারিতে এক জনসভায় জওয়াহরলাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন:

"23.8.45 , আনন্দবাজার

মারি, বাইশে অগাস্ট — ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে যে সমস্ত ভারতীয় তথাকথিত ভারতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু বলেন, তিন বৎসর পূর্বে আমি এইরূপ অভিমত পোষণ করিতাম এবং এখনও আমি এইরূপ অভিমত পোষণ করি যে, এই বাহিনীর নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য লোকজন বহু বিষয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং জাপানের সঙ্গে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনক সহযোগিতার বৃহত্তর ফলাফল কী হইবে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।"

এখানে আমাদের একটি জিনিস ভেবে দেখতে হবে—যার সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যুরহস্য এবং সে রহস্যের সঙ্গে জওয়াহরলাল নেহেরুর সম্পর্কটা জড়িত। জওয়াহরলাল অগাস্ট '42 থেকে জুন '45 এই দীর্ঘ সময়কাল ব্রিটিশের কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। ফলে সেই সময় সম্ভবত তিনি পূর্ব-এশিয়া থেকে প্রচারিত নেতাজীর রেডিও বক্তৃতা স্বকর্ণে শোনেননি। কিন্তু মহাত্মাজী 1944 সালের ছয় মে কারামুক্ত হন। সুতরাং ছয় জুলাই রেঙ্গুন বেতার-কেন্দ্র থেকে নেতাজী জাতির পিতাকে সম্বোধন করে যে বক্তৃতা দেন তাঁকে 'Father of the Nation' নামে প্রথম সম্বোধন করে এবং তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, তা মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয় কোনও না কোন সূত্রে শুনেছেন।

19.6.45 থেকে 24.7.45 পর্যন্ত দীর্ঘ সাঁইত্রিশ দিন ধরে নেতাজী সিঙ্গাপুর থেকে গান্ধীজী, জওয়াহরলাল ও মৌলানা আজাদকে সম্বোধন করে যে বক্তৃতাগুলি দেন তার কিছু কিছু ঐ তিনজন নিশ্চয়ই শুনেছিলেন — কারণ তাঁরা তিনজনই তখন কারাগার থেকে মুক্ত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কৃষ্ণনগরে বসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্বকর্ণে অল্পদামের বেতার-যন্ত্রে আমি এর কয়েকটি শুনেছি। সুতরাং ওঁরা কেউ শোনেননি এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তা সত্ত্বেও কেমন করে জওয়াহরলালের মত জননেতা সুভাষচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পারলেন না।

এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে :

1. কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে নতুন ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করে সহযোগী সুভাষ দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে একলা বিদেশে গিয়ে একক প্রচেষ্টায় যে অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেন জওয়াহরলাল সেটা সহ্য করতে পারেননি।

2. যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হয়েছে—যুদ্ধান্তে ইংরেজ শাসক শাসনক্ষমতা দক্ষিণপন্থী ভারতীয় কংগ্রেসের হাতে দিয়ে যাবে এমন একটা সম্ভাবনা থাকায় প্রকাশ্যে তিনি নেতাজীর পথকে ভ্রান্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

3. জওয়াহরলাল বুঝতে পেরেছিলেন, সুভাচন্দ্রের এই বিপুল সাফল্যের সংবাদ বিরুদ্ধ প্রচারের প্রাচীর ডিঙিয়ে যখন ভারতবর্ষের উপকূলে এসে পৌঁছাবে তখন সদ্য-

স্বাধীন ভারতবর্ষে বামপন্থী রাজনীতিকদের স্থান অনেক জোরদার হবে। শাসন-ক্ষমতা যাতে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে সীমিত থাকে তাই তিনি বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্রের পথকে সমস্ত জেনেশুনেও ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন।

সে যাই হোক, ভারতীয় সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় দেখা গেল প্রথমাবস্থায় সেটা কেউই বিশ্বাস করেনি। মহাত্মা গান্ধী, জওয়াহরলাল বা আজাদ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কোন শোকবার্তা জ্ঞাপন করেননি। সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 24.8.45 তারিখে।

" 25.8.45, আনন্দবাজার

পুনায় মৃত্যু-সংবাদ সন্দেহ (বিশেষ সংবাদদাতা)

পুনা, চব্বিশে অগাস্ট — ডাঃ দিনশাহ্ মেহতার স্বভাব-চিকিৎসা ভবনের উপর অদ্য ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা অর্ধনমিত রাখার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকায় তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঐ ক্লিনিকে অবস্থান করিতেছেন।"

এই সংবাদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ঐ চিকিৎসা ভবনের পতাকা যে অর্ধনমিত করা হল না, নিঃসন্দেহে তা মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী। অর্থাৎ গান্ধীজী এ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিশ্বাস করেননি।

এই প্রসঙ্গে কিছু পূর্বকথা স্মরণ করা দরকার। বেয়াল্লিশ সালের আঠাশে মার্চ তারিখে ইঙ্গো-মার্কিন সংবাদ-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচার করা হয় যে, সুভাষচন্দ্র জাপানের উপকূলে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মহাত্মা গান্ধী সেবার কলকতায় সুভাষচন্দ্রের জননী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীকে একটি তারবার্তায় বলেন, "আপনার বীর সন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র জাতি আপনারই ন্যায় শোকাতুর। ভগবান আপনাকে এই অনাশঙ্কিত ক্ষতির বেদনা সহ্য করিবার শক্তি দিন।"

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদও একটি প্রেস-স্টেটমেন্টে বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রণালী সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার মতানৈক্য বিদ্যমান থাকিলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি যে আদর্শে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই আদর্শের জন্যই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।" (আনন্দবাজার 28.3.42)

ঐ 28.3.42 তারিখেই টোকিওতে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক প্রথম এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর তার কয়েকদিন আগে 13.3.42 তারিখে সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে কংগ্রেস-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীকে বলেছিলেন ক্রিপস মিশন প্রত্যাখ্যান করতে। ফলে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে স্বতই মনে হয়েছিল সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে টোকিওতে এশীয় সম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন। তাই টোকিও উপকূলে তাঁর বিমান দুর্ঘটনার কথা সত্য বলে মেনে নিতে কারও সন্দেহ হয়নি।

সৌভাগ্যক্রমে তার পরেই জানা গেল, সুভাষচন্দ্র বহাল তবিয়তে জার্মানিতেই আছেন। তখন মহাত্মাজী ও আজাদ যুক্তভাবে সুভাষ-জননীর কাছে আবার একটি তারবার্তা পাঠান: "ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, যাহা সত্য বলিয়া শোনা গিয়াছিল তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।"

এবার অর্থাৎ '45 সালের অগাস্ট মাসে অবশ্য সুভাষ-জননীকে তারবার্তা পাঠাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ সুভাষ জননী প্রভাবতী দেবী ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তার আগেই — 28.12.43 তারিখে — লোকান্তরিতা হয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন, তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। গান্ধীজী তবু কোন শোকবার্তা পাঠাননি। সুভাষের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর তখন যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

দু-তিন দিনের মধ্যেও যখন মৃত্যু-সংবাদের কোন প্রতিবাদ কাগজে ছাপা হল না, তখন সর্বভারতীয় নেতারা একে একে শোকবার্তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন:

27.8.45, আনন্দবাজার

"প্রবাসে যে শোচনীয় অবস্থায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইবে।..... তাঁহার স্বদেশপ্রেম সন্দেহের অতীত। একটা সঙ্কটের সময় ভ্রান্তপথে পদক্ষেপ না করিলে আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাকিতেন।"— মৌলানা আজাদ।

"সুভাষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে; কিন্তু ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জন করিলেন। তাঁহার ন্যায় সাহসী সৈনিকের ভাগ্যে অনেক সময় যে দুঃখ-দুর্দশা নিহিত থাকে, তিনি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন ইহাই আমার স্বস্তি। তিনি শুধু সাহসী ছিলেন না, তাঁহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর। তিনি জানিতেন, যাহা কিছু করিতেছেন তাহা ভারতের স্বাধীনতার জন্যই করিতেছেন। ....অনেক বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতভেদ ছিল। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া পৃথক ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি যে সংগ্রাম করিয়াছেন এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

(—জওয়াহরলাল নেহেরু, এবোটাবাদের সভায় বক্তৃতা।)

পাঠক আমাকে মাপ করবেন। এইখানে নেহেরুজীর চরিত্র বিশ্লেষণে আমি তাঁদের কিছু সময় নেব। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে নেহেরুজীর শোকবার্তায় তাঁর মর্মাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক নিশ্বাসে তিনি বলেছেন —'ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে।' এই বাক্যটির নানা রকম অপব্যাখ্যা হতে পারে। নেহেরুজী বক্তৃতাকালে বড় বেশি কথা বলতেন, এবং বেফাঁস কথাও বলতেন। পরবর্তী বক্তব্যে তিনি নিজেকে সংশোধনের চেষ্টাও করতেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর স্বস্তির কারণ তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

ধরে নেওয়া যাক, তাঁর ব্যাখ্যাই সত্য। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে যে বিচারসভায় দাঁড়াতে হল না এতেই জওয়াহরলালের স্বস্তি! কিন্তু এ কথার অর্থ কী? ব্রিটিশের বিচারসভার কাঠগড়ায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে দাঁড়ানো মোটেই অসম্মানজনক নয়, বিপ্লবী হিসাবে সেই জীবন স্বেচ্ছায় যে সুভাষচন্দ্র বরণ করে নিয়েছিলেন একথা জানতেন জবাহরলাল। এটাকে অসম্মানজনক মনে করলে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. চাকরি ছাড়তেন না — কাঠগড়ার পরিবর্তে অনায়াসে বিচারকের আসনে বসে রাষ্ট্রদ্রোহীর বিচার করতেন। তা'হলে? তবে কোন 'দুঃখ-দুর্দশা'র কথায় আশঙ্কিত হয়েছিলেন জওয়াহরলাল? নেতাজীকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হল না বলে? দাঁড়ালে কী হত? তিনি মারা যেতেন। বাঙলায় একটা কথা আছে, 'মড়ার বাড়া গাল নেই।' ফলে বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু এবং ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এ দুইয়ের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধিজীবী বাঙালী হিসাবে আমি তো কোন পার্থক্য দেখছি না। তা'হলে জওয়াহরলালের ঐ 'স্বস্তিবোধের' মূল উৎস কোথায় ছিল? 15.8.45 তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুরের গোপন সভায় যখন ফাঁসিতে অথবা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিজের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, অথবা যখন শ্রী এ. এন. সরকার তাঁদের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা বলছিলেন—কই, তখন তো কেউ কোন অস্বস্তি বোধ করেননি!

ফলে জওয়াহরলালজীর নিজস্ব উক্তির — ঐ 'স্বস্তিবোধে'র — সবচেয়ে উদার ব্যাখ্যায় বলতে হয় — দক্ষিণপন্থী নেতারা কারাবরণ এবং লাঠিচার্জের সম্মুখীন হওয়াকেই সাহসিকতার শেষ বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতেন —'দেশের জন্য প্রাণদান' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তাঁরা জানতেন না, বুঝতেন না। হয়তো তাই ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ওঁদের মতে ছিল ভ্রান্ত পথিক।

মনে রাখবেন, এ ব্যাখ্যা না মেনে নিলে সুভাষের মৃত্যু-সংবাদে ঐ স্বস্তিবোধের যে বিকল্প ব্যাখ্যা অপরিহার্য মনে হবে সেটা জওয়াহরলালজীর পক্ষে আরও অগৌরবের।

যাক, যে কথা বলছিলাম। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদের প্রতিবাদ না আসায় ক্রমে ক্রমে এখানে সেখানে শোক-সভার অনুষ্ঠান শুরু হল। স্কুল-কলেজ অফিস আদালত কোন কোন স্থানে বন্ধ হল। জওয়াহরলালজী কাশ্মীর ভ্রমণ করে বোম্বাই আসছিলেন। তাঁর জন্য বোম্বাইয়ে আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছিল — তা বাতিল হল। গান্ধীজী কিন্তু তখনও নীরব! যে কলকাতা করপোরেশনের সর্বময় কর্তা ছিলেন সুভাষ, সেখানে শোকসভায় শোকের প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু সর্বত্রই একটা অবিশ্বাসের হাওয়া। কলকাতা করপোরেশনের কথাই ধরুন: 29.8.45 আনন্দবাজার

"গতকাল মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি সভাপতির আসন হইতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত একমাত্র ইউরোপিয়ান দল ব্যতীত মুসলীম লীগ সহ করপোরেশনের অন্যান্য সকল দলই উঠিয়া দাঁড়ান। মেয়র তখন ইউরোপিয়ান দলের

নেতা মি. জে. এইচ. মেথল্ডকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইবেন কিনা।

মি. মেথল্ড: না স্যার।

মেয়র: আমি আপনাদের সভাস্থল হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিতেছি।

মিঃ মেথল্ড: আমরা শ্রীযুক্ত বসুকে মৃত বলিয়া মনে করি না।

মেয়র: অনুগ্রহ করিয়া কোন যুক্তিতর্ক আনয়ন করিবেন না। আপনারা বাহির হইয়া যাইবেন কি?

তৎপর একজন সদস্য (মি. এ. এ. ওয়াইজ্) ব্যতীত ইউরোপীয় দলের অপর সকল সদস্যই সভাস্থল ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যান।

মেয়র তৎপর উপবিষ্ট ইউরোপীয় সদস্য মি. ওয়াইজকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইবেন কিনা।

মি. ওয়াইজ উঠিয়া বলেন, আপনি এমন একজনের জন্য আমাকে শোক প্রকাশার্থে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিতেছেন যিনি মৃত নহেন। আর সেই জন্যই আমি মনে করি শোক-প্রস্তাবটি বিধিভূত নহে।

মেয়র: আমি কোন তর্কে অবতীর্ণ হইব না। হয় আপনি উঠিয়া দাঁড়ান অথবা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান।

অতঃপর মি, ওয়াইজ উঠিয়া দাঁড়ান এবং শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

29.8.45, আনন্দবাজার

"নয়াদিল্লী, উনত্রিশে অগাস্ট (এ.পি.) — একজন মার্কিন সাংবাদিক পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরুকে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, বসুর প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাঁর লোকজন বহু আমেরিকানকে নিহত করিয়াছে এবং তিনি ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছেন। উক্ত সাংবাদিক আরও বলেন, সুভাষচন্দ্র বসু সম্ভবত মারা যান নাই। জীবিতাবস্থায় সাইগনে আছেন।

জওয়াহরলালকে ধন্যবাদ। এই মার্কিন সাংবাদিককে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন,

(ক) সুভাষচন্দ্র মার্কিন-ভূখণ্ডে গিয়ে আমেরিকানদের হত্যা করেননি। যে সমস্ত আমেরিকান মালয়-বর্মায় তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধা দিয়েছিলন তাদের তিনি নিহত করেন;

(খ) ব্রিটিশ সরকারও ভারতবাসীর কাছ থেকে জবরদস্তি করে অর্থ আদায় করেছে;

(গ) সুভাষচন্দ্রকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করতে হলে আরও অনেক মহদাশয় ব্যক্তির অনুরূপ বিচার হওয়ার প্রয়োজন এবং সে ক্ষেত্রে বিচারক হবেন সেই সব দেশের লোক যারা এ বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন।

এই প্রত্যুত্তর থেকে কিন্তু বেশ বোঝা যায়, জওয়াহরলাল নেতাজীর কার্যক্রম ও তাঁর

চিন্তাধারার সঙ্গে সে সময়ে সম্যক পরিচিত ছিলেন।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মৃত্যু-সংবাদ-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে অবিশ্বাস জানানো হয়েছিল:

2.9.45. সানডে অবজার্ভর, লন্ডন।

"শ্রীবসু দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন বলিয়া জাপ মহল হইতে প্রচারিত সংবাদটি ব্রিটিশ-মার্কিন সামরিক মহল বিশ্বাস করিতেছেন না। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করার জন্য কোন কোন মহল যে পণ্ডিত জওয়াহরলালকে অনুরোধ করিয়াছেন, উহাতে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া জনৈক মার্কিন সাংবাদিক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মার্কিন সংবাদদাতা অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীর মতই কেন শ্রীবসুর বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন, জাপ রেডিও শ্রীবসুর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার কয়দিন পরে তাঁহাকে সাইগনে দেখা গিয়াছে এমন প্রমাণ আছে।"

3.9.45, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

"ক্যান্ডি, 3.9.45 —শ্যাম সেনাবাহিনীর সহ-প্রধান সেনাপতি আকাদি যোনানবং শ্যাম সামরিক মিশনের সহিত এখানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলেন, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের যে মৃত্যু-সংবাদ জাপানীরা প্রচার করিয়াছে নানা কারণে তাহা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।"

শুধু অসামরিক লোকেদের মনেই যে সন্দেহ জেগেছিল তাই নয়—মার্কিন ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সমর-নায়কেরাও বুঝতে পেরেছিল সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ একটা মিথ্যা প্রচার— জাপ-সরকার ও নেতাজীর মিলিত ষড়যন্ত্র। মার্কিন সমর দপ্তর বর্মা-মালয়ে চীন-জাপানে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য একদল গুপ্তচরকে পাঠায়। তাদের অনুসন্ধানের কী ফল হয়েছিল তা একেবারে গোপন আছে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার গুপ্তচর বিভাগ মেসার্স ডেভিস ও ফিনলে নামে দু'জন ধুরন্ধর গুপ্তচরের অধীনে দু'জন ভারতীয় গুপ্তচরকে ঐ একই উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে পাঠান। এই দু'জন গুপ্তচর বাঙালী — তাঁদের নাম সর্বশ্রী এইচ. কে. রায় ও কে. পি. দে। তাঁরা 1956 সালের অনুসন্ধান কমিটির কাছে স্বীকার করেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের মৃত অথবা জীবিত থাকার কোন নিশ্চিত প্রমাণ তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেননি। ফলে একসময় অনুসন্ধান কার্য পরিত্যক্ত হয়।

এরপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তথাকথিত দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট তৈরি করেছিল তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিই:

" SECRET HEADQUARTERS

Main file no,10 Misc/INA, 273

Sub: Subhas Chandra Bose (Extract bearing on his alleged death. Pages 38 & 39)

" জানুয়ারি ('46) মাসে গান্ধীজী প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন সুভাষচন্দ্র জীবিত এবং কোথাও আত্মগোপন করে আছেন.....তিনি বলেন, এ সংবাদের মূল উৎস তাঁর অন্তরের নির্দেশ। কংগ্রেসীরা মনে করে গান্ধীর অন্তরের নির্দেশ বস্তুত কোন গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করেই....একটি গোপন সূত্রের রিপোর্টে জানা গেছে নেহেরু বোসের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে তিনি রাশিয়াতে আছেন। বোস নাকি গোপনে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। .....ঐ সূত্র এ কথাও জানিয়েছে, এ গোপন সংবাদ যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানেন তাঁদের মধ্যে আছেন গান্ধী ও শরৎ বোস। মনে হয়, এই পত্রটি যে সময়ে আসে ঠিক তার পরেই গান্ধী সর্বসমক্ষে তাঁর অন্তরের নির্দেশের কথা বলেন। ঐ জানুয়ারিতেই শোনা যায় শরৎ বোস বলেছিলেন, তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁর ভ্রাতা জীবিত। আর একটি খবর পাওয়া যাচ্ছে সীমান্তপ্রদেশ ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতির একটি পত্রে। এ পত্রে পত্রলেখক জানিয়েছে যে, বোস তুর্কিস্তানের কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং পত্রলেখক তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। ভারতের ভিতরে এবং বাইরে থেকে যেসব গোপন সংবাদ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা সবই বিভ্রান্তিকর! সাতই জানুয়ারি রাশিয়ার সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা' তীব্র ভাষায় বলেছে যে, বোস রাশিয়ায় আছে বলে যে সংবাদ রটেছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তার পূর্বে খিলজাই মালাভ একজন জীবিত বোসের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে কিছু প্রচার করেছিল এবং একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, আফগানিস্তানের খোস্ত-প্রদেশের গভর্নরকে গত ডিসেম্বর মাসে কাবুলস্থ রুশ-রাষ্ট্রদূত গোপনে জানিয়েছিলেন যে, অনেক কংগ্রেসী নেতা মস্কোতে আশ্রয় নিয়েছেন আর তার মধ্যে বোসও আছেন। এইসব লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মিথ্যা গালগল্প প্রচার করার কোন উদ্দেশ্য নেই। অপর পক্ষে তেহরান থেকে প্রাপ্ত একটি গোপন রিপোর্টে দেখছি রুশ অফিসারেরা স্বীকার করছেন বোস মস্কোতেই আত্মগোপন করে আছেন। এই গোপন রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, রুশ ভাইস-কনসাল জেনারেল মোরাদক গত মার্চ মাসে বলেছিলেন, বোস রাশিয়াতেই আছেন—সেখানে তিনি আই. এন. এর অনুরূপ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে রাশিয়ানদের নিয়ে একটি গোপন দল গঠন করছেন। তাইহকু, কংগ্রেস এবং কাবুল ও তেহরানস্থিত রুশ প্রতিনিধিদের উপরেই আমাদের তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে—এখন পর্যন্ত যা বোঝা যাচ্ছে, ঐ তিন সূত্রের মধ্যেই এ বিষয়ের মূল সত্য নিহিত।"

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি এ কথা প্রচার করার জন্য একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষে তখন সক্রিয় ছিলেন; হয়তো এখনও আছেন। হয়তো বিভিন্ন স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বারে বারে নানান খবর আজ পঁচিশ বছর ধরে রটিয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগে শৌলমারীর সন্ন্যাসীর মধ্যে নেতাজীকে কয়েকজন

আবিষ্কার করেছিলেন — তা নিয়ে অনেক পরিশ্রম, অনেক অর্থব্যয় করা হয়েছে — সুভাষদরদী জনসাধারণের ন্যায্য দাবী (এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক, সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হোক) বেশ কিছুদিন অন্য হৈচৈতে বিক্ষিপ্তও রাখা গিয়েছিল। কল্যাণী শহরে কোন এক বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করবেন, এ সংবাদ একদল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি রটিয়েছিল, তাতে লোকের হয়রানি কম হয়নি। এইসব স্বার্থ-প্রণোদিত লোক বা গোষ্ঠী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ জাতীয় প্রচার করেছে উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি সে জাতীয় লোকের কলম থেকে বার হয়নি। সুতরাং এর মধ্যে অতিরঞ্জন, মিথ্যা প্রচার বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ছড়ানোর কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ হচ্ছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দলের গোপনতম ফাইল থেকে সংগৃহীত তথ্য। সুভাষচন্দ্র মারা গেছেন এটা প্রমাণিত হলেই তারা হরির লুটের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত!

মোট কথা এইসব তথ্য থেকে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবী বিশ্বাস করতে পারেনি যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে জাপানের আত্মসমর্পণের মাহেন্দ্রক্ষণে, যখন নেতাজীর আত্মগোপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল উদগ্র, ঠিক তখনই তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধানের হেতু হচ্ছে একটি বিমান-দুর্ঘটনা! বস্তুতপক্ষে তথাকথিত দুর্ঘটনার পরে প্রথম দু'টি বৎসর ভারতে এবং ভারতবর্ষের বাইরে সুভাষ-অনুরাগীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হননি। নেতাজী যদি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকেন তবে তাঁর সন্ধান করতে যাওয়াটা হত প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়া! কিন্তু সাতচল্লিশ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হল তখন আর এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কোন অর্থ থাকল না। তখন থেকেই মানুষের দুর্বার কৌতূহল প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কোন সূত্র থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ভারত সরকার কোন উৎসাহ দেখালেন না, এ বিষয়ে কোন তদন্ত করার চেষ্টাও করলেন না।

প্রসঙ্গত বলতে পারি, যুদ্ধের শেষ দিকেই অর্থাৎ দেশের শাসনভার কংগ্রেস গ্রহণের পূর্ব থেকেই জেনারেলিসিমো চিয়াঙ কাইসেকের সঙ্গে জওয়াহরলালজীর সৌহার্দ্য হয়েছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় জওয়াহরলাল, আজাদ এবং বিজয়লক্ষ্মীর মতো কংগ্রেস-নেতা জেনারেলিসিমোকে তারবার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, এই তারবার্তা বিনিময়ের সংবাদ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 24.8.45 তারিখে। বস্তুত যেদিন নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ কথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, ক্ষমতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে জওয়াহরলাল যদি নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ যাচাই করবার জন্য জেনারেলিসিমোকে ব্যক্তিগত অনুরোধ করতেন তা'হলে অনায়াসে একদল ভারতীয় অনুসন্ধানকারী চিয়াঙের কর্তৃত্বাধীন ফরমোসা দ্বীপে সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে পারত সেই সাতচল্লিশ সালেই। দুর্ভাগ্যক্রমে জওয়াহরলাল তা করেননি।

কেন করেননি? সে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। সে কথা বিচার করে দেখবার ভার আপনাদের ওপর। আমি শুধু প্রসঙ্গত পুনরুল্লেখ করব — নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে জওয়াহরলাল তাঁর প্রথম বাণীর প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলেছিলেন, "সুভাষবাবুর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে মর্মাহত করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমাকে স্বস্তিও দিয়াছে।" (আনন্দবাজার, 27.8.45)

শুধু তাই নয়, ছাপ্পান্ন সালে জনমতের চাপে পড়ে জওয়াহরলাল যখন একটি 'অনুসন্ধান কমিটি' নিয়োগ করতে বাধ্য হলেন, তখনও ভারত সরকার সেই কমিটিকে ফরমোসা দ্বীপে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবার কোন সুযোগ দেননি! কোন চেষ্টাই করেননি। কমিটি তাঁদের সরকারী ব্যয়ে ছাপা রিপোর্টে বলছেন:

"কমিটির সদস্যরা ফরমোসা দ্বীপে তদন্ত করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন — কারণ সেটাই ছিল বিমান দুর্ঘটনা, নেতাজীর মৃত্যু ও দাহকার্যের অকুস্থল। কিন্তু সে কাজে বাধার সম্মুখীন হলাম আমরা, কারণ ভারত সরকারের সঙ্গে ফরমোসা দ্বীপের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ভারত সরকারকে এ বিষয়ে আমরা জানিয়েছিলাম, কিন্তু ভারত সরকার আমাদের জানিয়েছেন, ফরমোসায় কোন সরজমিনে তদন্ত করার ব্যবস্থা সম্ভবপর নয়। সুতরাং সে চেষ্টা থেকে আমরা বিরত থাকব!" (1/3)

ভারত সরকারের এই অক্ষমতায় ভারতবাসী বিস্মিত হয়েছে শুধু।

যাই হোক, তথাকথিত দুর্ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রী এস. এ. আইয়ার 1951 সালের জুন মাসে একবার জাপান যান। উদ্দেশ্য — জাপানে নেতাজী রহস্য সম্বন্ধে তদন্ত করা। ঠিক জানি না, তিনি স্বেচ্ছায় যান অথবা সরকারী ব্যয়ে। যাই হোক, তাঁর এ অভিযানের কথা যখন জানা গেল তখন লোকসভায় শ্রী হরিবিষ্ণু কামাথ প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলালকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এই প্রথম নেতাজী সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত তথ্য জানতে পারল সাধারণ মানুষ। এই প্রশ্ন ও উত্তর লোকসভার বিবরণীতে পাচ্ছি। তার অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ। মূল তথ্য যথাসম্ভব অবিকৃত রাখতে আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করেছি—ভাষার দিকে নজর না রেখে:

পৃষ্ঠা 505 : লোকসভার বিতর্ক : প্রথম খণ্ড/ 5.3.1952

লোকসভা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে

* 334 শ্রী কামাথ: প্রধানমন্ত্রী কি অনুগ্রহ করে জানাবেন:

(ক) এ কথা কি সত্য যে, বোম্বাই সরকারের প্রচার বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রী এস. এ. আইয়ার সম্প্রতি টোকিও থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং সরকারকে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন যার বিষয়বস্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু অথবা তাঁর বর্তমান অবস্থান, এবং

(খ) এ কথা সত্য হলে সেই রিপোর্টের একটি অনুলিপি কি লোকসভার টেবিলে পেশ করা সম্ভব? এবং

(গ) তা সম্ভব না হলে অন্তত সেই রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্তসার কি সদস্যদের জানাতে পারেন?

প্রধানমন্ত্রী (শ্রীজবাহরলাল নেহেরু):

(ক) থেকে (গ): গত পনেরই সেপ্টেম্বর, 1951 তারিখে শ্রী এস. এ. আইয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জানান যে, মে মাসের শেষ দিকে তিনি স্বল্পকালের জন্য জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল তাইহকুতে (ফরমোসা দ্বীপ) 18.8.45 তারিখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর সংবাদ পুনরায় যাচাই করে দেখা। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কিছু কাগজপত্র, আলোকচিত্র এবং জাপানীদের স্বাক্ষরিত কিছু নথিপত্রও দেখান। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে শ্রী আইয়ার গত ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর একটি বিস্তারিত রিপোর্টও পাঠিয়েছেন। সেই বিস্তারিত রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্তসার সদস্যদের জ্ঞাত্যর্থে এখানে সংযুক্ত করা হল:

"পৃষ্ঠা 103 : পরিশিষ্ট 21

"অ্যাপেনডিক্স নং 1. পার্লামেন্টারি ডিবেট : পঞ্চম অধিবেশন, 1952 ।

"সতেরই অগাস্ট, 1945 তারিখে সকাল 5-15 মিনিটে সাইগন বিমানবন্দরে আমার এবং আমার সহকর্মীদের চোখের সম্মুখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং কর্নেল হবিবর রহমানকে নিয়ে একখানি বম্বার প্লেন নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হয়। সাইগন থেকে একটি বিমান বিশ-এ অগাস্ট জাপানের দিকে যাচ্ছিল, এবং জাপানী কর্মকর্তারা আমাকে সেই প্লেনে একটি আসন দিল যাতে আমি নেতাজীর সঙ্গে অনতিবিলম্বে মিলিত হতে পারি। সেদিন সকালে আমি সাইগন বিমানবন্দরে আসি এবং ঘটনাচক্রে সেখানে আমার সঙ্গে মি. ফুকুওকার দেখা হয়ে যায়। ফুকুওকা ছিলেন পূর্ব-এশিয়া অঞ্চলে ডোমেই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রধান। হঠাৎ তিনি বললেন, যে নেতাজীর জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁর কথা থেকে আমি ভেবেছিলাম বোধ করি খারাপ আবহাওয়ার জন্য নেতাজী ফরমোসা দ্বীপে আটকে আছেন। তার অল্প পরে আমি যখন বিমানে আরোহণ করতে যাচ্ছি তখন জাপানী নৌ-সেনার রিয়ার অ্যাডমিরাল চুদা আমাকে বললেন যে, নেতাজী মারা গেছেন। তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করার সময় আমি পাইনি, কারণ পরক্ষণেই আমাকে প্লেনে উঠতে হল এবং প্লেনটি ছেড়ে দিল।

" আমরা যখন বিকাল পাঁচটায় ক্যান্টনে পৌঁছলাম তখন প্লেনটি পেট্রোল ভরে নিতে থামল। তখন কর্নেল টাদা (যিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন) আমাকে একপাশে নিয়ে এসে বললেন, নেতাজীর প্লেনটি তাইহকুতে (ফরমোসা দ্বীপে) আঠারই অগাস্ট ভেঙে পড়ে, নেতাজী গুরুতররূপে আহত হন এবং সেই রাত্রেই মারা যান। কর্নেল

হবিবর রহমানের আঘাত অত বেশী নয়, সে জীবিত আছে এবং এখন তাইহকুর একটি হাসপাতালে আছে। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাকে যেন তাইহকুতে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে আমি নেতাজীর শবদেহ স্বচক্ষে দেখতে পারি এবং হবিবকেও সাহায্য করতে পারি। আমি তাঁকে একথা বলেছিলাম, নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া ভারতবর্ষে কেউ এই দুর্ঘটনার কথা বিশ্বাস করবে না। যদিও কর্নেল টাদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে আমাকে তাইহকুতে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

"আমরা বাইশে অগাস্ট, 1945 তারিখে টোকিওতে এসে পৌঁছলাম। জাপানী কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি ছোট্ট সংবাদ ঘোষণা করে নেতাজীর মৃত্যুর কথা প্রচার করেন।

" সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে আমি এবং শ্রীরামমূর্তি -- যিনি ছিলেন জাপানে অবস্থিত আই. আই. লীগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান — আমরা দু'জনে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁরা আমাদের জানালেন যে, পূর্বদিন হবিব ফরমোসা থেকে নেতাজীর চিতাভস্ম নিয়ে এসেছে। নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সেটি তাঁরা আমাদের হস্তান্তরিত করতে চাইলেন। ওঁরা জানালেন, সেদিন সন্ধ্যাতেই হবিব আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। আমি তখন একজন উচ্চপদস্থ জাপানী জঙ্গী অফিসারের হাত থেকে 'ইম্পিরিয়াল জাপানীজ মিলিটারি হেডকোয়ার্টাসের' প্রধান প্রবেশ পথে এই চিতাভস্ম গ্রহণ করি এবং শ্রীমূর্তির বাড়িতে নিয়ে আসি। সেই রাত্রেই হবিব আমার কাছে আসে — শ্রী আনন্দমোহন সহায়ের বাড়িতে; সেখানে আমি ছিলাম। অতঃপর হবিব আমাকে যা বলেছিল—অর্থাৎ সতেরই আগস্ট, 1945 তারিখে যখন আমি শেষবারের মত নেতাজীকে সাইগন বিমানবন্দরে দেখি তারপর যা ঘটেছিল, তা হবিবের ভাষাতেই বলি—

" হবিব আমাকে (শ্রী আইয়ারকে সেই 7.9.45 তারিখ রাত্রে) যা বলেছিল: 'সতেরই অগাস্ট সাইগন বিমানবন্দর ত্যাগ করার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমরা তুরেন-এ (ইন্দোচীন) উপনীত হলাম এবং সেখানেই রাত্রিবাস করলাম। পরদিন খুব সকালে আমরা আবার রওনা হলাম এবং বেলা দু'টা নাগাদ (18.8.45) তাইহকু বিমানবন্দরে এসে নামলাম। সেখান থেকে আবার আমরা বেলা দুটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে রওনা হই। আমরা রানওয়ে অতিক্রম করে শ-দু'ফিট উপরে ওঠার পর একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভেবেছিলাম, এ বুঝি শত্রুপক্ষের একটি ফাইটার বিমান। পরে আমি শুনেছিলাম যে, ডানদিকের একটি প্রপেলার ভেঙে গিয়েছিল। বিমানটি টাল খাচ্ছিল এবং চালকের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিমানটি নাকি ভেঙে পরল। সমস্ত চরাচর মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমার ঘাড়ের উপর মালপত্রের বোঝা, এবং সামনের দিকে আগুনের লেলিহান শিখা। সুতরাং 'ছন দিক

দিয়ে নিষ্ক্রমণের পথ মালপত্রে বন্ধ এবং সামনের দিক দিয়ে বার হতে হলে আগুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। নেতাজীর আঘাত লেগেছিল মাথায়—কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন। এদিকে বার হবার পথ না থাকায় আমি বললাম, আগেসে নিকালিয়ে নেতাজী।

'দু'হাত দিয়ে পথ করে আগুনের মধ্য দিয়েই তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং দশ-পনের ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্লেনটি ভেঙে পড়ার সময় এক ঝলক পেট্রোল তাঁর সুতির খাকি পোশাকে ছিটিয়ে পড়ে। তাই আগুনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় তাঁর পোশাকে আগুন ধরে যায়। সুতরাং তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁর জ্বলন্ত পোশাক খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর বুশকোটের বেল্টটা তিনি খুলতে পারছিলেন না। আমি তাঁর দিকে ছুটে গেলাম এবং বেল্টটি খুলে ফেলতে তাঁকে সাহায্য করলাম। কয়েক মিনিট পরেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। তিনি মাটির ওপর পড়ে রইলেন। আমিও আর স্থির থাকতে পারিনি, তাঁর পাশেই শুয়ে পড়লাম। এর পরের যে ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে তা হল এই যে, নেতাজীর পাশের খাটে আমি একটি হাসপাতালে শুয়ে আছি। পরে শুনেছি, বিমান দুর্ঘটনার পনের মিনিটের মধ্যেই মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স আমাদের তাইহকুর একটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে পৌছানোর অব্যবহিত পরেই নেতাজী জ্ঞান হারান। অল্প পরেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর নিশ্চয়ই প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু সে-কথা-তিনি একবারও বলেননি। মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান হারালেও তিনি বরাবর সজ্ঞানে ছিলেন বলা যায়। মৃত্যুর ঠিক আগেই তিনি আমাকে বলেন: আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। আমি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য আজ মারাও যাচ্ছি। দেশে ফিরে গিয়ে আমার দেশবাসীকে বল — ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সংগ্রাম করে যায়। ভারতবর্ষ অচিরেই স্বাধীন হবে।

'জাপানীরা নেতাজীকে বাঁচাবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু সবই বৃথা হল। হাসপাতালে নিয়ে আসার ছয় ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রাত ন'টার সময় (18.8.45) নেতাজীর জীবনদীপ শান্তভাবে নির্বাপিত হল।

'জাপানীদের সঙ্গে কথা বলবার মত ক্ষমতা ফিরে পাবার পর আমি ওদের বললাম নেতাজীর মরদেহ সিঙ্গাপুরে অথবা টোকিওতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা তা করবে। পরে তারা আমাকে জানালো যে, নেতাজীর শবদেহ তাইহকুর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না, সুতরাং অনতিবিলম্বে সেখানেই আমাদের দাহকার্য সমাপ্ত করতে হবে। তারা এ বিষয়ে আমার অনুমতি চাইল। দ্বিতীয় কোন পথ দেখতে না পেয়ে আমাকে রাজি হতে হল। হাসপাতাল সংলগ্ন মন্দিরে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য করা হয়েছিল। দাহকার্য কুড়ি তারিখে সম্পন্ন হল। ওরা নেতাজীর

চিতাভস্ম একটি ভস্মাধারে (Urn-এ) রাখে এবং মন্দিরে রেখে দেয়।

'তিন সপ্তাহ পরে আমাকে জানানো হল যে, একটি অ্যাম্বুলেন্স-বিমান তাইহকু ত্যাগ করছে এবং তাতে আমি একটি আসন পেতে পারি। আমি নেতাজীর ভস্মের দায়িত্ব নিলাম এবং ঐ প্লেনে যাত্রা করে ছয়ই সেপ্টেম্বর 1945 তারিখে টোকিওতে উপনীত হলাম। টোকিও শহরের শহরতলী অঞ্চলে আমাকে লুকিয়ে রাখা হল। তার দু'দিন পরে জাপানীরা আমাকে আমার গোপন আবাস থেকে বার করে নিয়ে আসে এবং প্রথমে আমার কাছ থেকে ভস্মধারটি এবং পরে আমাকে টোকিও শহরে নিয়ে আসে।' (হবিবের বক্তব্য এখানেই শেষ হল।)

"সেপ্টেম্বর চৌদ্দ তারিখে আমরা টোকিওর রেঙ্কোজী মন্দিরে চিতাভস্মটি নিয়ে আসি। সেখানে তাঁর শেষকৃত্যের একটি অনাড়ম্বর আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা চিতাভস্মটি মন্দিরের পুরোহিতের কাছে গচ্ছিত রেখে এলাম।"

"আমেরিকান মিলিটারি প্রহরীর তত্ত্বাধানে 22.11.45 তারিখে হবিবকে এবং আমাকে নয়াদিল্লীতে নিয়ে আসা হল।"

"1951 সালের মে মাসে শেষ দিকে আমি স্বল্পকালের জন্য জাপানে গিয়েছিলাম। 24.5.51 থেকে 10.6.51 তারিখ পর্যন্ত আমি টোকিওতে ছিলাম। ঐ সময়কালের মধ্যে আমি যতজন সম্ভব জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করি — আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐ বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সত্যতা নিরূপণ। প্রথমেই আমি সেই মন্দিরে যাই এবং দেখে নিশ্চিন্ত হই আমাদের গচ্ছিত ধন নিরাপদেই আছে। সেই একই পুরোহিত তখনও ছিলেন।"

"মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর প্রথমেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মি. ফুকুওকার। যাঁকে আমি সাইগন বিমানবন্দরে 1945 সালের সেই বিশে অগাস্ট তারিখে শেষবার দেখেছিলাম। আমি তাঁকে আমাদের পূর্ব কথোপকথন স্মরণ করতে অনুরোধ করি এবং জানতে চাই ছয় বৎসর পূর্বে সেদিন তিনি কতটুকু জানতেন। তিনি বললেন সে সময়ে তিনি জানতেন যে, নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন এবং নেতাজী আহত হয়েছিলেন — কিন্তু নেতাজী যে মৃত এ খবর তিনি তখন জানতেন না। আমার বিমানটি রওনা হবার কিছু পরে বস্তুত তিনি সে খবর পান। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল — কারণ সাইগনে অবস্থিত বিভিন্ন জাপানী মিলিটারি অফিসারেরা ঐ একই কথা তাঁকে বলেছিলেন।"

"আমি কর্নেল টাদার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে অগাস্ট পঁয়তাল্লিশে সাইগন থেকে টোকিওতে নিয়ে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — তাইহকুতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন না। উনি বললেন যে, যেহেতু তাইচু পৌঁছাতেই রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছিল তাই তাইহকু যাওয়া

নিরাপদ মনে হয়নি। কারণ তাইহকু বিমান পোতাশ্রয়ের চারদিকে ছিল পাহাড়।"

"আমি কর্নেল নোনাগাকির সঙ্গে টোকিওতে দেখা করি। জীবনে প্রথম। 5.6.51 তারিখে। তিনি বিমান দুর্ঘটনায় একটি নিখুঁত বর্ণনা দেন। মোটামুটিভাবে সে বর্ণনা হবিবের ছয় বছর আগে দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। কর্নেল নোনাগাকির সাহায্যে আমি পরে ক্যাপ্টেন আরাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনিও সংক্ষেপে বিমান দুর্ঘটনার একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেন এবং উপসংহারে বলেন 18.8.45 তারিখে রাত্রি নয়টায় নেতাজীর দেহাবসান ঘটে।"

"এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা নিবেদন করতে চাই। 1951 সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অবস্থান কালে আমার সঙ্গে শ্রী হারিন শাহ-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি বোম্বাইয়ের 'ভারত' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। তিনি '46 সালে ফরমোসা দ্বীপে নিজে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর তদানীন্তন অনুসন্ধানের কথা আমাকে বিস্তারিতভাবে জানান। সেই অনুসন্ধান থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তাইহকুতে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর মরদেহ দাহ করা হয়। তিনি আমাকে অনেকগুলি আলোকচিত্র দেখালেন—জাপানী আর্মি হাসপাতালের প্রধান, যে হাসপাতালে নেতাজীর চিকিৎসা হয়েছিল, যে সার্জেন নেতাজীর চিকিৎসা করেন, যে নার্স তাঁকে শুশ্রূসা করেছিল, মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টির যে অধ্যক্ষ নেতাজীর রক্তদানে সাহায্য করেন এবং যে সব ছাত্র এই রক্তদান করেছিল, এদের আলোকচিত্র!"

"উপসংহারে আমি আবার বলতে চাই, আমার মনে সামান্যতম সংশয়ও নেই যে, টোকিও শহরের রেঙ্কোজী মন্দিরে সংস্থাপিত ভস্মরাশি নেতাজীরই।"

(আইয়ারজীর রিপোর্ট সমাপ্ত)

1952 সালের তেশরা মার্চ তারিখের লোকসভায় উপস্থাপিত এই রিপোর্ট আলোচনার পর আমরা উপনীত হব 29.9.55 তারিখে। সাড়ে তিন বৎসরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে দেশী -বিদেশী নানা পত্রিকায় নেতাজী সম্বন্ধে নানারকম সংবাদ বের হয়েছে। কেউ বলছেন তাঁকে চীনে দেখা গেছে, কেউ বলছেন তিনি সাইবেরিয়ায় বন্দী হয়ে আছেন। সুভাষ-অনুরাগীরা প্রতি বৎসর তেইশে জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন পালন করছে আর সরকারকে একটা তদন্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল এবং তাঁর সরকার সে অনুরোধে কোনও কর্ণপাত করেননি।

1955 সালের উনত্রিশে সেপ্টেম্বর দেখছি পুনরায় লোকসভায় শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ জানতে চাইছেন — কেন প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে এমন উদাসীন, — কেন ভারত সরকার নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান নিয়ে একটি তদন্তের ব্যবস্থা করছেন না। প্রধানমন্ত্রী তার জবাবে বলেছেন:

"এই ব্যাপারে যদি কোন অনুসন্ধান করতে হয়ে, অর্থাৎ সত্যিকারের ফলপ্রসূ

অনুসন্ধান করতে হয়, তবে একমাত্র জাপান সরকারই তা করতে পারেন। ঘটনাস্থল জাপান — সেখানেই সব কিছু ঘটেছিল। আমরা জাপানের ওপর চড়াও হয়ে সেখানে কোন অনুসন্ধান করতে পারি না। অবশ্য তারা যদি স্বেচ্ছায় একটি অনুসন্ধানকারী দল পাঠায় তাহলে আমরা সাধ্যমত সেই দলকে সাহায্য করব। কিন্তু আমরা নিজে থেকে তাদের দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করতে পারি না। বিশেষত এ ঘটনার অধিকাংশ সাক্ষীই যখন জাপানী এবং জাপান সরকারের কর্মচারী। সংক্ষেপে ঐ একই কথা বলব, প্রস্তাবটা জাপানীদের কাছ থেকে উত্থাপিত হলেই আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব। সে প্রস্তাব যদি আসে আমরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাহায্য করব।"

(—পার্লামেন্ট প্রসিডিংস্ 29.9.55)

নেহেরুজী গত হয়েছেন। বহু অর্থব্যয়ে আমরা তাঁর চিতাভস্ম বিমানযোগে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছি। তাঁকে অহেতুক আঘাত দেবার কোন বাসনা আমার নেই। কিন্তু তাঁর এই উক্তিটির ব্যাখ্যা যে আমার গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য — তা আমি এড়িয়ে যাব কেমন করে?

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র, যিনি মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতাকামী ভারতীয়ের নিরপেক্ষ নির্বাচনে পুনর্বার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন, তিনি নিঃসংশয়ে ভারতীয় জননেতা। নেহেরুজীর মতে জাপানের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা তাঁর পক্ষে অন্যায় হয়েছিল কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা গণতন্ত্রী ভারত জানতে চায় সেই অবিসংবাদিত জননেতার শেষ পরিণাম কী হল। জাপান সরকার সরকারীভাবে জানিয়েছে যে, তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হয়েছেন, জাপানের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই — ফলে জাপান সরকারের তরফে তদন্তের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভারতবাসীরা সে কথা বিশ্বাস করতে পারছে না — ফলে গরজটা ভারতেরই। এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ না জাপান সরকার নিজে থেকে তদন্ত করতে চাইবে ততক্ষণ ভারত সরকার কেন উদ্যোগী হবেন না এ কথা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আসে না। উদ্যোগী আমাদেরই হতে হবে। অবশ্য জাপান সরকার তার ভূখণ্ডে গিয়ে আমাদের যদি অনুসন্ধান করতে না দেয়, তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই সহজ যুক্তিটা মেনে নিতে পারলেন না 'সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে স্বস্তি পাওয়া' জওয়াহরলাল এবং তাঁর সরকার।

1939 সালে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিল সুভাষ-অনুরাগীরা, এবারও প্রায় সেই ভাবেই দিল। প্রধানমন্ত্রীর ঐ ঘোষণার মাত্র সাত দিন পরেই ছয়ই অক্টোবর, 1955 তারিখে কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় সুভাষ-অনুরাগীরা একটা সভা করলেন। নেতাজী স্মারক সমিতির এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রাক্তন মেজর-জেনারেল শাহ্নওয়াজ খান। তিনি জানালেন যে, প্রধানমন্ত্রী

সরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে। ফলে সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল এ জন্য একটি বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বেসরকারী দানের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। এই সভায় স্থির হয়, নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুকে দলপতি করে অনুসন্ধান কমিটি কাজ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে নেতাজী স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান এগারোই অক্টোবর তারিখে শ্রীসুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কার্মাটারের বাড়িতে দেখা করেন। এর পরের কথা শ্রীসুরেশচন্দ্রের ভাষাতেই বলি (2/21-24) :

"চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান কার্মাটারের বাড়িতে 11.10.45 তারিখে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সভার প্রস্তাবের একটি অনুলিপি আমার হাতে দিয়ে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলেন। তিনি বলেন, নেতাজীর সত্যই শেষ পর্যন্ত কী হল তা ভারতবাসীর জানবার সময় অনেকদিনই পার হয়ে গেছে। ফলে তিনি আমাকে এই বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। তিনি আরও বলেন, দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি শ্রীজওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং যেহেতু প্রধানমন্ত্রী কোন সরকারী অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠনে অনিচ্ছুক তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন এই বেসরকারী কমিটিকে যেন সরকার যথোপযুক্ত সাহায্য করেন। যার ফলে ভারতে ও ভারতবর্ষের বাইরে এই কমিটির পক্ষে অনুসন্ধান-কার্য চালানো সহজতর হবে। শ্রীশাহ্‌নওয়াজ আমাকে আরও বললেন, শ্রীনেহরুর সঙ্গে আলোচনা করে কী হয় তা তিনি আমাকে পত্রযোগে জানাবেন। তারপর তিনি কলকাতায় একটি বৃহত্তর সভার আয়োজন করবেন। সেখানে নেতাজীর অনুরাগী, আজ্ঞাবহ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর দল একত্র হবেন। এমন একটি সভা থেকেই কমিটির অন্যান্য সদস্য নির্বাচন করা হবে। এর জন্য অর্থের কোন অভাব হবে না, বেসরকারী মহল থেকেই তা পাওয়া যাবে এমন কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা এ বিষয়ে আলাপ করে পরের ট্রেনে তিনি দিল্লী চলে যান। তারপর তাঁর আর কোন খবর আমি পাই না। নেহরুজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফল কী হল তাও জানতে পারলাম না। বৃহত্তর যে সভা আয়োজনের কথা ছিল তাও ডাকা হল না। সুতরাং ঐ সময় পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল — চেয়ারম্যানের কথায় যে ধারণা আমার হয়েছিল — যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোন সরকারী কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে। কিন্তু অপরপক্ষে তিনি বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী।

"বস্তুতপক্ষে বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটি আমরা গঠন করতে যাচ্ছি এ সংবাদ জানামাত্র দিল্লীর কর্তাব্যক্তিরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কারণ এই কমিটি হয়তো বলে বসতে পারে যে, নেতাজীর মৃত্যু হয়েনি। তা'ছাড়া ব্রিটিশ প্রভুরা যেসব কাগজপত্র রেখে গেছে — দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাদের সরেজমিনের তদন্ত

রিপোর্ট এই বেসরকারী কমিটি হাতড়ে দেখবে, এটা তাঁরা কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন তা করতে দিলে সমস্ত সত্য ঘটনা প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং এই বেসরকারী কমিটির রায় যদি এই-ই হয় যে, নেতাজীর মৃত্যু হয়নি তা'হলে লোকসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অসত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। ফলে দিল্লীর বড়কর্তারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। সুতরাং 'যতদিন না জাপান সরকার অগ্রণী হচ্ছে ততদিন ভারতবর্ষের কিছু করণীয় নেই' এই নীতি বিসর্জন দিয়ে অচিরে একটি সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করলেন --- যাতে বেসরকারী তদন্ত কমিটির সম্ভাবনাকে নির্মূল করা যায়। এই সরকারী কমিটিতে বশম্বদ দু'টি নিজেদের লোকও নিযুক্ত করা হল।"

পরের দৃশ্য হচ্ছে সরকারী তদন্ত কমিটি নিয়োগ:

সরকারী নোটিফিকেশন নং ' F. 30(26)FEA/55 dated the 5th April 1956 ' দ্বারা ঘোষিত তিন জনের একটি তদন্তকারী কমিটি নিয়োগ করা হল --- যার সভ্য হলেন,

(1) শ্রী শাহ্‌নওয়াজ খান, এম. পি. (মেজর জেনারেল আই. এন. এ.), পরিবহন ও রেলমন্ত্রীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি।

(2) শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ।

(3) শ্রী এস. এন. মৈত্র,—আই. সি. এস., চীফ কমিশনার, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ নয় অবশ্যই)।

শ্রী শাহ্‌নওয়াজ হলেন কমিটির চেয়ার‍্যান। তিনি আই. এন. এ. ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে থাকলেন, শ্রী সুরেশচন্দ্র কমিটিতে সভ্য হিসাবে থাকলেন সুভাষচন্দ্রের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আই. সি. এস. শ্রী মৈত্র থাকলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অন্যতম সভ্য।

অনুসন্ধান কমিটির Terms of Reference বা অনুসন্ধান কার্যের মূলসূত্র হল: 'To enquire into and report to the Govt. of India on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas Chandra Bose about the 16th August 1945, his alleged death as a result of aircraft accident, and subsequent developments connected herewith.'

(ষোলই অগাস্ট, 1945, তারিখের কাছাকাছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যাঙ্কক ত্যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী, একটি বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর তথাকথিত মৃত্যু এবং ঐ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং ভারত সরকারের কাছে তাহা পেশ করা।)

অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি বিচার করার পূর্বে 'টার্মস্ অফ রেফারেন্স' বা মূলসূত্র সম্বন্ধে এবং সদস্য নির্বাচন বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে:

(1) 'টার্মস অফ রেফারেন্স' বা অনুসন্ধানের মূলসূত্র:

প্রথমত: দেখা যায় যে, যে সরকারী অফিসার এটি প্রণয়ন করেছেন ইতিপূর্বে প্রাপ্ত

সংবাদগুলি তিনি পড়ে দেখেননি। কারণ নেতাজী যে, ষোলো তারিখে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন এবং সতের তারিখে ব্যাঙ্কক ত্যাগ করেন এটা তখনই জানা গেছে. সুতরাং 'ষোলই অগাস্টের কাছাকাছি' না বলে 'সতেরই অগাস্টের কাছাকাছি' বলাই শোভন ছিল।

দ্বিতীয়ত: মূলসূত্রটি পড়লে মনে হয় যে, নেতাজীর বিমানটি যে দুর্ঘটনায় পড়েছিল এ বিষয়ে যেন সরকারের মনে কোন সন্দেহ নেই — সেটা যেন অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নয় — সরকারের সন্দেহ সেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর আদৌ মৃত্যু হয়েছিল কি না। কারণ বিমান দুর্ঘটনার কথাটা ধরে নিয়েই যেন বলা হয়েছে পরবর্তী ঘটনার তদন্ত করতে।

(2) সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারেও আপত্তি দেখা গেল:

প্রথমত তিনজন সদস্যের মধ্যে কেউই আইনজ্ঞ নয়। চেয়ারম্যান শাহ্নওয়াজ খান একজন যোদ্ধা। নেতাজীর কূটনৈতিক পরিকল্পনার বা সরকার গঠনের ভিতর তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও যোদ্ধা যতই বীরত্ব দেখান না কেন, এ জাতীয় অনুসন্ধান কমিটিতে থাকবার মত যোগ্যতা বা পরিচালনা করবার মত আইনজ্ঞান, দক্ষতা এবং নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি সে জন্য তাঁর থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ কথায় নিশ্চয়ই শাহ্নওয়াজ খানের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথকে অলিম্পিক টীম নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান বা গান্ধীজীকে বিশ্বসুন্দরী নির্বাচনের বিচারক নিযুক্ত করলে আমরা অনুরূপ আপত্তি জানাতাম — তাঁদের প্রতি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেই। আজাদ হিন্দ্ সরকার বা বাহিনীর কাউকে কমিটিতে নেওয়া যদি অপরিহার্য মনে হয়ে তবে পর্যায়ক্রমে সর্বশ্রী আনন্দমোহন সহায়, দেবনাথ দাশ, এস. এ. আইয়ার, মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি অথবা ভোঁসলেজীকে নির্বাচন করা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত হত। কারণ তাঁরা নেতাজীর সরকার তথা বাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্ব-রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষা ও ধারণা ব্যাপকতর এবং জাপানের সরকারী মহলে তাঁরা অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। নেতাজী তাঁর বিভিন্ন কূটনৈতিক অভিযানে এবং তাঁর পলিসি রূপায়ণে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা শাহ্নওয়াজ খানকে কখনও আহ্বান জানাননি, জানিয়েছেন, ঐ (ভারত সরকার দ্বারা) উপেক্ষিতদেরই।

দ্বিতীয়ত শ্রী এস. এন. মৈত্র বরাবর শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, বিচারবিভাগের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল বলে জানা নেই। ইতিপূর্বে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানকার্যে অংশগ্রহণ করেছেন বলেও খবর পাইনি। কোনও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কোন বিচারপতিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলে ভাল হত। অবশ্য নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিচার-বিভাগের লোকেরা শাসনকর্তাদের নির্দেশে রায় দান করেন না

— এই এক অসুবিধে হয়তো ছিল।

অবশ্য সুভাষচন্দ্রের পরিবারভুক্তদের মধ্যে থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীসুরেশচন্দ্রের নির্বাচনে কোন তরফেই আপত্তি ওঠেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও আইনজীবী নন।

অনেকে চেয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত আইনবিদ্ ড. রাধাবিনোদ পালকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হক। টোকিওতে অনুষ্ঠিত 'টোকিও ওয়র-ক্রাইমস্ ট্রাইব্যুনালে' তিনি ছিলেন অন্যতম বিচারক। বিশ্বের নিরপেক্ষ বিচারকদলে ছিল তাঁর আসন। শুধু তাই নয়, ঐ ট্রাইব্যুনালে তাঁর রায় ইতিহাস রচনা করেছিল। এই বিচারকার্য চলা কালে তিনি যুদ্ধের অনেক গোপন সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বার করা সবচেয়ে সম্ভাব্য ছিল। এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির প্রথম সাক্ষী মাদ্রাজের এম. এল. এ. শ্রীথেবরের সঙ্গে শ্রীশাহ্নওয়াজের কথোপকথন (4.4.56 তারিখে) নিম্নোক্তরূপ। শ্রীথেবর জানতে চান যে, ড. রাধাবিনোদ পালকে এই অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। উত্তরে শ্রীশাহ্নওয়াজ বলেন, ' এ বিষয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। না, সে সম্ভাবনা নেই। শ্রী পাল যুদ্ধের সময়ে এবং অব্যবহিত পরে ঐ অঞ্চলেই ছিলেন, ফলে তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেছেন। হয়তো তিনি বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে, বিমান দুর্ঘটনাটি আদৌ হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, শ্রী পালকে এই কমিটির সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত করা চলবে না।'

পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছেন। বিশ্ববিশ্রুত বিচারক ড. রাধাবিনোদ পাল বিচারকালে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তে পারেন বলে জওহরলাল কেমন করে আশঙ্কা করলেন? এই সমস্যাটির সমাধান করতে হলে কিছু পূর্বকথা আপনাদের জানতে হবে। এই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বছরতিনেক আগে ড. পাল যখন 'টোকিও ওয়র-ক্রাইমস্ ট্রাইব্যুনালে' বিচারক হিসাবে কাজ করতে জাপান গিয়েছিলেন তখন এদেশের সংবাদপত্রে একটি খবর বার হয়। সংবাদে বলা হয়, ডক্টর পাল টোকিওতে অবস্থানকালে রেঙ্কোজী মন্দিরে যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন টোকিওর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ড. পাল নাকি সব কথা শুনে এবং মন্দিরে সরেজমিনে তদন্ত করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, সেটি নেতাজীরই চিতাভস্ম। এই সংবাদটির প্রতি যখন ড. পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তখন তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে বলেন, ' আমার নাম এভাবে ব্যবহৃত হতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে অথবা একাকী তথাকথিত চিতাভস্ম দেখতে আমি কোনও মন্দিরে যাইনি। সত্য কথা বলতে কি, নেতাজীর ফরমোসায় মৃত্যুর রটনা আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমার মনে হয়, সমস্ত বিষয়টা খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। এখানে-ওখানে প্রকাশিত নানাজনের বিক্ষিপ্ত জবানবন্দী আমার বিশ্বাস উৎপাদন করছে না। এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জাগার যথেষ্ট কারণ আছে।' — টোকিওস্থ শ্রী এ. এম নারায়কে

লিখিত ড. রাধাবিনোদ পালের পত্র — 14.2.53 ।

ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ড. পালের অযোগ্যতার হেতু একাধিক। প্রথমত, তাঁর নাম জড়িত করে যে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। ড. পাল একজন পৃথিবী-বিখ্যাত নিরপেক্ষ বিচারক, তিনি বাঙালী এবং বাঙলা দেশে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, ফলে, তাঁর নামে প্রচারিত সংবাদটি নেতাজীর মৃত্যুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করত, বিশেষ করে বাঙালীদের মধ্যে; কিন্তু তিনি সে সংবাদের প্রতিবাদ করে এ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ঐটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না — উপরন্তু বললেন নেতাজীর 'মৃত্যু রটনা' তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তৃতীয়ত, তিনি জানালেন যে, এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে ইতিপূর্বে জওয়াহরলাল লোকভায় বলেছিলেন তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। চতুর্থত, " Statements by individuals made here and there"-এর মধ্যে যে পণ্ডিত জওহরলালের লোকসভায় প্রদত্ত ভাষণটিও অন্তর্ভুক্ত একথা সকলেই বুঝলেন। ফলে ড. পাল প্রধানমন্ত্রীর মতে নিরপেক্ষ বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেন। Q.E.D.!!

যাই হোক, তিনজনের এই অনুসন্ধান কমিটি এপ্রিল মাসে তাঁদের তদন্ত শুরু করেন এবং জুলাই মাসে শেষ করেন। সর্বসমেত তাঁরা সাতষট্টি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। নয়াদিল্লী, কলকাতা, ব্যাঙ্কক, সাইগন, টুরেন ও টোকিওতে তাঁরা অনুসন্ধান কার্য চালান। অকুস্থল অর্থাৎ ফরমোসা দ্বীপে যে তাঁরা আদৌ যাননি সে-কথা আগেই বলেছি। অগাস্ট 1956-এ অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করে ওঁরা তিনজনে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রায় লিখতে শুরু করেন। তখনই তিনজন সদস্যের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রথম বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনজনে একমত হয়ে লেখেন, কিন্তু ঐ 42 পৃষ্ঠায় একটি পঙ্‌ক্তিতে শ্রী সুরেশচন্দ্র আপত্তি জানান। পঙ্‌ক্তিটি ছিল: They all point to the fact that Netaji Subhas Chandra Bose died at Taihoku Military Hospital on the night of the 18th August 1945. The Committee accepts this conclusion....." ("এই সবগুলি নির্দেশ করে যে আঠারই অগাস্ট, 1945 তারিখে রাত্রে তাইহকুতে অবস্থিত মিলিটারি হাসপাতালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়। কমিটি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন.....")।

সুরেশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলেন, তিনি এ সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তাঁর মতে বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীর বৈপরীত্যে এই সিদ্ধান্তেই বরং আসা যায় যে, ঐ রকম কোন দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি; ফলে ওভাবে নেতাজীরও মৃত্যু হয়নি। অপর দু'জন সদস্য এ মত মেনে নিতে পারলেন না। সুরেশচন্দ্র তখন চেয়ারম্যানকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, এই মতানৈক্যের পর তাঁর কী করণীয়। চেয়ারম্যান তাঁকে জানান যে, কমিটির পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে

এ-ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। শ্রী বসু ইচ্ছা করলে একটি পৃথক 'মতান্তরের রিপোর্ট' দাখিল করতে পারেন। শ্রী বসু তাতে রাজি হন এবং বলেন এ যে, সে ক্ষেত্রে তাঁকে যেন বিভিন্ন নথীপত্র ও সাক্ষীদের জবানবন্দীর অনুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর শ্রীবসু কলকাতায় ফিরে আসেন তাঁর পৃথক রিপোর্ট রচনা করতে (2/45)।

এই রিপোর্ট দু'টি আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য রাখতে এবং কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে তার পূর্বে আমাদের আর একটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, 3.5.52 তারিখে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় শ্রী আইয়ারের যে লিখিত জবানবন্দী পেশ করেছিলেন তাতে শ্রী আইয়ার তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে জনৈক শ্রীহারিন শাহ্-এর নাম উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, শ্রী শাহ্-এর সঙ্গে কথা বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, নেতাজী মৃত।

অনুসন্ধান কমিটির জন্ম হল 5.4.56 তারিখে এবং উক্ত শ্রী হারিন শাহ্ এর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হল তার এক মাস একুশ দিন পরে—26.5.56 তারিখে। যেহেতু এই গ্রন্থটি সরকারী 'নেতাজী ইনকোয়ারি রিপোর্ট' এবং বেসরকারী ডিসেন্টিয়েন্ট রিপোর্টের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তাই সেটির বিচার আগে করা দরকার।

এই বইটির লেখক শ্রী হারিন শাহ্ বোম্বাইয়ের 'ভারত' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। গ্রন্থটিতে লেখক চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, নেতাজী 18.8.45 তারিখে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান; তাইপেতে (বা তাইহকুতে) তাঁর দাহকার্য হয় এবং তাঁর চিতাভস্ম তাইপে থেকে টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হয়। শুনতে অদ্ভুত লাগবে — কিন্তু এ গ্রন্থটি বার বার তিনবার পাঠ করে আমার মনে হয়েছে গ্রন্থটি চূড়ান্তভাবে ঐ তথ্যগুলিকেই অপ্রমাণ করে।

আমার যুক্তি এবং বক্তব্যগুলি একে একে পেশ করি। পাঠক, আপন বুদ্ধি এবং বিবেচনা অনুসারে নিজ সিদ্ধান্তে আসবেন। পাঠকের নিরপেক্ষ বিচার সিদ্ধান্তে আমি কোনভাবে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাঠান্তে যদি পাঠক মনে করেন যে, আমার ধারণা ভুল—এ গ্রন্থ নেতাজীর মৃত্যুকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, আমি নাচার!

1. লেখক বলেছেন, শুক্রবার বিশে অগাস্ট, 1946 তারিখে (3/21) সাংবাদিক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ফরমোসা দ্বীপে উপনীত হন। দিন দশেক তিনি সেখানে থাকেন এবং ঐ সময়কালের ভিতর নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আত্মনিয়োগ করেন। অর্থাৎ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার মাত্র এক বৎসর বারো দিন পরে তিনি এই অনুসন্ধানকার্যে ব্রতী হন। ঐ দশদিনে তিনি ঝটিকাগতি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীরা নেতাজীর সম্বন্ধে কী ভীষণ উৎগ্রীব

তা অনুধাবন করে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারবার্তা বিনিময় করেন। এই তারবার্তা বিনিময়ের অনুলিপিও তিনি তাঁর গ্রন্থে ছাপিয়েছেন। তিনি প্রায় চল্লিশটি আলোকচিত্র ব্লক করে ছাপিয়েছেন। অনেকের জবানবন্দী তিনি লিখে নেন। হাসপাতাল ও ক্রিমেটোরিয়ামের নথীপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি (3/91) সংগ্রহ করেন। অথচ কিমাশ্চর্যম্! এই সমস্ত নথীপত্র-দলিল-দস্তাবেজ-জবানবন্দী তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বাক্সবন্দী করে রেখে দেন। পণ্ডিত জওয়াহরলাল যেমন সুভাচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তা বিশ্বাস করে 'স্বস্তির' নিশ্বাস ফেলেছিলেন, শ্রীহারিন শাহ্ও তেমনি নেতাজীর মৃত্যু বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সেগুলি বাক্সবন্দী করে দীর্ঘ দশ বছর নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। এই দশ বছরে জওয়াহরলাল বারে বারে বলেছেন নেতাজী সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। তারপর জনমতের চাপে যেই তিনি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করলেন অমনি শ্রী শাহ্ তাঁর বাক্স খুলে দশ বৎসরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছাপিয়ে ফেললেন। সরকারী কমিটির জন্মসংবাদ গেজেট হওয়ার মাত্র এক মাস একুশ দিন পরে তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

2. দশ বৎসর নীরব থাকার কোন যুক্তিসম্মত কারণ তিনি দেখাননি — কিন্তু সরকারী কমিটি নিয়োগের ব্রাহ্মমুহূর্তে এ গ্রন্থ প্রকাশ যে নৈতিক পাপ এ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি guilt-conscious বা জ্ঞানপাপী তা বোঝা যায় তাঁর ভূমিকায় লেখা স্বীকৃতিতে:

"সরকারী অনুসন্ধানকার্য শুরু হয়েছে — তাঁরা তাঁদের সূত্র অনুযায়ী সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করবেন। কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই — কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফরমোসায় সংগৃহীত তথ্য ও নথীপত্র আমাকে যে সিদ্ধান্তে এনে ফেলেছে তা প্রকাশ করতে আমি বিরত হব কেমন করে? সে তথ্যটি এই : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাইহকুতে মহান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শহীদ হয়েছেন!"

ভূমিকায় এই কৈফিয়ৎ পড়ে আমার মনে পড়েছিল যাযাবরের সেই অনবদ্য উক্তিটি: 'ভদ্রলোকেরা যদি সাংবাদিক হতে পারেন, তবে সাংবাদিকরা ভদ্রলোক হতে পারবেন না কেন?'

3. বইটির অবতরণিকা লিখে দেন বোম্বাইয়ের গভর্নর শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব। রাজভবনের সীল সমেত তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ 25.5.56, অনুসন্ধান কমিটি জন্মলাভ করেছে এ সংবাদ গেজেট হওয়ার এক মাস কুড়ি দিন পরে। সুভাষচন্দ্রের গুণবর্ণনা করে তিনি বলেছেন, 'শ্রীহারিন শাহ্ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন এবং তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন যে, বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মহামৃত্যু হয়েছে।' ড. মহতাব উপসংহারে বলেছেন, " I am sure Shri Harin Shah's book will be interesting reading and I am glad that he is publishing whatever

materials he has in his possession to enable the general public to form their own judgment. "

(" আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, শ্রী হারিন শাহ্-এর এই গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হবে এবং তিনি যে তাঁর সংগৃহীত সমস্ত তথ্য অকপটে প্রকাশ করছেন এতে আমি আনন্দিত, কারণ জনসাধারণ এ থেকে নিজ সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন।")

লেখক দীর্ঘ দশ বছর এইসব নথীপত্র-দলিল-প্রমাণ কেন গোপন রেখেছিলেন সে সম্বন্ধে রাজ্যপালও সম্পূর্ণ নীরব — কিন্তু তাঁর এই উপসংহারটি আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিচ্ছি — শুধু লেখক নয়, বোম্বাইয়ের তদানীন্তন রাজ্যপালের সম্বন্ধেও আমরা নিজ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি!

4. বইটির ছাপা, কাগজ ইত্যাদি উৎকৃষ্ট, উনচল্লিশটি হাফটোন ব্লক আছে। সে হিসাবে বইটি যথেষ্ট অল্প দামের। এয়ারপোর্টের ছবি, যে হাসপাতালে নেতাজী ছিলেন, যে ওয়ার্ডে ছিলেন, যে বেড-এ ছিলেন, যে ক্রিমেটোরিয়ামে তাঁর দাহকার্য হয় তার নানান আলোকচিত্র আছে। মায় যে হোটেলে লেখক ছিলেন সেই হোটেলের বয়, ড্রাইভার ইত্যাদিরও আলোকচিত্র আছে। এছাড়া, ডাক্তার, নার্স, নার্সের বান্ধবী, পুলিস সুপার, ইত্যাদির ফটো আছে! এঁদের সকলের ফটো কেন ছাপা হল জানি না, কারণ এঁরা কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন, যদিও শুধু পাতা উল্টালে মনে হয় এঁরা বুঝি সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী! একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান লেখক পেয়েছেন একজনকে। তিনি নার্স সিস্টার ছান পি সা। তাঁর কথা পরে বলছি।

5. হাসপাতালে পৌঁছে লেখক যখন অনুসন্ধান শুরু করলেন তখন সেই মিলিটারি হাসপাতালের সর্বময় কর্তা উ কুয়ো সিঙ-এর (Wu Kuo Husing) সঙ্গে লেখকের পরিচয় হল। দুর্ঘটনার মাত্র এক বৎসর পরের ঘটনা।

লেখক বলছেন, " কর্নেল উ বললেন, নেতাজী এ হাসপাতালে মারা গেছেন বলে তিনি জানতেন না। এ কথাটা কখনও তাঁর মনে হয়নি। যাই হোক, লেখক এ বিষয় অনুসন্ধান করতে চান শুনে তিনি খোঁজ করে দেখতে রাজি হলেন। বস্তুত নেতাজী যে এখানে মারা গেছেন একথা তাঁর জানা না থাকায় এ সম্বন্ধে খোঁজ করার কথা ইতিপূর্বে তাঁর কখনও খেয়ালই হয়নি। তিনি একে একে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শেষে একজন বললেন, হ্যাঁ, একজন নার্স এ বিষয়ে বোধহয় কিছু জানে। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর সেই নার্সের সন্ধান পাওয়া গেল।" (3/54)

এই পরিবেশিত তথ্যটিকে এবার আমরা বিচার করব। এ ঘটনা তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার মাত্র এক বছর পরের কথা। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই এক বছর হাসপাতালের কর্তৃত্ব হাত বদলেছে। জাপানী জঙ্গী হাসপাতাল এসেছে ফরমোসা সরকারের তত্ত্বাবধানে। ফলে পূর্বেকার কর্মীরা অধিকাংশই অন্যত্র সরে গেছেন। ডাঃ উ মাত্র ছয়মাস আগে এখানে

এসেছেন --- তথাকথিত দুর্ঘটনার ছয়মাস পরে। এ কথাও যেমন সত্য, তেমনি মনে রাখতে হবে, 1943 থেকে 1945 পর্যন্ত নেতাজীর চিত্র ও বক্তৃতা বারে বারে জাপানী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, নেতাজী ঐ দু'টি বছরে জাপান-অধিকৃত পূর্ব এশিয়ায় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি। '45 -এর অগাস্ট থেকে '46 -এর অগাস্ট এই এক বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এই এক বছরের ভিতর মার্কিন গোয়েন্দার দল এবং ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার গুপ্তচরেরা ঐ হাসপাতালে তন্নতন্ন করে খোঁজ করে গেছে। ডাঃ উ কুয়ো সিঙ উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক, ঐ হাসপাতালের সর্বময় কর্তা। তবু একজন ভারতীয় সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করার পূর্বে তাঁর ঐ বিষয়ে কোন খেয়াল হয়নি? তিনি কি কোনও অবাঞ্ছনীয় গুহ্যবার্তা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

6. একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী নার্সটির নাম সিস্টার ছান পি সা (Tsan Pi Sha) । বয়স তাঁর ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ । তিনি তাঁর জবানবন্দীতে যা বলেছেন ---

(ক) "নেতাজী এই হাসপাতালেই মারা গেছেন, এই ঘরেই (3/60) । আমি মৃত্যুসময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। মৃত্যুসময়ে আমরা দু'জন মাত্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম (3/63)।"

(শ্রী শাহ্‌নওয়াজের সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে মৃত্যুসময়ে সাতজন উপস্থিত ছিলেন।)

(খ) লেখকের প্রশ্নের উত্তরে নার্স বললেন, 'আঠারই অগাস্ট, 1945 সালে দুপুর বেলা তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনা হয় এবং ঐ দিন রাত এগারোটার সময় তিনি মারা যান' (3/62) ।

(লক্ষণীয়, নার্সকে হঠাৎ ডেকে এনে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তিনি কোন ডায়েরি বা হাসপাতালের নথীপত্র দেখে জবাব দেননি। মুখস্তের মত সাল-শতাব্দী-তারিখ মায় সময় পর্যন্ত নির্ভুলভাবে বলে দিলেন। লেখক অবশ্য বলেছেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর নার্সটি জবানবন্দী দিতে আসেন। অথচ হাসপাতালের সর্বময় কর্তা আদৌ জানতেন না হিজ্ এক্সেলেন্সি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস নামধেয় কেউ এ হাসপাতালে বছরখানেক আগে মারা গেছেন! নার্সটির স্মৃতিশক্তি প্রশংসনীয়। হাসপাতালের খাতাপত্রে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে কোনও রেকর্ড ছিল না।)

(গ) লেখকের প্রশ্ন: ডাক্তার নিশ্চয় তাঁকে ইনজেক্‌শান দিয়েছিলেন যন্ত্রণা উপশমের জন্য? নার্সের উত্তর: কী বলছেন! তাঁর সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ ছিল! একটি গ্লুকোজ বা স্যালাইন ইনজেকশান দেবার মত স্থান তাঁর সমস্ত শরীরে কোথাও ছিল না (3/63) ।

(শ্রীশাহ্‌নওয়াজের সরকারী রিপোর্ট অনুসারে নেতাজীকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ইনজেকশান দেওয়া হয় (1/29) ।)

(ঘ) প্রশ্ন : তিনি সজ্ঞানে কতক্ষণ ছিলেন?

উত্তর : অধিকাংশ সময়েই তিনি অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন, জ্ঞান ছিল না (3/67)।

(কর্নেল হবিবর রহমানের জবানবন্দী : সারাক্ষণই তাঁর জ্ঞান ছিল, মাঝে মাঝে অবশ্য অজ্ঞান বা আচ্ছন্নের মত পড়েছিলেন।)

(ঙ) প্রশ্ন : সিস্টার, একেবারে শেষ কথা তিনি কী বলে গেলেন? মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর শেষ উক্তি কী?

উত্তর: তিনি একটু গোঙাচ্ছিলেন। তারপর ঠোঁট দু'টি নড়ে উঠল। আমি ঝুঁকে পড়লাম। শুনলাম উনি বললেন, 'Quiet Death. I am dying peacefully.' (প্রশান্ত মৃত্যু। আমি শান্তিতে বিদায় নিচ্ছি।)

আমাদের দুর্ভাগ্য, শ্রীযুক্ত হারিন শাহ্ সাংবাদিক—ব্যারিস্টার নন, অথবা অধম গ্রন্থকারের মতো গোয়েন্দা গল্প লেখার বাতিক নেই তাঁর। পিয়রী ম্যাসন হলে এর পরের যে প্রশ্নটি অবধারিতভাবে জিজ্ঞাসিত হত সেটি: 'In what language, my sweet sister?" (কোন ভাষায়, বোনটি?)

পাঠক আমাকে মার্জনা করবেন, লেখক নেতাজীর মৃত্যুর মর্মান্তিক করুণ বর্ণনা দিয়েছেন — কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কাছে সেটা হাস্যরসের রূপ ধরে এসেছে। কারণটা বুঝিয়ে বলি:

লেখক প্রশ্ন করছিলেন ইংরেজিতে। দোভাষী সেটা চীনা ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। আবার সিস্টার ছানের চীনা ভাষায় উত্তর ইংরেজিতে অনুবাদ করে শ্রীযুক্ত শাহ্‌কে বলছিলেন। লেখক স্বীকার করেছেন, এ ভাবেই তিনি সিস্টার ছানের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। এর একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত: তথাকথিত দুর্ঘটনার এক বৎসর পরে অর্থাৎ জবানবন্দী লেখার সময়কালে ভগ্নী ছান হিন্দুস্থানী বা ইংরেজী জানতেন না। এখন শুনছি, তিনি জবানবন্দীতে বলছেন, নেতাজীর ঠোঁট দু'টি নড়ে উঠতে দেখে তিনি ঝুঁকে পড়ে শুনলেন: 'প্রশান্ত মৃত্যু! আমি শান্তিতে বিদায় নিচ্ছি!' তা-থেকে আমাদের তিনটি বিকল্প সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে স্বতঃসিদ্ধর মতো মেনে নিতেই হবে:

এক: সিস্টার ছান জবানবন্দী দেবার এক বছর পূর্বে বাঙলা, উর্দু, হিন্দি, ওড়িয়া অথবা ইংরেজী ভাষা জানতেন, এক বছর পরে ভুলে গেছেন।

দুই : নেতাজী চীনা ভাষা জানতেন এবং সে কথা গোপন রেখে তিনি চীনাদের সঙ্গে দোভাষীর মাধ্যমে কথাবার্তা বলে এসেছেন।

তিন: মৃত্যুযন্ত্রণায় নেতাজী বাংলা, উর্দু, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া বা ইংরেজী ছেড়ে তাঁর জানা জার্মান বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাঁর শেষ উক্তিটি করেন, এবং ঐ শেষোক্ত দু'টি ভাষার একটি সিস্টার ছান জানতেন, যা নাকি হারিন শাহ্-মহাশয় জানতেন না!

আপনারা বিবেচনা করে বলুন, এ তিনটি বিকল্প সম্ভাবনা ছাড়া এ তথ্য আমরা কেমন করে হজম করব?

লেখক আমাদের মাপ করবেন, ঐ তিনটি সম্ভাবনার একটিকেও আমরা মেনে নিতে পারছি না। অথচ লেখকের ধৃষ্টতাটা দেখুন — ঐ সিস্টার ছানের—তিনি কল্পনারই হন অথবা বাস্তবেরই হন — একটি ছবি বইয়ের মলাটে ছেপেছেন নেতাজীর চিত্রের পাশাপাশি।

7. লেখক অতঃপর তাইপে শহরের 'হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ব্যুরোর' প্রধান ডাঃ ক কিং-ইয়েনের (Dr. Kaw King-Yen) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সংস্থা থেকেই মৃতদেহ দাহ করবার অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। তথাকথিত দুর্ঘটনার সময় ডাঃ কিং-ইয়েন একটি বিপ্লবী দলের পক্ষে আত্মগোপন করে ছিলেন। যুদ্ধের পরে এই চাকরি পেয়েছেন। তাঁর মতে 'নেতাজী সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। জাপানীরা চায়নি তিনি রাশিয়ায় পালিয়ে যান। জাপানীরা তাই তাঁকে হত্যা করেছিল ইচ্ছাকৃতভাবে' (3/86) । বলা বাহুল্য, ডাঃ কিন-ইয়েন জাপানীদের বিরুদ্ধবাদী। লেখক ওঁকে আর বেশী জেরা করেননি।

8. ক্রিমেটোরিয়ামের কর্মী চু সাঙ (Chu Tsung) লেখকের মতে আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাই তার ছবি বইয়ের ভিতর ছেপেই তিনি তৃপ্ত হননি — গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে নেতাজীর চিত্রের সঙ্গে চুরুটমুখো এই বিদেশী শ্মশান-হরিশ্চন্দ্রের ছবিটিও ছেপেছেন। সাঙ-এর সাক্ষ্য:

(ক) জাপানীরা সর্বাঙ্গ কাপড়ে মুড়ে একটি মৃতদেহ নিয়ে আসে। কাপড় সরিয়ে মৃতদেহ সে দেখেনি। জাপানীরা বলাবলি করছিল বলেই সে নিশ্চিতভাবে জানে সেটা চন্দ্রবোসের মৃতদেহ (3/111) ।

(খ) দাহকার্যের সময় সাত-আট জন জাপানী অফিসার উপস্থিত ছিলেন (3/110) ।

(শ্রীশাহ্‌নওয়াজের রিপোর্ট অনুসারে মাত্র দু'জন জাপানী উপস্থিত ছিলেন — মেজর মাগামোতা এবং শ্রীনাকামুরা (1/40) ।)

(গ) সাক্ষী বললেন: তেইশে অগাস্ট, 1945 তারিখে (আশ্চর্য! এই ডোমের কাজে বৃত অর্ধ অথবা অশিক্ষিত ফরমোসার কর্মীটি কোন ডায়েরি বা রেকর্ড দেখলেন না — মুখে মুখে স্মৃতির সাহায্যে বলে গেলেন) লম্বা ভারতীয় লোকটি (অর্থাৎ কর্নেল হবিবর রহমান) এবং জাপানীরা এসে চিতাভস্ম সংগ্রহ করে নিয়ে যান (3/113)। (তারিখটা কর্নেল রহমান, মেজর নাগামোতা এবং শ্রী নাকামুরার প্রদত্ত তারিখের সঙ্গে মেলে না।)

9. লেখক দাবি করেছেন, তিনি বহু আয়াসে ফরমোসার সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল ঘেঁটে যে সংবাদপত্রে নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ বার হয়েছিল তা উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁর বক্তব্যের আক্ষরিক অনুবাদ পরিবেশন করি: (পৃষ্ঠা 49) " একটি সাংবাদিকের সঙ্গে

যোগাযোগ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হল। তাইপে থেকে প্রকাশিত চৈনিক সংবাদপত্র 'শিন্ শেঙ জির শাও' অথবা 'শিন শেঙ্ দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ড. লী ওয়াং-চু একজন বিশিষ্ট নাগরিক; তিনি ছিলেন ফরমোসা অ্যাসেম্বলীর ডেপুটি চেয়ারম্যান। জাপানী অধিকারের সময় যে দৈনিক পত্রিকা চালু ছিল, জাপানের আত্মসমর্পণের পর চীনা কর্তারা সেই 'তাইওয়ান নিশী নিশী সিঙবুন' পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। চীনা নামে এ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হয়, এবং ড. লী ছিলেন তার সম্পাদক। ড. লী আমার অনুরোধে তাঁর অফিসে বসে অধুনালুপ্ত ঐ জাপানী সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল-কপি হাতড়াতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বাইশে আগস্ট তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত, নেতাজীর মৃত্যুসংবাদটি উদ্ধার করেন। ডঃ লী অনুগ্রহ করে ঐ জাপানী পত্রিকাটির একটি কপি আমাকে দিলেন। তাতে নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বাইশে আগস্টের নিশী নিশী সিঙবুম পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ:

(অনুবাদ পড়ে মরুক, তার আগে আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলি জাগছে তাই বলি: (ক) লেখক অসংখ্য আজেবাজে ফটোর ব্লক করে ছাপিয়েছেন, তাঁর হোটেল-ভৃত্যদের (পৃঃ 38 ও 39) একাধিক ফটো, তাঁর গাড়ির ড্রাইভারের ফটো (112) ইত্যাদি চল্লিশটা ফটো ছাপাতে পারলেন, আর ঐ সংবাদটি — যা নাকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — তার একটি ফটোস্ট্যাট কপি কেন ছাপালেন না?

(খ) ডোমেই নিউজ এজেন্সি এ সংবাদ বিতরণ করেন 23.8.45, তার পূর্বদিন এ সংবাদ ফরমোসায় প্রকাশিত হল কেমন করে?

(গ) জাপান সরকার 23/8 তারিখে রেডিও মারফত বিশ্বকে এ সংবাদ জানায়, টোকিওর দৈনিকে এ সংবাদ 23/8-এর পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। সে ক্ষেত্রে জাপান অধিকৃত ফরমোসা দ্বীপে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশ ছাড়া কোন জাপানী পত্রিকায় এতবড় গোপন সংবাদ তার পূর্বে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব?)

10. লেখক বহু আয়াসে হাসপাতালের নথীপত্র ঘেঁটে নেতাজীর ডেথ সার্টিফিকেট-খানি উদ্ধার করেছেন। চীনা ভাষায় লেখা তার ফটোস্ট্যাট কপিও ছেপেছেন। লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, ঐ চীনা রিপোর্টের একটি ইংরেজী অনুবাদও তিনি ছেপেছেন, না হলে কেদারদা সংগৃহীত চীনা স্বরলিপি হাতে বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ যেমনভাবে বলেছিলেন তেমনি ভাবে আমরাও বলতাম, 'তাই তো! এ যে আদত চীনে ভাষা দেখছি। কিছু বোঝবার জো নেই!' ইংরেজী অনুবাদ থাকায় আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ পাঠকের কাছে পেশ করতে পারছি। (3/91) :

ডাক্তারের রিপোর্ট: আর্মি হাসপাতাল, তাইহকু।

ডাক্তারের নাম: ছুলকা তোয়াজী (শাহ্নওয়াজ কমিটির রিপোর্টে ডাক্তারের এ নাম আছে।)

তারিখ : একুশে অক্টোবর '45 (আগস্ট মাসের সার্টিফিকেটে অক্টোবর মাসের তারিখ কেন তা জানি না।)

প্রথম পঙ্‌ক্তি : ডেথ সার্টিফিকেট।

দ্বিতীয় „ : মৃতের নাম : ওকারা ইচিরো (ধরে নিন ওটা হবে সুভাষচন্দ্র বসু)

তৃতীয় „ : স্ত্রী/পুরুষ : পুরুষ

চতুর্থ „ : জন্ম : মেইজী 33, নয়ই এপ্রিল
(ধরে নিতে হবে ওটা 23.1.1897)

পঞ্চম „ : কর্ম : তাইওয়ান সরকারের চাকরে
(ধরে নিন আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান)

ষষ্ঠ „ : মৃত্যুর কারণ : আত্মহত্যা/ বিষপ্রয়োগ/ স্বাভাবিক মৃত্যু
(কোনটাই যখন কাটা নেই ধরে নিতে পারেন-বিমান দুর্ঘটনা)

সপ্তম „ : অসুখের বিবরণ : হার্ট অ্যাটাক
(অগ্নিদগ্ধ রুগীর মৃত্যুর সময়ে তো হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মৃত্যু হয়ে থাকে, না কি?)

অষ্টম „ : অসুস্থতার শুরু : 17.8.45
(এটাকে ধরে নিন 18.8.45)

নবম „ : মৃত্যুর সময় : 19.8.45 বেলা চারটা
(ওটা 18.8.45 রাত্রিকাল হবে)

দশম „ : মৃত্যুর স্থান : সাউথ গেট জাপানী জঙ্গী হাসপাতাল
(আশ্চর্য! হুবহু মিলে গেছে তো!)

পাঠক আশা করি এতক্ষণে নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন! ডেথ সার্টিফিকেটের চেয়ে মৃত্যুর আর কি অভ্রান্ত প্রমাণ দেওয়া যাবে বলুন? আত্মীয়-স্বজনের ইন্সিওরেন্স পলিসির টাকা কখনও আদায় করেছেন? তা'হলেই বুঝবেন, মড়ার বাড়া যেমন গাল নেই, ডেথ সার্টিফিকেটের চেয়ে তেমনি মৃত্যুর আর বড় প্রমাণ কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে। তা হোক, আমরা ব্র্যাকেট-যোগে সেই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি কেমন করে শুধরে নিতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছি। প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত সবকিছু না মিললেও প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি দুটি মিলেছে তো? আরও একটি পঙ্‌ক্তি নির্ভুলভাবে মিলে গেছে — ঐ তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটা। কই, ডাক্তার তো 'স্ত্রী' লেখেননি — শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চান্স তো তাও ছিল। সুভাষচন্দ্র পুরুষ ছিলেন, পুরুষসিংহ ছিলেন — সুতরাং!

রসিকতা থাক! এবার দেখি লেখক সত্যই কী বলতে চান। তাঁর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই প্রথমে দিই :

"একথা সত্য যে, মিউনিসিপ্যাল ব্যুরোর কেরানীদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রচলিত নিয়মানুসারে যেন তাঁরা মৃতদেহ না দেখেন, কোন রকম পরখ না করেই যেন দরখাস্ত অনুযায়ী দাহকার্যের অনুমতি দেন। বস্তুত, মৃতদেহ দেখলেই বা কী লাভ হত? কারণ মৃতদেহটি একটি বিদেশীর, এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধ থাকায় সনাক্তের অতীত ছিল! কিন্তু কেরানীরা স্বকর্ণে শুনেছিল, মৃতদেহ নিয়ে যেসব জাপানী অফিসারেরা আসেন তাঁরা মিউনিসিপ্যাল ব্যুরোর ডিরেকটারকে বলেছিলেন যে, মৃতদেহটা চন্দ্র বোসেরই। নেতাজীর মৃতদেহ গোপনে দাহ করার জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষ যে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিল এ তথ্য একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, ধরুন, ফরমোসাদেশীয় নার্স সিস্টার ছান পি সা আদৌ জানতেন না কিভাবে মৃতদেহটা পাচার করা হল। প্রফেসার কুনিও বিমান দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর কথা অন্যভাবে জানতে পেরেছিলেন কিন্তু মৃতদেহ কীভাবে সৎকার করা হল তা জানতেন না। ব্যুরোর লোকজনদেরও আদেশ দেওয়া হয়েছিল খবরটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে। এই কারণেই তারা হাসপাতালে ডাক্তারের রিপোর্ট বা ডেথ-সার্টিফিকেট এবং দাহকার্যের অনুমতি ভিক্ষা করার আবেদনপত্রে আজেবাজে নাম-ধাম বসিয়েছে। এ রকম করার নানান যুক্তি থাকতে পারে। মনে হয় দাহকার্যটা সঙ্গোপন রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এমনকি দুর্ঘটনার খবরটাও সংবাদপত্রে পাঠানো হয়নি যতক্ষণ না দাহকার্যের ব্যবস্থা হয়, অথবা দাহকার্য বস্তুত শুরু হয়ে যায়। আন্দাজ করছি, স্থানীয় জাপানী কর্তৃপক্ষ তখন অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে কাজ করছিলেন এবং আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। হয়তো তাঁরা টোকিওর নির্দেশেই সবকিছু করেছিলেন।" (3/93-94)

মুশ্‌কিল হচ্ছে এই যে, এ যুক্তিটা আমি তো আদৌ মানতে পারছি না। শ্রীশাহের যুক্তি ও বিশ্লেষণ শুনেছেন, আমার বক্তব্যও রাখছি। ধীর স্থির মস্তিষ্কে উভয়বিধ যুক্তি আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, তারপর আপনারাই বলুন কী সিদ্ধান্তে আপনারা উপনীত হলেন:

1. এ কথা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে জাপানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে কোন নিরাপদ এলাকায় আত্মগোপন করতে সাহায্য করেছিলেন এবং সে সংবাদটি চূড়ান্তভাবে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে,

(ক) 16.8.45 তারিখে শ্রী সরকার যখন নেতাজীকে সিঙ্গাপুরে এই সংবাদ দেন তখন তা কেন যে নেতাজী তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারীদের কাছ থেকেও গোপন রাখেন তার অর্থ বুঝি।

(খ) সর্বশ্রী হাচাইয়া ও ইসোদা যখন নেতাজীকে ব্যাঙ্ককে এ সংবাদ গোপনে দেন তখন ওঁরা তিনজনেই যে সেটা গোপন রাখবার চেষ্টা করেন তার অর্থ বুঝি।

(গ) কাউন্ট তেরাউচি যখন সাইগনে নেতাজীকে একটিমাত্র আসনের বেশী দিতে অক্ষমতা জানান এবং পরে দুটি আসন দেন তার অর্থও সহজবোধ্য। এই সমস্ত ঘটনা

একই গোপনসূত্রে গ্রথিত।

2. এখন যদি ধরে নিই, নেতাজী সেই গোপন যাত্রার প্রয়াসে সত্যই বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, তা'হলে জাপান কর্তৃপক্ষের মনোভাব কী হওয়া স্বাভাবিক? এ-সংবাদ গোপন রাখার প্রচেষ্টা তাদের পক্ষে সে-ক্ষেত্রে হ'ত চরম মূর্খতা। বরং তারা নেতাজীর মৃত্যু সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করত, যাতে ইঙ্গো মার্কিন সমর-নায়কেরা — যাদের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে তারা — কোনদিন না বলতে পারে যে, নেতাজীকে পালিয়ে যাবার সুযোগ জাপানীরা দিয়েছিল। আবার সেই বাঙলা প্রবাদটাই বলতে হয় — 'মরার বাড়া গাল নেই!' কাদম্বিনী যেমন 'মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই,' জাপান কর্তৃপক্ষও তেমনি নেতাজীর মৃত্যুর সন্দেহাতীত দলিল রক্ষা করে প্রমাণ করত যে, নেতাজী জীবিতভাবে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাননি — জাপান সরকার সে কার্যে তাঁকে কোনভাবে সহায়তা করেনি। সে-ক্ষেত্রে জাপান সরকার নিঃসন্দেহে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে যেত:

(ক) নেতাজীর একাধিক আলোকচিত্র রাখত — হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, মৃত অবস্থায়, এবং দাহকার্যের সময় অন্তত কাপড় ঢাকা মৃতদেহকে ঘিরে সকল-সহযাত্রীর একটি ফটো।

(খ) হাসপাতালের রেকর্ডে নেতাজীর নাম, ধাম, বয়স, পরিচয় ইত্যাদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করাত।

(গ) দাহকার্যের অনুমতিপত্রে নেতাজীর নির্ভুল পরিচয় থাকত।

(ঘ) বরং বরফ দিয়ে অথবা ফর্মালিন দিয়ে নেতাজীর মৃতদেহ সংরক্ষণ করে সেটাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেত এবং সহস্র প্রবাসী ভারতীয়ের সম্মুখে দাহকার্য সম্পন্ন করত।

(ঙ) আইয়ারজীর টোকিও পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ নেতাজীর মৃত্যুর কথা বেতারে ঘোষণা করত। সংবাদপত্রে সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করত। এবং

(চ) কর্নেল টাদা আইয়ারজীকে তাইহকুতে নিয়ে যেতেন।

মনে রাখতে হবে, নেতাজী যে দাইরেন বা মাঞ্চুরিয়া যাচ্ছিলেন এটা বিমান দুর্ঘটনায় কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। তথাকথিত দুর্ঘটনার অকুস্থল ফরমোসা দ্বীপ। সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যেতে হলে তাইহকু বিমান-বন্দর পথেই পড়ে। সেখানে পেট্রোল নিতে সচরাচর বিমান নামে। নেতাজীর পক্ষে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিওতে যাওয়া আদৌ কোনও বেআইনী কাজ নয়। জাপান তার গৃহচূড়ায় দাঁড়িয়ে যদি বলে — জাপানবাহিনীর সহযোগী আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান 16.8.45 তারিখে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাচ্ছিলেন এবং 18.8.45 তারিখে তাইহকুতে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, তা'হলে কোনওভাবে তা বেআইনী হত না। কারণ জাপানী বিমানের আকাশচারণ 21.8.45 পর্যন্ত ইঙ্গো-মার্কিন সমরনায়কদের অনুমত্যানুসারে অব্যাহত ছিল। নেতাজীর

পক্ষে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাওয়ার কোনও কিছু আপত্তির থাকতে পারে না। নেতাজীর আত্মগোপনের প্রচেষ্টাটাই গোপন, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে গোপনীয়তার কণামাত্র নাই।

তা'হলে কেন এই গোপনতা? কেন নেতাজীর ফটো তোলা হল না? কেন মিথ্যা ডেথ-সার্টিফিকেট? কেন আইয়ারজীকে তাইহকুতে আনা হল না? কেন নেতাজীর মৃতদেহ সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে দাহ করা হল না? কেন তাঁর চিতাভস্ম সঙ্গোপনে রাখা হল রেঙ্কোজি মন্দিরে? কেন? কেন? কেন?

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কালানুক্রমিকভাবে নেতাজীর দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যগুলি — যেগুলি আমরা নানা সূত্রে পেয়েছি তাই আলোচনা করছিলাম। 23.8.45 তারিখে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা থেকে শুরু করে 1956 সালে প্রকাশিত শ্রীহারিন শাহের গ্রন্থটি আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে এসেছি। এরপর আমাদের আলোচনার পদ্ধতি কিছু পরিবর্তন করতে চাই। এরপর আমরা দেখব তিনটি রচনা—শ্রীশাহ্‌নওয়াজ ও শ্রী এস. এন. মৈত্রের স্বাক্ষরিত সরকারী তদন্ত-রিপোর্ট, শ্রী সুরেশচন্দ্র বসুর প্রতিবাদ-রিপোর্ট এবং সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রী টি. হায়াসিদার একটি গ্রন্থ। এই তিনটি গ্রন্থে একই ঘটনাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা বরং এরপর 16.8.45 তারিখে নেতাজীর সিঙ্গাপুর ত্যাগ থেকে শুরু করে 8.9.45 তারিখে শ্রী এস. এ. আইয়ার কর্তৃক নেতাজীর তথাকথিত ভস্মাধারটি গ্রহণের ঘটনাবলী পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে যাব এবং এই তিন সপ্তাহের বিবিধ ঘটনা সম্বন্ধে কে কী বলেছেন তা সঙ্গে সঙ্গে দেখব।

কিন্তু তার পূর্বে 1956 সালে নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির তিনজন সদস্যের মতবিরোধ কবে হল, কী পর্যায়ে হল, কেন হল, তা জেনে নেওয়া দরকার।

মতবিরোধের সূত্রপাত 1956 সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। আগেই বলেছি, তদন্ত কার্য শুরু হয় এপ্রিল মাসে এবং রিপোর্ট দাখিল করা হয় অগাস্ট মাসে। বিরোধের কারণ, তার বিস্তার এবং ফলশ্রুতি নিজ ভাষায় ব্যক্ত না করে আমি বরং কতকগুলি দলিল ও নথীর সাহায্যে তা পরিবেশন করব।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র অপর দু'জনের সঙ্গে একমত হতে না পারায় দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ বলেন, যেহেতু শ্রীসুরেশচন্দ্র অপর দু'জনের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, তাই কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে তাঁর উপস্থিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন, অবাঞ্ছিত। প্রয়োজনবোধে সুরেশচন্দ্র একটি Dissentient Report বা 'মতান্তরের বক্তব্য' পেশ করতে পারেন। সরকার বিবেচনা করলে তাও ছাপানা হবে। সুরশেচন্দ্র তাতে রাজি হন এবং বলেন, কলকাতা থেকে তিনি পৃথক রিপোর্ট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন যেন

প্রদত্তকালে গৃহীত নথীপত্রের অনুলিপি তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার করে তিনি জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসেন।

তারপর নয়ই আগস্ট, 1956 তারিখে সংবাদপত্রে একটি বিচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখে সুরেশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে প্রতিবাদ করেন। সংবাদটি নিম্নোক্তরূপ:

"অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা — 9.8.1956 , বৃহস্পতিবার।

"গত যুদ্ধে ফরমোসার হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু স্বীকৃত —

"অনুসন্ধান কমিটির বক্তব্য আগামীকাল পেশ করা হবে —

"নয়াদিল্লী, আটই আগস্ট, 1956 —

"বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অনুসন্ধান-কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফরমোসায় নেতাজীর দেহান্ত ঘটে। কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান। তিনি ছিলেন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি। আশা করা যায় আগামী শুক্রবারের মধ্যে তিনি তাঁর রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী সমীপে দাখিল করবেন।

"কমিটি জাপান, থাইল্যান্ড, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে সত্তর জন ব্যক্তির সাক্ষ্য-গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে 66 জন কমিটিকে জানিয়েছেন যে, নেতাজীর মৃত্যু বিষয়ে তাঁদের কোনও সংশয় নেই। যে চারজন সাক্ষীর মতে নেতাজী জীবিত তাঁদের মধ্যে মাদ্রাজের এম. এল. এ. শ্রীথেবর এবং শ্রীগোস্বামী — যিনি নেতাজীর মতো দেখতে একজন মঙ্গোলীয় ট্রেড য়ুনিয়ান দলপতির আলোকচিত্র কমিটির কাছে দাখিলও করেন। অপর দু'জন হচ্ছেন বসু-পরিবারভুক্ত।

"ডাক্তারের সাক্ষ্য:

"জানা গেছে, যে চিকিৎসক তাইপের নিকট বিমান দুর্ঘটনায় আহত নেতাজীর চিকিৎসা করেন তিনি নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। যে জঙ্গী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয় কমিটি সেই হাসপাতালের নথীপত্র পরীক্ষা করেছেন। দাহকার্যের কাগজপত্রও দেখেছেন। বসু মহাশয়ের মৃত্যুর সময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, শুশ্রূষাকারী খিদ্‌মদ্‌গার (Nursing orderly) সমেত তাঁদের সকলের জবানবন্দীও গ্রহণ করেছেন। সেই দুর্ভাগা বিমানে নেতাজীর সহযাত্রীদের মধ্যে সাতজন নাকি এখনও জীবিত আছেন; কমিটি তার ভিতর ছয় জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। জানা গেল, ভারত সরকার ফরমোসায় ব্রিটিশ কনসালকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁরা যেন শুশ্রূষাকারিণী চীনা নার্সটির জবানবন্দী সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন — কিন্তু সেই চীন নার্সটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

"টোকিও অবস্থিত তদানীন্তন ব্রিটিশ ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিস ও পূর্ব এশিয়াস্থিত মার্কিন

ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যও কমিটি গ্রহণ করেছেন। এ-ছাড়া তাঁরা সর্বশ্রী হিমাংশুকুমার রায় ও কালীপদ-দে-র সাক্ষ্যও গ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জনে ছিলেন ব্রিটিশ-ভারতের গোয়েন্দা কর্মচারী। জীবিত অথবা মৃত সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করার আদেশ নিয়ে তাঁরা দুজন ব্রিটিশ ভারতের নির্দেশে পূর্ব-এশিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন।

"বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কেউ নেই।

"কমিটির তিনজন সদস্যের ভিতর দু'জন ইতিমধ্যেই রিপোর্টে স্বাক্ষর দিয়েছেন। জানা গেল, তৃতীয় সদস্য হয়তো বিশেষ কারণে সই দিতে অস্বীকার করতে পারেন। তা হোক, কমিটির কাছে তাঁর স্বাক্ষরিত এমন একটি দলিল আছে যাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনিও একমত। তিনি তাঁর দ্বিমত হওয়ার কারণ জানিয়ে কোন-রিপোর্ট দেননি এবং কোন পৃথক রিপোর্টও দাখিল করেননি।"

কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি পাঠ করে সুরেশচন্দ্র অনুসন্ধান-কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খানের নিকট একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। এ পত্রের একটি অনুলিপি তিনি প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলালের কাছেও পাঠিয়ে দেন। সে পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নোক্তরূপ

সুরেশচন্দ্র বসু
No. 2 ময়রা স্ট্রীট
কলকাতা-16
দশই আগস্ট, 1956

"নেতাজীর অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান সমীপে —

"প্রিয় মহাশয়,

গতকল্যকার কলকাতাস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকায় 'গত যুদ্ধে ফরমোসার হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু স্বীকৃত — অনুসন্ধান কমিটির বক্তব্য আগামীকাল পেশ করা হবে' — শিরোনামায় আপনার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। আমার বিস্ময়ের হেতু দ্বিবিধ। প্রথম: অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্ত সরকারকে দাখিল করার পূর্বে সংবাদপত্রে পাঠানো অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। দ্বিতীয়ত আপনি ভারতের বাইরে এবং ভিতরে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্যবার বলেছেন যে, এই অনুসন্ধানের কাজ গোপনে করা হচ্ছে — এর রিপোর্ট বহির্দেশীয় মন্ত্রকের মারফত প্রধানমন্ত্রীকে গোপনে দাখিল করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সেটি সংসদে পেশ করবেন এবং তারপর সেটি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্রে প্রেরিত হবে।

"আপনার নিশ্চয় মনে আছে, আমাদের অনুসন্ধান কমিটির অধিবেশন সর্বদা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে — সদস্যত্রয় ছাড়া শ্রুতিধর, সাক্ষী, ক্ষেত্রবিশেষে দোভাষী ভিন্ন সে কক্ষে কোনও বহিরাগতের প্রবেশাধিকার ছিল না। আপনার নিশ্চয় একথাও মনে

আছে যে, জাপানী বহির্দেশীয় মন্ত্রকের শ্রীহাত্তেরি কয়েকজন জাপানী সাক্ষীকে কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করার বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি ঐ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন আমিই তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম যে, যেহেতু ইতিপূর্বে আমরা কোন বহিরাগতকে আমাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে দিইনি, তাই আমাদের অশেষ উপকার করা সত্ত্বেও শ্রীহাত্তেরিকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া যাবে না। সংক্ষেপে বলা চলে — আমাদের অধিবেশন আদ্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

" আপনার হয়তো আরো মনে আছে যে, দোশরা এপ্রিল, 1956 তারিখে আমি প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলাম — কী পদ্ধতিতে এই অনুসন্ধানকার্য চলবে এ সম্বন্ধে আমি গতকাল শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খানকে প্রশ্ন করেছিলাম — আমি জেনে নিতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের অধিবেশনগুলি গোপনে হবে অথবা প্রকাশ্যে, জনসাধারণের প্রতিনিধি অথবা প্রেসের লোক উপস্থিত থাকতে পারবে কি না। উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, সরকারী অনুসন্ধানকার্য সবসময়েই গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র তার রিপোর্ট বা ফলশ্রুতি সাধারণের জ্ঞাত্যর্থে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়টি নিয়ে পরে যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনি ও আমি আলোচনা করি, তখন কথাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ' কমিটির কোন সদস্য প্রেসের লোকের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ করেন বা আলোচনা করেন এটা অবাঞ্ছনীয়। এমনকি বেসরকারীভাবেও বাইরের কারও সঙ্গে যেন কোন আলোচনা না করা হয়। তৃতীয় লোকের মাধ্যমে সংবাদপত্রে কোন খবর যেন প্রকাশিত না হয় এটা দেখা দরকার।' সুতরাং দেখা যাচ্ছ সহজ অথবা বঙ্কিমপথে কোনভাবেই যেন আমাদের তদন্তের কোন আভাস সংবাদপত্রে প্রতিফলিত না হয় এটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও নির্দেশ।

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনি সজ্ঞানে এবং ইচ্ছা করে প্রধানমন্ত্রীর সে নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন — সংবাদপত্রে এভাবে বিবৃতি দিয়ে।

"আমি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে, আপনি শুধু আপনার সিদ্ধান্তটুকুই সংবাদপত্রে জানিয়ে ক্ষান্ত হননি — সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে আপনি অনেক বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেছেন। ঐ বিস্তারিত সংবাদগুলি, যেমন ধরুন, হাসপাতালের নথীপত্র পরীক্ষা করা, অথবা দাহকার্যের বিবরণ ইত্যাদি আদৌ আপনারা সংগ্রহ করেছেন কিনা আমার তা জানা নেই। এগুলি হয় আদ্যন্ত মিথ্যা রটনা অথবা সত্য হলে আমি বলব এগুলি ইচ্ছা করেই আমাকে জানানো হয়নি।

"আপনার ঘোষণার ঐ পঙ্‌ক্তিটি — 'বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কেউ নেই' সম্বন্ধে বলব—যে উদ্দেশ্য নিয়ে সজ্ঞানে আপনি সত্য গোপন নয়, নিছক মিথ্যাভাষণ করেছেন, আপনার সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমি আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করুন — দেশের

মানুষকে অত সহজে ভেল্‌কি দেখানো যায় না। দেশের মানুষ এ ঘোষণার জন্য আপনাকে বেকসুর খালাশ দেবে না। 'বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কেউ নেই', আপনার এই সোচ্চার ঘোষণা ওরা কেমন করে বিশ্বাস করবে বলুন? আপনি যে একই নিশ্বাসে ঐ সঙ্গে বলেছেন — 'তিনজনের মধ্যে দু'জন এ ঘোষণায় স্বাক্ষর দিয়েছেন।' আমার তো ধারণা দেশবাসীর মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে — তৃতীয়জন কেন স্বাক্ষর দিলেন না? এই অদ্ভুত নীরবতার পিছনে নিশ্চয় অদ্ভুত কোন সংবাদ আছে!

"আমর স্বাক্ষর-সম্বলিত যে স্টেটমেন্টের কথা আপনি উচ্চগ্রামে ঘোষণা করেছেন সে সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল নয় কি? কারণ ও বিষয়ে কিছু বলতে গেলে আপনার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি সত্যকথা আমাকে বলতে হবে, যা এ অবস্থায় এখন আমার তা না বলাই শোভন।

"আপনার উনিশে জুলাইয়ের টেলিগ্রাফ, যেটি আমার হস্তগত হয়েছে সেটি নিম্নোক্তরূপ:

"আপনার চব্বিশ তারিখের তারবার্তা। পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছে যে, রিপোর্ট দিল্লীতেই লেখা হবে। আপনাকে অন্যত্র রিপোর্ট লিখবার কোন অধিকার দেওয়া হয়নি (you were not authorised to go anywhere else to write any report) । আপনি দিল্লীতে ফিরে না এলে আপনাকে নথীপত্রের অনুলিপি পাঠানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি জানেন কমিটির মেয়াদ একত্রিশে (thirtyfirst) জুলাই শেষ হচ্ছে। এক বা একাধিক রিপোর্ট ঐ তারিখের ভিতর সরকারের কাছে; দাখিল করতে হবে। আপনি যদি তেরই (thirteenth) জুলাইয়ের ভিতর কোন রিপোর্ট — তা সে যাই হোক না কেন — না পাঠান তা হলে আমি ধরে নেব আপনার প্রদেয় কোন বক্তব্য নেই।'

"এ সম্বন্ধে বলব — আপনার উপরোক্ত বক্তব্য হয় অসত্য, অধিকার-বহির্ভূত, অযৌক্তিক অথবা অশালীন এবং ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

"দিল্লীতে বসে রিপোর্ট লিখতে হবে এমন কোন সিদ্ধান্ত আমার জ্ঞাতসারে বা আমাকে জানিয়ে কখনও নেওয়া হয়নি। ফলে এ কথা সত্য ছাড়া অন্য কিছু।

"দিল্লীর বাইরে যাবার অধিকার আপনি আমাকে দেবেন কি দেবেন না সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আমার সে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আপনি কোথায় পেয়েছেন জানি না। আপনি দিল্লীতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে বহির্দেশীয় মন্ত্রকের যে ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে আমি কলকাতা অভিমুখে রওনা হবার সময় জানিয়ে এসেছি। কেন যে আমাকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল তাও তিনি সবিশেষ জানেন।

"প্রসঙ্গত: আপনার অবগতির জন্য জানাই যে, জেলা আদালত এমনকি হাইকোর্ট এমন অসংখ্য নজির আছে যে, বিচারক অন্যত্র বসে, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরে বসেও

তাঁদের রায় লিখেছেন। এইসব আদালতে আইনকানুন অত্যন্ত কঠিন ভাবে মেনে চলা হয়।

''আপনি বলেছেন, 'আপনি দিল্লীতে ফিরে না এলে আপনাকে নথীপত্রের অনুলিপি পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না' — এ কথাগুলি অত্যাচারী উৎপীড়কের কণ্ঠেই শোভা পায়, সাংবিধানিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন ভদ্রলোকর পক্ষে কথাগুলি বেমানান। এই প্রসঙ্গে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, নয়াদিল্লীতে 16.7.56 তারিখের অধিবেশনে আমি আপনাকে ও শ্রীমৈত্রকে আমার মতান্তরের রিপোর্ট লিখবার জন্য আপনাদের রিপোর্টের বাকি অংশের এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। এগুলি দেখবার ও হাতের কাছে পাওয়ার অধিকার সদস্য-হিসাবে আমার ছিল ও আছে। শ্রীমৈত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে ঐসব কাগজপত্র আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেননি, অথবা রাখতে পারেননি আপনারই হস্তক্ষেপে। আমাকে এ সব বিষয়ে শ্রীমৈত্রের সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে হয়েছিল — আপনার সঙ্গে নয় — কারণ আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, তদন্ত রিপোর্ট গুছিয়ে লিখবার মত ক্ষমতা আপনার না থাকায় আপনার তরফে শ্রীমৈত্র ঐ রিপোর্ট লিখেছেন।

'' আপনি আরও লিখেছেন, 'আপনি জানেন, কমিটির মেয়াদ একত্রিশে জুলাই শেষ হচ্ছে। এক বা একাধিক রিপোর্ট ঐ তারিখের ভিতর সরকারে দাখিল করতে হবে।' আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ উক্তিটি নির্লজ্জতার পরিচায়ক। আপনার সুচিন্তিত অভিমত অনুসারে কমিটির মেয়াদ ছিল পাঁচ সপ্তাহ — তা 30.4.56 তারিখে শেষ হয়েছে। এরপর সরকারের কাছ থেকে সময়কাল বৃদ্ধি করানোর অনুমতি নেওয়া হয়। রাজস্ব বিভাগ অতিরিক্ত 27,500 টাকা এ জন্য ব্যয়বরাদ্দও অনুমোদন করেন। এই বর্ধিত সময়কালও অতিবাহিত হয়ে যায় আমরা কলকাতাতে থাকতেই, অর্থাৎ বিদেশ যাত্রার আগেই। টোকিও থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসবার সময় আপনি জানিয়েছিলেন পনেরই জুনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। পরে আপনিই আবার তা বর্ধিত করে বললেন ষোলোই জুলাই হচ্ছে শেষ সীমারেখা। ঐ সময়ে নাকি প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফর সেরে ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন, এবং সংসদের অধিবেশনও ঐ সময়ে হওয়ার কথা ছিল। ঐ শেষ সীমারেখার মধ্যে অবশ্য আপনার রিপোর্ট লেখার কাজ শেষ হল না, ফলে আবার সময়কালটা বর্ধিত করে আপনি জানালেন সোমবার, তেইশে জুলাই রিপোর্ট দাখিল করতেই হবে। তারপর পুনরায় আপনি সময়কাল বর্ধিত করেছেন কিনা আমার জানা নেই, কারণ তারপরই আমি দিল্লী থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করি। আপনার 29.7.56 তারিখের তারবার্তায় আপনি আমাকে প্রথমবার জানিয়েছেন যে শেষ সময়কালটা বর্ধিত করে আপনি এবার স্থির করেছেন 31.7.56 তারিখ। পৃথিবীতে যত সম্প্রসারী জিনিসের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আপনার এই রিপোর্ট দাখিল করার

সময়কাল তার মধ্যে সবচেয়ে সহজে লম্বা হচ্ছে দেখছি। গত কালকের কাগজে আবার দেখলাম সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 10.8.56 তারিখে। আশা করি এই শেষ!

" তারপর আপনার 29.7.56 তারিখের তারবার্তা, যা আপনি দিল্লী থেকে কলকাতায় আমাকে পাঠিয়েছেন তাতে আপনি বলেছেন 'আপনি যদি তেরই জুলাইয়ের ভিতর কোন রিপোর্ট—তা সে যাই হোক না কেন, না পাঠান তা'হলে আমি ধরে নেব আপনার প্রদেয় কোন রিপোর্ট নেই।' আপনার বক্তব্য এবং প্রকাশভঙ্গী — আমি আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি — অত্যাচারী উৎপীড়কের পক্ষেই শোভন ভদ্রসন্তানের পক্ষে নয়।

"আপনি 29.7 তারিখের টেলিগ্রামে বলেছেন, 13.7-এর ভিতর আমার রিপোর্ট দাখিল করতে। 13.7.56 তারিখটা আপনার কার্যতালিকা এবং আচরণের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যায়। দিল্লীতে 16.7.56 তারিখে আমি আপনাকে মৌখিকভাবে যে অনুরোধ করেছিলাম এবং কলকাতায় ফিরে এসে 18/7 এবং 21/7 তারিখে ডাকযোগে পুনরায় যে অনুরোধ করেছিলাম — অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমাকে পাঠিয়ে দিতে — তা আপনি রাখেননি। যদি ধরে নিই যে, তেরই (thirteenth) শব্দটি তার-বিভাগের একটা ভ্রান্তি, অর্থাৎ আপনি আসলে ত্রিশে (thirtieth) বলতে চেয়েছেন তাই বা কেমন করে মেনে নিই? উনত্রিশে টেলিগ্রাম করে আপনি তিরিশ তারিখের ভিতর আমার সম্পূর্ণ রিপোর্ট কেমন করে আশা করেন? তা'হলে তার জবাবে আমাকে যে কথা বলতে হয় তা বোধহয় না বলাই ভাল।

"সংবাদপত্রে যে ঘোষণাটি আপনি পাঠিয়েছেন তাতে ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন দেখলাম। অথচ দেখছি, ঐ সব গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে তারা কী জাতীয় শেষ সিদ্ধান্তে এসেছিল সেটা উল্লেখ করতে আপনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গেছেন। কারণ তাদের সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত! এইসব নথীপত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জাপানী কর্তৃপক্ষ যে মুহূর্তে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার কথা ঘোষণা করেছে সে মুহূর্ত থেকেই ঐসব গোয়েন্দা বিভাগ তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। তারা মনে করেছিল, এ রটনা জাপানীদের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফলশ্রুতি এবং নেতাজী কোথাও লুকিয়ে আছেন। তারা বিভিন্ন গোয়েন্দা দলকে পূর্ব-এশিয়ায় প্রেরণ করেছিল — নেতাজীকে বন্দী করে আনতে। পূর্ব-এশিয়ার প্রতিটি প্রান্তে তারা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে ফেরে। কিন্তু তাদের সব অভিযানই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তবু তারা বলেনি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে — বরং বলেছে, নেতাজীকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ছিল তাদের শেষ সিদ্ধান্ত, এবং এই শেষ সিদ্ধান্ত ছিল বলেই আমাদের অনুসন্ধান কমিটির জন্ম।

"আপনার কাছ থেকে আমি নথীপত্রের অনুলিপি বারে বারে চেয়ে পাঠিয়ে হতাশ হয়েছি। আমি আবার আপনাকে জানাচ্ছি, অনুসন্ধান-কমিটির সদস্য হিসাবে এই

কাগজপত্রগুলি আমার দেখবার আইনসঙ্গত অধিকার অনস্বীকার্য। আমাকে এগুলি দেখতে না দেওয়া আপনার পক্ষে বেআইনি কাজ। অনুসন্ধান চলা কালে আপনি বরাবর আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তার সঙ্গে আপনার এই ব্যবহার যদিচ একই সূত্রে গাঁথা, তবু বলব — আপনার এই অধিকারবহির্ভূত মোড়লি সরকার বা জনসাধারণ অন্য অর্থে গ্রহণ করবে। দয়া করে মনে রাখবেন, আপনার এই আচরণের জন্যই আমার রিপোর্ট দাখিল করতে বিলম্ব হচ্ছে এবং এ-জন্য সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র আপনার। এ-জন্য একদিন আপনাকে সরকার এবং জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আপনার সম্বন্ধে এজন্য তাদের কী জাতীয় ধারণা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

'আপনার কাছে আমি যে দু'টি বিল কিছুদিন পূর্বে পাঠিয়েছি সেই দু'টির বাবদ প্রাপ্য টাকা ব্যাঙ্কের চেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

ইতি
ভবদীয়
সুরেশচন্দ্র বসু
10.8.56"

চেয়ারম্যান, নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি
এক নং ক্যানিং লেন, নিউ দিল্লী।

পত্রটি এবং সংবাদপত্রের ঘোষণাটি আদ্যন্ত পাঠ করে আপনাদের কী ধারণা হল আমি জানি না। আপনারা নিরপেক্ষ বিচারক। কোন মত প্রকাশ করে আপনাদের নিরপেক্ষ বিচারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। শুধু বলব, আমার মনে পড়েছিল পোপের একটি উদ্ধৃতি —"He who tells a lie is not sensible how great a task he undertakes, for he must invent twenty more to maintain that one."

জানি জবাবে আপনারা বলবেন—একতরফা একখানা চিঠি পড়ে আমরা কোন রায় দেব না। জবাবে শাহ্‌নওয়াজ-সাহেব কী লিখেছেন তা আগে বলুন। আমি দুঃখিত, তা বলতে পারব না আমি—কারণ, চেয়ারম্যান-সাহেব এ পত্রের আদৌ জবাব দেননি।

তবে সুরেশচন্দ্র জবাব একটি পেয়েছিলেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে।

নং 414 পি.এম. ও/56
নয়াদিল্লী
তেরই আগস্ট 1956

"প্রিয় সুরেশবাবু,

"নেতাজী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানকে লিখিত আপনার 10.8.56 তারিখের পত্রের একটি অনুলিপি আমি পেয়েছি। চিঠিখানি আমি পড়েছি, কিন্তু আপনি কী লিখেছেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না (.....and find it difficult to understand what you have written.)

"যতদূর মনে পড়েছে, তেশরা অগাস্ট চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান এবং কমিটির অপর সদস্য শ্রীমৈত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা তখন আমার কাছে কমিটির রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথীপত্র দাখিল করে যান। তাঁদের কাছে আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা বললেন, পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে রিপোর্ট লেখার কাজে সাহায্য করতে আপনিও তাঁদের সঙ্গে দিল্লীতে এসেছিলেন; কিন্তু তাঁদের কিছু না জানিয়েই নাকি আপনি হঠাৎ দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁরা আমাকে একখণ্ড কাগজ দিয়েছেন, যাতে আপনার স্বাক্ষর আছে — এই কাগজটিতে আপনাদের অনুমোদিত প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি আছে, যার ভিত্তিতে রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছে।

"আমি তাঁদের প্রশ্ন করলাম, এই রিপোর্টে আপনার স্বাক্ষর সংযুক্ত করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, না কি আপনি কোন পৃথক বক্তব্য রাখবেন। উত্তরে তাঁরা জানালেন, তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।

"রিপোর্টে এবং সংশ্লিষ্ট নথীপত্র বহির্দেশীয় মন্ত্রকের কাছে দাখিল করা হয়েছে এবং সেগুলি বর্তমানে সেখানেই সুরক্ষিত আছে। সাধারণ নিয়মানুসারে মন্ত্রক এই কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করে ক্যাবিনেটের সামনে উপস্থাপিত করবেন। ক্যাবিনেট যদি মনে করেন, তা'হলে সংসদে সেটি পেশ করবেন। তারপর ছেপে বার করা হবে। আশা করছি, অচিরেই রিপোর্টটি ক্যাবিনেটের সামনে দাখিল করা হবে। এবং সম্ভবত: এটি ছাপাও হবে।

"এই হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক নির্দেশ; ফলে শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান অথবা কমিটির অন্যান্য সদস্যের রিপোর্ট সম্বন্ধে আর কিছু করণীয় নেই। বস্তুত, কমিটির আর অস্তিত্বই নেই। আপনি যদি কোন পৃথক বক্তব্য রাখতে চান আমরা সেটাও বিবেচনা করে দেখব। আমি দুঃখিত— কোন কাগজপত্র আপনাকে এখান থেকে পাঠানো সম্ভবপর নয়। আপনি যদি চান এখান এসে কাগজপত্রগুলি দেখতে পারেন, যেমনভাবে আমরা সবাই দেখছি।

"আপনি আপনার পত্রে নেতাজী অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানকে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নয়ই অগাস্ট তারিখের একটি সংবাদের বিষয়ে লিখেছেন দেখলাম। আপনি বস্তুত অভিযোগ করেছেন যে, এই ঘোষণার মাধ্যমে চেয়ারম্যান গোপনীয়তার শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আমি এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, তিনি সংবাদপত্রে বস্তুত কোন বিবৃতিই দেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার পত্র পাওয়ার পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংবাদ সম্বন্ধে তিনি আদৌ অবহিত ছিলেন না। সত্য কথা বলতে কি, চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন পূর্বেই তাঁর রিপোর্ট আমার কাছে দাখিল করেছেন। মনে হয়, দৈনিক পত্রে প্রকাশিত সংবাদ কোনও বুদ্ধিমান রিপোর্টারের অনুমানপ্রসূত অথবা হয়তো এটা আমাদের অফিসের কোনও কেরানীর কাজ। বেশ বোঝা যায়, অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের এ ব্যাপারে কোন হাত ছিল না।

ইতি ভবদীয়

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু

2. ময়রা স্ট্রীট, কলি-16

(স্বাঃ) জওয়াহরলাল নেহরু"

পণ্ডিত জওয়াহরলাল শুধু বিদগ্ধ পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিলাতি ব্যারিস্টার। সংসদে নির্বাচিত অনুসন্ধান কমিটির সদস্য তাঁর মতান্তরের রিপোর্ট লিখতে তদন্তের নথীপত্রের অনুলিপি পাওয়ার অধিকারী কি না সে বিষয়ে আপনার-আমার চেয়ে তিনি ভাল জানতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তর্ক চলে না। 'অফিসের কোন কেরানীর কাজে' সরকারী গোপন তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন, পত্রপাঠে এমন তো বোধ হল না। তা'ছাড়া এটা কোন সরকারী কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতা না-ও তো হতে পারে! হয়তো এটা কোন 'বুদ্ধিমান রিপোর্টারের অনুমান-প্রসূত'। এমন 'বুদ্ধিমান' সাংবাদিকের অভাব ভারতবর্ষে কখনও হয়নি। ইতিপূর্বে আর এক বুদ্ধিমান সাংবাদিকের সরেজমিনে তদন্তের রিপোর্টও আমরা দশ বছর পরে হঠাৎ প্রকাশিত হতে দেখেছি এবং তারও পূর্বে আর এক 'বুদ্ধিমান' সাংবাদিক টোকিও থেকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন ডা. রাধাবিনোদ পাল রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রেঙ্কোজী মন্দিরে গিয়ে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন। এমন বুদ্ধিমান সাংবাদিকদের নেহেরু সরকার কিভাবে পুরস্কৃত করতেন জানি না।

প্রধানমন্ত্রীর এ পত্রটি পড়ে আপনাদের কী প্রতিক্রিয়া হল জানতে ইচ্ছে করছে। আমার কী মনে হয়েছে সেকথা আমি বলব না। তাতে আপনাদের নিরপেক্ষ বিচারে হস্তক্ষেপ করা হবে। তবে স্বীকার করব, এবারেও আমার একটি উদ্ধৃতি মনে পড়েছিল—বেনেটের উক্তি : Falsehood often lurks upon the tongue of him, who by self-praise, seeks to enhance his value in the eyes of others!

মোটকথা, সুরেশচন্দ্র এই পত্রটি পেয়ে দু'টি কাজ করেন। প্রথমত, সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে নিজ অবস্থা দেশবাসীকে জানিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত, নেহেরুজীকে একটি শাণিতপত্রে উপযুক্ত জবাব দেন। সংবাদপত্রের বিবৃতিটি নিম্নোক্তরূপ:

"নেতাজী অনুসন্ধান কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে পাঠিয়েছেন। (17.8.56)

"নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি সংক্রান্ত কয়েকটি রিপোর্ট আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখেছি। যেহেতু ঐ রিপোর্টে আমার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর কিছু মন্তব্য যুক্ত হয়েছে এবং যেহেতু দেশবাসীর মনে এই বিষয়ে প্রচণ্ড কৌতূহল আছে, তাই আমি নিম্নোক্ত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করেছি:

"নথীপত্র ও জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হবার পরে 30.6.56 তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুসন্ধান কমিটির এক অধিবেশন হয় — উদ্দেশ্য ছিল সিদ্ধান্তগুলির একটা খসড়া প্রণয়ন। প্রাথমিক পর্যায়ে সদস্যরা সকলেই একমত ছিলেন, কিন্তু যখন সরকারী দু'জন সদস্য ঐ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হয়েছেন বলে সিদ্ধান্তে আসবার পটভূমি রচনা করতে ব্রতী হন তখন আমি আমার মতানৈক্যের কথা প্রকাশ করি। এই

পর্যায়ে চেয়ারম্যান আমাকে একটি পৃথক মতান্তরের রিপোর্ট পেশ করতে বলেন। তারপর আমি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করি এবং আমার কাছে যেসব কাগজপত্র ছিল তারই ভিত্তিতে আমার পৃথক রিপোর্ট প্রণয়নে ব্রতী হই। অন্যান্য নথীপত্রের নকলের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করায় আমি বারে বারে চেয়ারম্যানের কাছে সেগুলির অনুলিপি চেয়ে পাঠাই। গত উনত্রিশ তারিখে আমি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পাই, তাতে আমাকে বলা হয়েছিল যে, পরদিনের মধ্যে যদি আমি আমার মতান্তরের রিপোর্ট দিল্লীতে তাঁর দরবারে পেশ না করি তা'হলে তিনি ধরে নেবেন যে, আমার এ বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। সম্প্রতি শ্রীজওয়াহরলাল নেহেরু আমাকে পৃথক রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করেছেন।

"আমি আমার দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি নিশ্চয়ই আমার সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে পেশ করব। সরকার সেই রিপোর্টটি অনুসন্ধান কমিটির সরকারী রিপোর্টের সঙ্গে একসঙ্গে ছেপে বার করবেন কিনা তা সরকারই বলতে পারেন। কিন্তু আমার দেশবাসীর অদম্য আগ্রহের কথা আমি ভুলিনি — সব কথা জানবার অধিকার তাঁদের অনস্বীকার্য বলেই আমি মনে করি। সুসময়ে আমি তাঁদের সব কথা জানাতে দ্বিধা করব না।

(স্বাঃ) সুরেশচন্দ্র বসু

বেসরকারী সদস্য, নেতাজী অনুসন্ধান কমিটি।"

সংবাদপত্রে এই বিবৃত্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বসু প্রধামন্ত্রীকে যে দীর্ঘ পত্রটি লেখেন তা-ও আদ্যোপান্ত অনুবাদ করে দিতে বাধ্য হলাম। জওয়াহরলাল এই রেজিস্টার্ড পত্রটির জবাবও দেননি, প্রাপ্তি স্বীকারও করেননি। কিন্তু তাঁর নীরবতাই বোধকরি নেতাজীর-রহস্য সমাধানে তদানীন্তন সরকারের আগ্রহটা আমাদের বুঝিয়ে দেবে।

"শ্রীজওয়াহরলাল নেহরু,

"প্রধানমন্ত্রী, নয়াদিল্লী,

" প্রিয় শ্রীনেহেরু,

"আপনার গত কল্যকার 414 পি এম ও 56 নং পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

"আমি কি লিখেছি তা আপনি বুঝে উঠতে পারেননি জেনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। যদি ইংরেজি রচনার কৌশলের কথা বলেন, তবে আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি খাঁটি ইংরেজের মত ইংরেজি ভাষা লিখবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি বক্তব্য বিষয়টিই আপনার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়ে থাকে তা'হলে বলব, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কোন একটি বিষয়ে যখন কোন মানুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা থাকে তখন অপরের অন্য ধরনের যুক্তি তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে চায় না, এটা প্রায়শই দেখা যায়।

" আমি দুঃখিত, আপনার অমূল্য সময়ের অনেকখানি আমি নষ্ট করব। কারণ আপনি

আপনার পত্রে যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার জবাবে আমাকে বাধ্য হয়ে অনেক কথা বলতে হবে। আমাকে আপনি মার্জনা করবেন।

" অনুসন্ধান কমিটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে আমি যথাক্রমে 27.3.56 থেকে 17.4.56 এবং 17.6.56 থেকে 12.7.56 তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট আটচল্লিশ দিন দিল্লীতে আমার কন্যার বাড়িতে ছিলাম। ঐ সময়কালের জন্য দিল্লীতে আমার আহার বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারকে কোন খরচ করতে হয়নি। ঘটনাচক্রে 12.7.56 তারিখে আমার কন্যাকে হঠাৎ বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয়। ঐ তারিখে রাত প্রায় দশটার সময় আমাকে ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয় এবং আমার এক বন্ধুর আতিথেয়তার প্রসাদে সে রাত্রে আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। পরদিন সকালে অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় আমি তাঁকে দিল্লীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমি তাঁকে বারে বারে তাগাদা দেওয়ায় আমাকে জানানো হয়, পরদিন অর্থাৎ 14.7.56 তারিখ সকাল থেকে কোটা-হাউসে আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। কোটা-হাউস সম্বন্ধে যেহেতু আমার কোন ধারণা ছিল না তাই আমি চেয়ারম্যানকে সেখানকার ব্যবস্থাপনার কথা জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি বলেন, বাসগৃহ, স্নানাগার ও খাদ্য — সবই সেখানে প্রশংসনীয়। আমি স্বচক্ষে একবার দেখে আসবার প্রস্তাব করায় অধিবেশন-শেষে বাড়ি ফেরার পথে আমরা তিনজনেই কোটা-হাউসে যাই। সেখানে বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে পারলাম যে, কোটা-হাউসের মূল অট্টালিকায় আমার থাকার জন্য কোন ঘর নির্দিষ্ট হয়নি — বাড়ির আউট-হাউসে একটি খাপরার ঘরে (hutment) আমার জন্য স্থান-সঙ্কুলান করা হয়েছে। আমি চেয়ারম্যানকে তৎক্ষণাৎ জানিয়েছিলাম যে, এটা আমার কাছে অবমাননাকর বলে মনে হয়েছে। আমি তখন তাঁকে ইম্পিরিয়াল হোটেলে আমার জন্য একটি কামরা স্থির করার দাবি জানিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, বাধ্য হয়ে বন্ধুর আবাসে থাকায় তাঁর এবং আমার উভয়েরই অসুবিধা ঘটেছে। চেয়ারম্যান আমাকে উত্তরে জানালেন যে, সেটা শনিবার এবং তখন বেলা পৌনে দু'টো। ফলে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে তখন পাওয়া যাবে না। জবাবে আমি বলেছিলাম — সরকার আপনাকে বাড়িতে একটি টেলিফোন দিয়েছে অফিস টাইমের বাইরে জরুরী কাজে তা ব্যবহারের জন্য। আমি সরকারী তদন্ত কাজে সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দিল্লীতে এসে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি, ফলে এটি একটি জরুরী কাজ। তিনি অনায়াসে তাঁর বাড়ি থেকে টেলিফোনযোগে সংশ্লিষ্ট অফিসার অথবা সরকারি হোটেলের সঙ্গে কথা বলে আমার ব্যবস্থা করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি কোন ব্যবস্থাই করলেন না। আমার অসুবিধা চলতেই থাকল।

সোমবার, ষোলই অগাস্ট আমি চেয়ারম্যানকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, দিল্লীতে আমার

অবস্থানের কোন ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না। আমি তাঁকে আরও বলেছিলাম যে, সেটি আমার যন্ত্রণাভোগের চতুর্থ দিন এবং আমি আমার বন্ধুর অসুবিধা করে আর একটি দিনও দিল্লীতে থাকতে রাজি নই। তিনি তখন পুনরায় কারও সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং আমি চেয়ারম্যানকে পুনরায় অনুরোধ করলাম ইম্পিরিয়াল হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যাই হোক, বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রী এস. কে. রায় আমাকে জানালেন যে, ইম্পিরিয়াল হোটেলে আমার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে — তিনি আরও বললেন, মধ্যাহ্নবিরতির পূর্বেই তিনি পাকা খবর আমাকে টেলিফোন করে জানাবেন। বেলা পৌনে তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তাঁর সেই পাকা খবর এল না আমি নিজেই তাঁকে ফোন করলাম। তিনি তখন আমার সঙ্গে এসে দেখা করলেন, এবং বললেন যে, জয়েন্ট-সেক্রেটারি শ্রীকাউলের সঙ্গে কথা বলে ও পাকা অর্ডার করিয়ে তিনি বেলা চারটার মধ্যে আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করবেন। আমি তখন নিজের গরজেই ইম্পিরিয়াল হোটেলে গিয়ে খোঁজখবর নিলাম। সেখানে জানলাম আমার নামে একটি কামরা 'প্রভিশনালি বুক' করা হয়েছে — হোটেল কর্তৃপক্ষ বহির্দেশীয় মন্ত্রকের কাছ থেকে এ বিষয়ে তখন পাকা অর্ডার-এর প্রতীক্ষা করছেন। পাকা অর্ডার এলেই আমাকে সে ঘরে যেতে দেওয়া হবে। শ্রীরায় তাঁর প্রতিশ্রুতিমতো বেলা চারটার মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, টেলিফোনও করলেন না, অথবা কোনও সংবাদ-বাহককেও পাঠালেন না। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ সরকারী গাড়ির ড্রাইভার এসে আমার কাছে জানতে চাইল পরদিন আমি কখন ইম্পিরিয়াল হোটেলে যাব। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইম্পিরিয়াল হোটেলে পাকা অর্ডার দেওয়া হয়েছে এমন কোন খবর সে জানে কিনা — অথবা শ্রীরায়ের কাছ থেকে কোন লিখিত বা মৌখিক নির্দেশ সে নিয়ে এসেছে কিনা। জবাবে ড্রাইভারটি জানালো এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না।

"প্রসঙ্গত, ঐদিনই সকালের অধিবেশনে চেয়ারম্যান আমাকে জানিয়েছিলেন যে, যেহেতু আমি তাঁদের দু'জনের সঙ্গে একমত হতে পারছি না তাই তাঁদের দু'জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোন অধিবেশনে আমার বসবার অধিকার নেই। তার উত্তরে আমি শ্রীমৈত্রকে বলেছিলাম, তাঁর রিপোর্টের বাকি অংশটা যেন তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন, যা দেখে আমি আমার মতান্তরের রিপোর্ট প্রণয়ন করতে পারি। শ্রীমৈত্র আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যেমন যেমন বিভিন্ন অধ্যায় টাইপ করা হয়ে যাবে তেমন তেমন উনি তার এক কপি ডাকযোগে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

"জেলা আদালতেই বলুন অথবা হাইকোর্টই বলুন মতান্তরের রায় অন্য স্থানে বসে লেখার, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার অসংখ্য নজির আছে। তা'ছাড়া চারদিন ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করেও যখন আমার দিল্লীতে থাকার কোন ব্যবস্থা

ওঁরা করলেন না, এবং অদূর ভবিষ্যতে করবেন বলেও কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিলেন না, এবং সর্বোপরি ওঁদের সঙ্গে একত্রে বসতেও যখন চেয়ারম্যানের আপত্তি হল তখন দিল্লী ত্যাগ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল কোথায়? আপনার অফিসারবৃন্দ যদি অকর্মণ্য অপদার্থ হয়, সৌজন্যবোধের কণামাত্র অবশেষ যদি তাদের না থাকে, তা'হলে আমি কী করতে পারি? আমার ধৈর্যেরও তো একটি সীমা থাকবে!

"আমার সহযোগীরা আপনাকে নাকি বলেছেন যে, তাঁদের ঐ রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর সংযুক্ত করব কিনা অথবা পৃথক মতান্তরের রিপোর্ট দাখিল করব কিনা সে বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন না। আমি দৃঢ়স্বরে বলব — তা তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি এই কথা ভেবে যে, এত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কেমন করে এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাটা বললেন! শ্রী এস. এন মৈত্রকে 10.7.56 তারিখের ভিতরে খসড়া রিপোর্টটি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছিল। তিনি 13.7.56 তারিখে তার অংশমাত্র আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। তখন আমরা সেই আংশিক রিপোর্টের উপর আলোচনায় বসি। তাঁর রিপোর্টের কোনো কোনো অংশে সাক্ষীদের জবানবন্দীতে কিছু কিছু অসঙ্গতির উল্লেখ তিনি করেছিলেন। আমি তাঁর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি বলেছিলাম, আরও অনেক গুরুতর ব্যাপারে অনুরূপ অসঙ্গতি রয়ে গেছে যার উল্লেখ তিনি করেননি। ফলে আমি জানিয়েছিলাম যে, সবগুলি জবানবন্দী ও নথীপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তবেই আমি বলতে পারব যে, ওঁদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পেরেছি কি না অর্থাৎ নেতাজীকে নিয়ে যে প্লেনটি যাচ্ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে সেটি আদৌ দুর্ঘটনায় পড়েছিল কি না — এবং সেই কারণে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে কি না।

"পরদিন অর্থাৎ 14.7.56 তারিখে যখন আমরা ঐ খসড়া রিপোর্টের ওপর আলোচনা করতে পুনরায় মিলিত হলাম তখন আমি সক্ষেদে চেয়ারম্যানকে জানাতে বাধ্য হলাম — তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না! আমি তখন চেয়ারম্যানের কাছে আমার পরবর্তী কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত তাই জানতে চাইলাম। তিনি জবাবে বললেন, আমাকে একটি পৃথক মতান্তরের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, তার জবাবে আমি বলেছিলাম, সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কাজ হবে। কারণ একা হাতে আমাকে ঐ রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে। আমি এই পর্যায়ে বরং ওঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকি যে, যেহেতু সাক্ষীদের জবানবন্দীতে অসংখ্য অসঙ্গতি রয়ে গেছে তাই আমাদের তিনজনেরই সম্মিলিত অভিমত হওয়া উচিত — বিমান দুর্ঘটনা আদৌ হয়নি এবং নেতাজীও ঐ তথাকথিত দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তাঁরা তখন জানালেন, তাঁরা তাঁদের মতেই দৃঢ় থাকবেন।

"তার পরদিন পনের তারিখ ছিল রবিবার। সুতরাং আমরা সোমবার ষোলই আবার

মিলিত হলাম। তখনই চেয়ারম্যান আমাকে জানালেন যে, যেহেতু আমি ওঁদের দু'জনের সঙ্গে একমত হতে পারছি না, তাই আমার পক্ষে ওঁদের সঙ্গে একত্রে বসে রিপোর্ট-লেখায় সাহায্য করাটা আর ঠিক হবে না। আমার উপস্থিতি ওঁদের বাধারই সৃষ্টি করবে শুধু। ফলে, আমি ওঁদের অনুরোধ করলাম যে রিপোর্টের বাকি অংশ এবং জবানবন্দী ও নথীপত্রের অনুলিপি আমাকে পাঠিয়ে দিতে — যার সাহায্যে আমি পৃথকভাবে আমার মতান্তরের রিপোর্ট দাখিল করতে পারি। তাঁদের দু'জনের উপস্থিতিতেই আমি সেক্রেটারি শ্রী আর. দয়ালের কাছ থেকে কয়েকটি নথীপত্রের অনুলিপি সংগ্রহ করলাম এবং তাঁকে বললাম চেয়ারম্যান আমাকে যে নথীপত্রের নকল তখন পর্যন্ত দেননি সেগুলি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। সেই কাগজগুলি আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। এজন্য আমি চেয়ারম্যানকে বারে বারে চিঠি লিখেছি এবং টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

"আমার দিল্লীতে থাকা যখন নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন আমি চেয়ারম্যানকে বললাম যে, একথা আমি সেই অফিসারটিকে জানাতে চাই যিনি আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন। ঘরে তখন কোন আরদালি ছিল না; শ্রীমৈত্র নিজেই ভদ্রতা করে আমাকে স্টাফ অফিসারের ঘরে পৌঁছে দিলেন। সেখানে সেই শিখ ভদ্রলোকটি ছিলেন, যিনি আমাদের শ্রুতিধর হিসাবে কাজ করছিলেন। শ্রীমৈত্র তাঁকে অনুরোধ করলেন, আমাকে ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রী এস. কে. রায়ের কামরায় পৌঁছে দিতে। শিখ ভদ্রলোক সে অনুরোধ রেখেছিলেন।

"তাই আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, এই অবস্থায় কেন আমার সহকর্মীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত একজন শ্রোতার কাছে এভাবে বলতে পারলেন যে, তাঁরা আদৌ জানেন না, আমি তাঁদের রিপোর্টের নিচে সই দেব অথবা মতান্তরের রিপোর্ট দাখিল করব। তা যদি তাঁরা বলে থাকেন, — এবং আপনি তো আপনার পত্রে লিখেছেন যে তাই তাঁরা বলেছেন,— তা'হলে আমি বলতে বাধ্য যে, তাঁরা জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলেছেন।

'আমাকে কোন কাগজপত্র পাঠানো যাবে না জেনে মর্মাহত হলাম। আমি মূল দলিল বা নথী কখনই চাইনি বা তার কথা চিন্তাও করিনি। মনোনীত সদস্য হিসাবে সমস্ত নথীর একটি করে অনুলিপি লাভ করার আইনসঙ্গত অধিকার আমার আছে। আমি সবিনয়ে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রগুলির এক কপি করে অনুলিপি ইনশিওর্ড ডাকে আমাকে পাঠালে সরকারের তহবিলের খরচটা অনেক কম পড়ত—কারণ বিকল্প হিসাবে সরকার আমার দিল্লী যাতায়াতের ভাড়া বহন করতে রাজি। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি ভুল হচ্ছে আমার—আমাদের মত গরীবের কাছে— খরচটা যত বড়, উচ্চকোটির মানুষ—বিশেষ করে এদেশের সরকারের কাছে খরচের কথাটা তত

বড় নয়। সদস্য হিসাবে আমার প্রতিটি নথীপত্রের অনুলিপি পাওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার অনস্বীকার্য, তবু যখন চেয়ারম্যান আমার মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, নথীপত্রের অনুলিপি পাওয়ার অধিকার আমার নেই, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, উচ্চতর কোন মহদাশয় ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলন ছাড়া এতবড় বেআইনি কথাটা তিনি কিছুতেই বলবেন না। আপনার বর্তমান পত্রে আমার সে আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হল।

"খবরের কাগজের ঘোষণাটি সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য পড়ে আমার একটিমাত্র নিবেদন আছে: আমার মতে সরকারী সংবাদ অফিস-মাস্টার সোজাপথে এবং খোলাখুলিভাবে সংবাদপত্রে পাঠাবেন এটাই সুরুচিসম্মত এবং বাঞ্ছনীয়। পেছনের চোরাগলি পথে আপাতবিশ্বাসঘাতক অধীনস্থ কর্মচারী বাইরের লোকের কাছে সংবাদ পাচার করে দিচ্ছে বুঝেও চোখ বুঁজে থাকা এবং মনে মনে খুশী হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

"শেষ করবার আগে সবিনয়ে বলব যে সরকার আমাকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করে যথেষ্ট সময় ও অর্থ আমার উপর ব্যয় করেছেন। আমিও সানন্দে আমার সময় ও শক্তি এ কার্যে ব্যয়িত করেছি। ফলে আমি যদি আমার মতান্তরের রিপোর্ট দাখিল না করি তা'হলে আমি সরকারের কাছে, দেশের কাছে এবং আমার বিবেকের কাছে চির অপরাধী হয়ে থাকব। আমি আমার সাধ্যমত এই রিপোর্ট যথাসম্ভব দ্রুত প্রণয়ন করে দাখিল করব — এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাকে যখন সরকার কোনই সাহায্য করতে পারবেন না, তখন একা-হাতে এ রিপোর্ট তৈরি করতে আমার কিছু সময় লাগবে। তবু আমি কথা দিচ্ছি, যত শীঘ্র সম্ভব আমার বক্তব্য আমি পেশ করব এবং আজ থেকে দশদিনের বেশি সময় আমি নেব না।

"যদি এ পত্রে প্রকাশিত আমার কোন মতামত আপনার কাছে মাত্রাতিরিক্ত কড়া বলে মনে হয় তবে আমাকে মার্জনা করবেন।

'শ্রদ্ধেয় ইতি
পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ভবদীয়
ভারতের প্রধানমন্ত্রী সুরেশচন্দ্র বসু
নয়াদিল্লি 15.8.56 "

এই পত্রটি যখন লেখা হয় সম্ভবত প্রাপক তখন স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার ওপর স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়াতে ব্যস্ত। পরদিন তিনি পত্রটি পান কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর করেন না।

সুরেশচন্দ্র বলছেন, "ঐ দিন, অর্থাৎ ঐ 15.8.56 তারিখে সকালে তদানীন্তন পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বিকাল চারটার সময় দেখা করতে বলেন। আমি দেখা করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে থাকেন, যাতে আমি আমার

সহকর্মীদের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁদের রিপোর্টে স্বাক্ষর দিই। আমি দুঃখের সঙ্গে জানালাম যে, তা আমার পক্ষে অসম্ভব এবং কারণও জানালাম। তখন তিনি জানতে চাইলেন, কেন আমি পৃথক রিপোর্ট দাখিল করছি না। জবাবে আমি বললাম, তার একমাত্র কারণ চেয়ারম্যান আমাকে কোনও কাগজপত্র দেখতে দিচ্ছেন না, যদিও সেগুলি দেখবার আইনসঙ্গত অধিকার আমার আছে এবং এই মর্মে চেয়ারম্যান আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন আমার কাছে জানতে চাইলেন, এই কাগজগুলি যদি তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে আনিয়ে দেন তা'হলে আমার রিপোর্ট দাখিল করতে কতদিন সময় লাগবে। তার জবাবে আমি বলেছিলাম, কাগজপত্র পাওয়ার দশ দিনের মধ্যেই আমি রিপোর্ট দাখিল করতে পারব। মনে হল এতে তিনি খুশী হলেন এবং আমার সামনেই প্রধানমন্ত্রীর একটি পত্রের জবাব তখনই 'ডিক্‌টেশান' দিলেন — তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন যেন নথীপত্রের অনুলিপি পত্রপ্রাপ্তি মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—তা'হলে আমি 30.8.56 তারিখের মধ্য আমার রিপোর্ট দাখিল করব।" (2/51)

দুর্ভাগ্যবশত তা সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্রকে সে-সব নথীপত্রের অনুলিপি পাঠানো হয়নি। সুরেশচন্দ্র কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। রেজিস্ট্রি ডাকে 9.10.56 তারিখে তিনি তাঁর মতান্তরের রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। চিঠিখানি "অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ" থাকায় পোস্টাফিসের ছাপ মারা কাগজখানি তাঁর কাছে ফিরে আসে। বহির্দেশীয় মন্ত্রক সে রিপোর্টের প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করেনি। বলা বাহুল্য, তাঁর সে মতান্তরের রিপোর্ট সরকার ছাপেননি। এমনকি শাহনওয়াজের রিপোর্টটি ছাপবার সময় তার নাম দেন 'নেতাজী ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট'— যদিও সেটি কমিটির দু'জন সভ্যের রিপোর্ট!

সুরেশচন্দ্র অভিযোগ করেছেন যে, বহির্দেশীয় মন্ত্রক 'নেতাজী ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট'-এর কোন কপি তাঁকে পাঠায়নি, যদিও বহু লোককে এই রিপোর্ট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

11.11.56 তারিখে সুরেশচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাঁর মতান্তরের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

শাহ্‌নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে যে সিদ্ধান্তেই এসে থাকুক না কেন—বহির্দেশীয় মন্ত্রক, জওয়াহরলাল এবং কমিটির দু'জন সরকারী সদস্যের যে আচরণ আমরা দেখেছি তাতে মনে হয় নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান সংক্রান্ত রহস্যের সমাধান করার উদ্দেশ্য তাঁদের আদৌ ছিল না — জনমতের চাপে তাঁরা সরকারীভাবে কাল্পনিক প্রমাণ রাখতে চেয়েছিলেন — নেতাজী মারা গেছেন। সে সময় সমগ্র ভারতে গণনির্বাচন ছিল আসন্ন। যিনি যতবড় জননেতাই হন না কেন, পাঁচ বছর পর তাঁর বুকটা আজও একটু দুরুদুরু করে এই দুর্ভাগা দেশে। সুভাষদরদী বামপন্থী দলগুলিকে নির্বাচন যুদ্ধে কায়দা করতে হলে সে সময় সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি লোক-দেখানো তদন্ত অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কমিটির দু'জন সরকারী সদস্য এবং বহির্দেশীয় মন্ত্রক ক্ষমতাসীন শাসকদলের নির্দেশে চলবেন এ আর বিচিত্র কী!

আর স্বয়ং জওহরলাল সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন। যৌবনের প্রথম ক'টি বছর বাদ দিলে দেখা যাবে জওয়াহরলাল কোন দিনই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারেননি। ভারতবর্ষের প্রগতিশীল যুবশক্তি জওহরলালের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল — ভেবেছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ নীতি যুগবিবর্তনের পথে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হবে তার কর্ণধার হবেন দুই তরুণ জননেতা — জয়াওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র! কিন্তু তা হয়নি। সুভাষচন্দ্র বারে বারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন — হতাশ হয়েছেন। ভারতের তদানীন্তন যুবশক্তিও আস্থা হারিয়েছিল জওয়াহরলালের নেতৃত্বে। সে আঘাত জওয়াহরলাল বাকি জীবনে ভুলতে পারেননি। সেই বেদনা চরমে উঠল যখন সম্পূর্ণ একাকী কংগ্রেস-বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রামকে রূপান্তরিত করলেন শাশ্বত ইতিহাসে — ভারতের বাইরে চলে গিয়ে।

জওয়াহরলাল রাজ্য পেলেন, গদি পেলেন, ক্ষমতার তুঙ্গে উঠলেন — কিন্তু অনুপস্থিত 'নেতাজী'র প্রতি যে শ্রদ্ধা, যে সম্মান, যে উদ্দাম ভালবাসার অর্ঘ্য দেবার জন্য দেশবাসী উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেছিল — সে শ্রদ্ধা, সে সম্মান, সে ভালবাসা পণ্ডিতজী কোনদিনই পেলেন না। সে ক্ষেদ তাঁর সারা জীবনে যায়নি।

দুঃখের কথা, জওয়াহরলাল তাঁর আচরণে এই মনোভাবটিকে সঙ্গোপন করতে পারেননি। এটা তাঁর স্বভাব নয়। প্রসঙ্গত আর একজন বাঙালী জননেতার কথা বলতে পারি। ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবার পরেও এই বাংলার আর এক দামাল ছেলের নির্মম কশাঘাতে প্রতিটি অন্যায় আচরণের জন্য তাঁকে বারে বারে জর্জরিত হতে হয়েছিল। কাশ্মীরের বন্দীশালায় যখন তাঁর মৃত্যু হল — জওয়াহরলাল তখন ইংলন্ডেশ্বরের আমন্ত্রণে বিলাতে। মহাশব এল কলকাতায় — সমস্ত দেশ হাহাকার করে উঠল — দেশ-বিদেশ থেকে শোকবার্তায় ভবানীপুরের বাড়ি ভরে গেল। অথচ আশ্চর্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোন শোকবার্তা পাঠালেন না। এগারো দিন পরে শ্রাদ্ধ হয়ে গেল — জওয়াহরলালের শোকবার্তা তখনও আসেনি। শ্রাদ্ধবাসরে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র এসে দেখতে চাইলেন শোকবার্তাগুলি। জওয়াহরলালের শোকবার্তা নেই দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। নেপথ্যে কী হল জানি না — তার দু'দিন বাদে দিল্লী থেকে অশীতিপর বৃদ্ধা শ্যামাপ্রসাদ-জননীর কাছে এল প্রধানমন্ত্রীর হাস্যকর তারবার্তা — "আপনার সঠিক ঠিকানা জানা না থাকায় আমার শোকবার্তা পাঠাতে বিলম্ব হল।"

এই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক সংবাদটি পেশ করলাম বিরুদ্ধপক্ষদের প্রতি তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের মনোভাব কী ছিল তা জানাতে। নেতাজীর সম্বন্ধে সত্যপ্রকাশে এখানেই ছিল বাধা — দীর্ঘদিন ধরে! জওয়াহরলাল গত হয়েছেন, বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁর চিতাভস্ম আমরা সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছি — তবু তাঁর কৃতকর্মের শান্তি হয়নি। আজ তাঁর কন্যা

আবার পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি. ডি. খোসলাকে আহ্বান করেছেন জওয়াহরলালের আশীর্বাদধন্য শাহ্নওয়াজ কমিটির সেই রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা করতে!

প্রসঙ্গত, সুরেশচন্দ্রের মতান্তরের রিপোর্টের শেষ ছত্রটি ছিল 'সত্যমেব জয়তে ! জয়হিন্দ্!'

প্রতিশ্রুতিমত এবার আমরা 17.8.45 থেকে 8.9.45 পর্যন্ত তিন সপ্তাহের ঘটনাবলী যাচাই করে দেখব। প্রতিটি তথ্যের বিভিন্ন সূত্র পর পর দেখে যাব। যেখানে সাক্ষীরা একমত এবং যেখানে ভিন্নমত — সবই একত্র সঙ্কলন করে যাব। ছোট ব্র্যাকেটযোগে আমাদের সঙ্কলিত তথ্যের মূল কোথায় তার সঙ্কেতও রেখে যাচ্ছি। বড়-ব্র্যাকেটে বর্তমান গ্রন্থকারের মন্তব্য:

1. 17.8.45 — **সাইগঙ ত্যাগ:**

সাইগঙে নেতাজী ও হবিবর দু'জনে বিমানে আসন পেয়েছেন। নেতাজী একমাত্র কর্নেল হবিবর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হবেন স্থির করে বিমান-বন্দরের দিকে যাত্রা করলেন। স্থির হয়েছিল ওঁর বাকি পাঁচজন সহচর আপাতত সাইগঙে থাকবেন। সুযোগমত তাঁরা নেতাজীর অনুগমন করবেন। **শ্রী এস. এ. আইয়ার** তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন,—

(ক) "তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম আমরা। তৈরি আমরা হয়েই ছিলাম। সে-যার ব্যাগ তুলে নিলাম কাঁধে। দু'টি গাড়িতে রওনা দিলাম বিমান-বন্দরের দিকে। প্রথমটিতে নেতাজী, হবিব এবং আমি; দ্বিতীয়টিতে গুলজারা সিং, প্রীতম সিং, আবিদ হাসান এবং দেবনাথ দাশ। আমরা পৌঁছলাম, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িখানার দেখা নেই। পাঁট মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল — তবু দ্বিতীয় গাড়িটা আসে না। সবাই অধৈর্য হয়ে পড়ে। প্লেনের প্রপেলারটা ঘুরছে অনেকক্ষণ ধরে। জাপানী সেনাপতি লেফটানেন্ট-জেনারেল শীদেয়ী ঐ প্লেনেই যাবেন, তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছেন প্লেনে — নেতাজীর অপেক্ষায়। কুড়ি মিনিট হয়ে গেল তবু দ্বিতীয় গাড়িটা আসে না। ওঁরা নেতাজীকে বললেন, আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। নেতাজী কিন্তু দৃঢ়সংকল্প। বললেন, — না, ও গাড়িতে আমার অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজপত্র আছে।

অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িখানা এসে পৌঁছালো; কিছু বিভ্রাট হয়েছিল পথে।

"নেতাজী সংক্ষিপ্ত বিদায় নিলেন আমাদের কাছে। হবিবর আর নেতাজী উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। মিলিয়ে গেলেন প্লেনের গর্ভে। ছাড়ল প্লেনটা ঠিক পাঁচটা পনের মিনিটে। সতেরই অগাস্ট সন্ধ্যায় (6/xxviii)।

(খ) **শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে** এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে — সাইগঙে পরিকল্পনামত কাজ হল না। নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীদের জন্য কিছুতেই একটা গোটা

প্লেন যোগাড় করা গেল না। ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি বললেন, নেতাজীর সর্বপ্রথমে টোকিও যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যথেষ্ট আসন না থাকায় তিনি নেতাজীকে একাকীই যেতে বললেন (1/12) ।......নেতাজী বাধ্য হয়ে ঐ দু'টি আসনই গ্রহণ করলেন, তার এবং হবিবের। .....সাইগণ্ড এয়ারপোর্টে তাঁরা দু'খানি গাড়িতে করে এলেন। নেতাজী ছিলেন আগের গাড়িতে। .....প্লেনটি দীর্ঘসময় অপেক্ষা করছিল। ঐ একই প্লেনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে কয়েকজন জাপানী অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়িখানা না আসা পর্যন্ত কিছুতেই রওনা হতে চাইলেন না নেতাজী। এই দ্বিতীয় গাড়িখানায় দুটি চামড়ার স্যুটকেস ছিল — তাতে সোনা ও জড়োয়া গহনা ভরতি ছিল। নেতাজী ঐ বাক্স দু'টি না নিয়ে কিছুতেই যেতে সম্মত হলেন না। প্লেনটি আগে থেকেই খুব বেশী ভরতি ছিল, তাই আপত্তি উঠল — কিন্তু তবু সেই বাক্স দু'টি প্লেনে তোলা হল। জাপানী যাত্রীদের মধ্যে একজন অতি উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন—লেফটানেন্ট জেনারেল শীদেয়ী। তিনি বর্মা রণাঙ্গনের চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ছিলেন এবং মাঞ্চুরিয়ার কুয়োমিনটাঙ বাহিনীর প্রধান হিসাবে ঐ প্লেনে মাঞ্চুরিয়ায় যাচ্ছিলেন। নেতাজীর সঙ্গে তাঁর একই বিমানে ভ্রমণ করাটা নিতান্তই ভাগ্যের খেলা। .....মিস্টার নিগেশী আমাদের বলেছিলেন, জেনারেল শীদেয়ী রাশিয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে জাপানীদের তরফে তিনি ছিলেন মূল খুঁটি (General Shidei was an expert on Russian affairs in the Japanese Army and was considered to be a key-man for negotiations with Russsia) ..... জেনারেল শীদেয়ী ছাড়া বিমানে আরও পাঁচজন জাপানী জঙ্গী অফিসার যাত্রী হিসাবে ছিলেন। তাঁর হচ্ছেন:

1. লে. কর্নেল তাদিরো সাকাই — বর্মী বাহিনীর স্টাফ অফিসার
2. লে. কর্নেল শীরো নোনাগাকি — বিমান বাহিনীর অফিসার
3. মেজর তারো কোনো . ঐ
4. মেজর ইহাদো তাকাহাশী — স্টাফ অফিসার
5. ক্যাপ্টেন কৈকিচি আরাই — বিমান বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার।

এছাড়া ছিলেন বিমান চালনার জন্য অফিসারবৃন্দ:

6. চীফ পাইলট — মেজর তাকিজাওয়া
7. কো-পাইলট ডাবলু. আইয়োয়াগি
8. নেভিগেটার—সার্জেন্ট ওকিস্তা
9. রেডিও-অপারটের—এন. সি. ও. তোমিনাগা।

10 ও 11 এছাড়াও দু'জন কর্মী যাঁদের নাম জানা যায়নি। নেতাজী ও হবিবরকে নিয়ে প্লেনে ছিলেন 13 জন যাত্রী। (1/14-15)

(গ) **সুরেশচন্দ্রের মতে:**

(i) কাউন্ট তেরাউচি যে নেতাজীকে একটি গোটা বিমান দিতে পারলেন না তার কারণ তিনি চেয়েছিলেন নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ায় গোপনে পাচার করতে।

(ii) মাঞ্চুরিয়া-বিশেষজ্ঞ শীদেয়ীর উপস্থিতি মোটেই ভাগ্যক্রমে নয়, সুপরিকল্পিত।

(iii) বিমানটি শুধু টোকিও যাচ্ছিল না — যাচ্ছিল দাইরেন হয়ে। সেখানে নেতাজী এবং শীদেয়ীর নেমে যাওয়ার কথা ছিল। (2/70-76)

(ঘ) দ. পূ. এশিয়ার আই. আই. লীগের প্রাক্তন সম্পাদক **শ্রীদেবনাথ দাশের মতে:**

"সাইগঙ ত্যাগ সম্বন্ধে জাপানীরা একেবারে শেষ পর্যায়ে তাদের পরিকল্পনা বদলে ফেলেছিল। তারা নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ার পরিবর্তে প্রথমে টোকিওতে নিয়ে যেতে চায়। নেতাজী নাকি গন্তব্যস্থলের এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে খুশী হননি। নেতাজী নাকি সে সময় শ্রীদাশকে একথা বলেন।" (আনন্দবাজার' 20.10.70)

(ঙ) **শ্রীহায়াশিদার মতে:**

'সাইগঙ বিমানবন্দর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় (17.8.45) বিমানটি যাত্রা করে। সম্পূর্ণ রানওয়ে অতিক্রম করার পূর্বে প্লেনটি আকাশে ওঠে না। তা থেকে বোঝা যায় প্লেনটিতে বেশী ওজন চাপানো হয়েছিল।" (10/108)

(মন্তব্য: দেখা যাচ্ছে যে, শ্রী আইয়ার জানতেন না বাক্সে বহুমূল্য জড়োয়া গহনা ছিল, অথবা জেনেও সেকথা প্রকাশ করেননি। তিনি জানতেন লে. জেনারেল শীদেয়ী নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য যাত্রীদের তিনি চিনতেন না। প্লেনটি যে সাইগঙ ত্যাগ করার সময় ভারী বোধ হয়েছিল এ কথা অনেকেই বলেছেন। সুরেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলেই আমাদের সিদ্ধান্ত।)

2. **তুরেনে** 17.8.45 **তারিখে রাত্রিবাস:**

(ক) **শাহ্‌নওয়াজ কমিটি** বলেছেন: "যদিও কমিটি যেসব সাক্ষীর জবানবন্দী নিয়েছেন তাঁরা কেউ বলতে পারেননি কোন হোটেলে নেতাজী রাত্রিবাস করেছিলেন, তবু অনুমান করা যায়, সেটি 'মেরিন হোটেল'। কমিটির সভ্যগণ দূরপ্রাচ্য যাবার পথে এই হোটেলে সরেজমিন তদন্ত করেছিলেন।' (1/16) (সে অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বন্ধে শাহ্‌নওয়াজ কমিটির রিপোর্ট আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।)

(খ) **শ্রীহায়াশিদা** তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "মিস্টার বোস এবং অন্যান্য সকলেই হোটেল-মেরিনে সেই রাত্রে বাস করেছেন।" (10/108)

(গ) বিমানযাত্রীরা কে কী বলেছেন তা এবার শুনুন:

(i) **কর্নেল রহমান:** "তুরেনে পৌঁছানোর পর নেতাজীর মালপত্র একটি গাড়িতে তোলা হল। নেতাজী কয়েকজন জাপানী অফিসারকে নিয়ে একটি হোটেলে এলেন। আমিও এলাম। ঐ হোটেলেই আমরা রাত্রিযাপন করি এবং পরদিন ভোরে বিমানবন্দরে

পৌঁছে দেখি অন্যান্য সকলেই সেখানে উপস্থিত আছেন।''

(ii) **ক্যাপ্টেন আরাই**: ''বিমানের সকল যাত্রীই তুরেনের সবচেয়ে বড় হোটেলে ওঠেন। রাত্রে সকলের একসঙ্গে সায়মাশ হল। ডিনার টেবিলে নেতাজী এবং জেনারেল শীদেয়ী এশিয়া ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে আমরা বিমানবন্দরে চলে আসি।''

(iii) **মেজর তাকাহাসি** বলেন, যদিও তাঁরা সকলেই একই হোটেলে উঠেছিলেন তবু নৈশ আহারের টেবিলে তিনি আর কাউকে দেখতে পাননি। তিনি একাই খেয়ে নেন। পরদিন সকালে তিনি বিমানবন্দরে চলে আসেন।

(iv) **কর্নেল নোনাগাকি** বলেন, বিমান যাত্রীরা সকলেই এক হোটেলে উঠেছিলেন এবং একত্রে নৈশাহার সারেন। ডিনার টেবিলে নেতাজী ও জেনারেল শীদেয়ী জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। পরদিন সকালে তিনি বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখেন যে, বিমানটি ভারী বোধ হওয়ায় কতকগুলি মেশিনগান খুলে ফেলা হচ্ছে। এ কাজ শেষ হলে সূর্যোদয়ের সময় তাঁরা যাত্রা করেন।

(v) **মেজর কোনো** বলেন যে, তুরেনে পৌঁছে অন্যান্য সকলে গাড়ি করে একটি হোটেলে চলে যান, কিন্তু তিনি এবং মেজর তাকিজাওয়া তখনই বিমানটির অঙ্গ থেকে বারোটি মেসিনগান ও কিছু গোলা বারুদ নামিয়ে নেন। ফলে ছয়শত কে. জি ওজন কমিয়ে ফেলা হয়। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় এ কাজ শেষ হয়। তাঁরা দু'জন পৃথকভাবে নৈশাহার সেরে নেন।

(vi) **কর্নেল সাকাই** তাঁরা লিখিত জবানবন্দীতে বলেন যে, বিমানটি সন্ধ্যে পাঁচটা বা ছয়টার সময় তুরেনে পৌঁছায়। তাঁরা কোনও হোটেলে ওঠেননি। ওখানকার 'সাপ্লাই বেস বিলেটে' রাত্রে ছিলেন। নেতাজী কোন হোটেলে উঠেছিলেন কি না তা তিনি বলতে পারেন না।

(ঘ) **শ্রীসুরেশচন্দ্র** লিখেছেন, ''শ্রীকুট্টি, আমাদের সাইগঙস্থিত কনসাল জেনারেলকে নিয়ে দূরপ্রাচ্য যাবার পথে আমরা (কমিটির সভ্যরা) 2.5.56 তারিখে তুরেনের সবচেয়ে বড় হোটেলে (নাম বলেননি, সম্ভবত হোটেল-মেরিন) উঠেছিলাম। ছোট্ট তুরেন শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমরা একজনও প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাইনি যে বলতে পারে 17.8.45 তারিখে রাত্রে নেতাজী তুরেনের সবচেয়ে বড় হোটেলে জীবনের শেষ রাত্রিটি কাটিয়ে যান। একমাত্র শ্রী মীর গোলাম দাস্তগীর নামে একজন সাক্ষীকে (সাক্ষী নং 31) আমাদের সামনে হাজির করা হল। সে বললে যে, সে চোদ্দ বছর ধরে তুরেনে আছে। 1945 সালে তুরেনস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত মিঃ সুজিকো তাকে এক রাত্রে বলেছিলেন, একটি হোটেলে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে রাত্রে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের জন্য তার পক্ষে ঐ হোটেলে গিয়ে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয়নি।'' (2/83)

(মন্তব্য: তুরেনের মত ছোট্ট শহরে সবচেয়ে বড় হোটেলে নেতাজীর রাত্রিবাসের কোনও প্রমাণ না পাওয়া বিস্ময়কর। অবশ্য হয়তো নেতাজী স্বতই আত্মপ্রচার এড়িয়ে গেছেন — যেহেতু তিনি নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথিক। কিন্তু কর্নেল সাকাই-এর জবানবন্দী বিভ্রান্তিকর, এছাড়া মেজর কোনো যদি রাত্রি সাড়ে আটটায় মেশিগানগুলি নামিয়ে থাকেন তাহলে কর্নেল নোনাগাকি পরদিন সকালে কেমন করে সে কাজ হতে দেখলেন? সে রাত্রে যে তুরেনে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হচ্ছিল এ-কথা কোন সাক্ষীই বলেননি, ফলে মীর দাস্তগীরের সাক্ষ্যের অর্থ হয় না। ফলে নেতাজী আদৌ তুরেনে রাত্রিবাস করেছিলেন কিনা সন্দেহ জাগে।)

3. **তুরেন ত্যাগ** 18.8.45 **সকাল:**

(ক) **শাহ্‌নওয়াজ কমিটি** বলেছেন, "পরদিন (আঠারোই) ভোর পাঁচটায় ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ওঁরা যাত্রা শুরু করেন। প্লেনটির যাত্রাপথ ছিল — সাইগঙ, তুরেন, হেইতো (ফরমোসা দ্বীপ), তাইহোকু (ফরমোসা দ্বীপ), দাইরেন (মাঞ্চুরিয়া), টোকিও।.....প্লেনে এবার ওজন অনেক কম ছিল এবং যাত্রারম্ভ খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়। (The plane was much lighter and the take-off was very normal.)" (1/16)

(খ) **শ্রীহায়াশিদা** বলেছেন, "সাইগঙে প্লেনের ওজন বেশী মনে হয়েছিল বলে তুরেনে বারোটি মেশিনগান নামিয়ে রাখা হয়। ফলে প্লেন হালকা হয়ে যায়। ছয়শত কিলোগ্রাম ওজন কমে যায়।" (10/10)

(মন্তব্য: সাইগঙে বেশী ওজন থাকার জন্য যে বিপদের আশঙ্কা ছিল তা অপসারিত হয়েছে। একাধিক সাক্ষী বলেছেন বারোটি মেশিনগান নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, যাতে বাকি যাত্রাপথে কোন বিপদাশঙ্কা না থাকে।)

4. **তাইহকুতে উপনীত — আঠারই সকাল এগারোটা থেকে বেলা দুটো:**

(ক) **শাহ্‌নওয়াজ কমিটির রিপোর্ট:** "যেহেতু আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল তাই ওঁরা হাইতোতে না থেমে সোজা তাইহকুতে চলে আসেন। তাইহকু হচ্ছে বর্তমান তাইপের জাপানী নাম।..... বিকালের দিকে স্বাভাবিকভাবে এবং নিরাপদে তাইহকু বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে। কেউ বলেন বেলা এগারোটা নাগাদ, কেউ বলেন বেলা বারোটায়। প্লেন থেকে নেমে সকলে একটি তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা কিছু স্যান্ডউইচ ও পাকা কলা খেয়ে নেন। ঐ তাঁবুটি বিশেষ কারণে খাটানো হয়েছিল। জাপানের রাজকুমারের আগমনের প্রত্যাশায়। জাপানী রাজকুমার সম্রাটের একটি আদেশ নিয়ে সেদিনই আসছেন বলে শোনা গিয়েছিল। তিনি বিভিন্ন বাহিনীকে সম্রাটের আদেশ স্বহস্তে সমর্পণ করতে আসছিলেন—আত্মসমর্পণের আদেশ।.....বিভিন্ন সাক্ষী তাইহকুতে অবস্থানের সময় বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেন আধঘণ্টা, কারও মতে দু'ঘণ্টা।

যাই হোক, এই অবসরে বিমান পরীক্ষকের দল বিমানটিকে পরীক্ষা করে নেন। পরীক্ষাকার্য করেন প্রধান পাইলট মেজর তাকিজাওয়া — তাঁকে সাহায্য করেন মেজর কোনো এবং ক্যাপ্টেন নাকামুরা, ওরফে ইয়ামামোতো। যেহেতু পরবর্তী বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গে বিমানটির যান্ত্রিক অবস্থা গুরুতরভাবে জড়িত, তাই সাক্ষীদের এ বিষয়ে জবানবন্দীটুকু হুবহু তুলে দেওয়া গেল:

"মেজর কোনো তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, 'মি. তাকিজাওয়া ভিতর থেকে এঞ্জিনটি পরীক্ষা করেন, আমি বাইরে থেকে। আমি লক্ষ্য করলাম, বামদিকের এঞ্জিনটি ঠিকমত কাজ করছে না। আমি তখন ভিতরে গেলাম এবং বামদিকের এঞ্জিনটি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, সেটি নিখুঁতই আছে। .....সচরাচর প্লেনের সঙ্গে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকেন, এক্ষেত্রেও ছিলেন। আমি তাঁর নামটা ভুলে গেছি। তিনিও আমার সঙ্গে বিমানটি পরীক্ষা করলেন, এবং বললেন, উড়বার পক্ষে সেটি উপযুক্ত (certified its air-worthiness)।

"ক্যাপ্টেন নাকামুরা, ওরফে ইয়ামামোতো ছিলেন তাইহকু বিমানবন্দরে ভারপ্রাপ্ত গ্রাউন্ড এঞ্জিনিয়ার। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, 'বেলা একটা কুড়ি মিনিটের সময় মেজর তাকিজাওয়া ও কো-পাইলট আইয়োগী প্লেনের ভিতর যান এবং সেটি পরীক্ষা করেন। আমি তখন বিমানটির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁরা যখন এঞ্জিনটি চালু করলেন আমার মনে হল একটি এঞ্জিন ঠিকমত কাজ করছে না। আমি হাত তুলে পাইলটকে ইঙ্গিত করে জানালাম সে কথা। মেজর তাকিজাওয়া তখন বাইরে বার হয়ে এসে আমার কথা শুনলেন। আমি বললাম যে, বাঁ দিকের এঞ্জিনটি ঠিকমত কাজ করছে না। তাতে তিনি বললেন যে, বাঁ দিকের এঞ্জিনটি আনকোরা নতুন — সাইগঙে সেটি যুক্ত করা হয়েছে। যাই হোক, তবু তিনি পর পর দু'বার সেটিকে চালু করে পরীক্ষা করলেন। তখন আমি বললাম, এবার ঠিক আছে। মেজর তাকিজাওয়া আমার সঙ্গে একমত হলেন।" (1, 9)

(খ) **শ্রীহায়াশিদাও** তাঁর গ্রন্থে বলেছেন:

(i) জাপানী রাজকুমার কানিন-এর সেদিন তাইপে আসার কথা ছিল। তাঁর জন্যে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল, সে তাঁবুতে নেতাজী আশ্রয় নেন।

(ii) এঞ্জিনগুলি ও যন্ত্রপাতি মেজর কোনো, ক্যাপ্টেন নাকামুরা এবং মেজর তাকিজাওয়া বারে বারে পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাঁরা সকলেই একমত হন যে, কোন গলদ নেই।

(iii) সাধারণ সময়ে হলে একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নেতাজীকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে ফরমোসা বাহিনীর কমান্ডার অথবা চীফ অফ স্টাফ উপস্থিত থাকতেন; কিন্তু জাপানের আত্মসমর্পণ-জনিত গণ্ডগোলে সে প্রোটোকল মানা সম্ভবপর হয়নি।

(কোন সূত্র থেকে কেউই আজ পর্যন্ত বলেননি, জাপানী রাজকুমার কানিন তাইপেতে

আদৌ ঐদিন বা পরদিন এসেছিলেন কি না। এলে তিনি নেতাজীর মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হতেন। না এলে, কেন আসেননি প্রশ্ন জাগে।)

5. তাইহকু ত্যাগ ও বিমান দুর্ঘটনা—আঠারই, বেলা দুটো আটত্রিশ

বিমান দুর্ঘটনার বর্ণনা বিভিন্ন সাক্ষী কী-ভাবে দিয়েছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল। স্থান সংক্ষেপের জন্য সাক্ষীদের এক একটি অভিধা দ্বারা সূচিত করলাম:

সাক্ষী নং	সাক্ষীর নাম	সাক্ষ্যের তারিখ	কোথায় সাক্ষ্য দেন	1956তে কী ছিলেন	সূচক-অভিধা
4	কর্নেল হবিবর রহমান	6-9.4.56	দিল্লী	আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের কর্নেল	হবিব
34	ক্যাপ্টেন কেইকিচি আরাই	9-10.5.56	টোকিও	বিমান বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার	আরাই
37	লে. কর্নেল শীরা নোনোগাকি	14.5.56	ঐ	স্টাফ অফিসার	নোনো
41	যে. তারো কোনা	16.5.56	ঐ	ঐ	কোনো
43	মে. ইওয়াও তাকাহাসি	17.5.56	ঐ	ঐ	তাকা
55	ক্যা. নাকামুরা (ওরফে ইয়ামামোতো)	30.5.56	ঐ	গ্রাউন্ড এঞ্জিনিয়ার	নাকা
68	লে. কর্নেল সাকাই	লিখিত জবানবন্দী		স্টাফ অফিসার	সাকাই

A. বিমানযাত্রীরা কী-ভাবে বসেছিলেন ?

সকলেই বলেছেন যে, বিমানটি যাত্রীবাহী ছিল না — ফলে এ বোমারু বিমানটিতে বসার আসন ছিল না। সবাই মাটিতে বসেছিলেন। এ ছাড়া সকলেই একমত যে, তুরেন থেকে যাত্রা করার সময় যে যেখানে বসেছিলেন তাইহকু থেকে যাত্রা করার সময়ও সকলেই সেই সেই স্থানে বসেন। অর্থাৎ আঠারই তারিখ সকাল থেকে পরস্পরের আপেক্ষিক অবস্থান একই প্রকার ছিল। একথাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তাইহকু থেকে যাত্রা করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে — ফলে কে কোথায় বসেছিলেন যাত্রীদের মনে রাখা সম্ভবপর হত না যদি না তাঁরা ঐ আঠারই তারিখ সকালের যাত্রায় ঐ একইভাবে বসতেন। মাত্র কয়েক মিনিট কে কোথায় বসেছিলেন তা দীর্ঘ দশ-এগারো বছর পরে স্মরণ করা প্রায় অসম্ভব।

অনুসন্ধান কমিটি দেখছি সাক্ষীদের এ বিষয়ে ভাল করে জেরা করেন। যদিও সরকারী কমিটিতে সেই জেরার ফলশ্রুতি বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়নি, কিন্তু

শ্রীসুরেশচন্দ্রের মতান্তরের রিপোর্টে তা আমরা পাচ্ছি। এই মতান্তরের রিপোর্টে পাঁচখানি স্কেচও দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই কয়টি স্কেচ এখানে সন্নিবেশিত করলাম। স্কেচগুলিতে নিম্নলিখিত সাক্ষীদের বক্তব্য যথাক্রমে পাচ্ছি — কর্নেল হবিবর রহমান, কর্নেল নোনোগাকি, মেজর কোনো, ক্যাপ্টেন আরাই এবং জাপান সরকারের রিপোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত চিত্র। মেজর তাকাহাসি এবং লে. কর্নেল সাকাই সম্ভবত কোন স্কেচ দেননি। মোট কথা, তা রিপোর্টে উল্লিখিত হয়নি।

SKETCH OF JAPANESE BOMBER
IN WHICH NETAJI TRAVELLED
FROM SAIGON TO TAIHOKU (Formosa)

স্কেচ 1 কর্নেল হবিবর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত

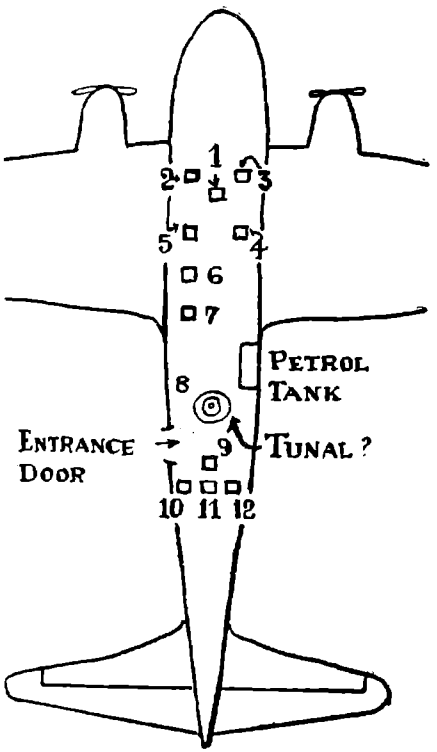

1, 2, 3. Crew
4. Lt. Gen. Shidei
5. Pilot
6. Netaji
7. Col. Habib-Ur-Rahman
8. One Air Force Officer
9, 10, 11, 12. Japanese Army Air-Force Officers.

শ্রীসুরেশচন্দ্র বলেছেন, এই স্কেচগুলিতে যাত্রীদের আপেক্ষিক অবস্থান এতই বিভিন্ন

রকমের যে, তাতে সন্দেহের উদ্রেক করে।

আমরা এখানে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এই তথ্য প্রাপ্তিকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া চলে না। কারণ এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত (i) বিমানে অনড় চেয়ার ছিল না, সকলে মাটিতে বসেছিলেন—ফলে বিমান কাত হলে তাঁদের অবস্থান অল্প সরে যাওয়া স্বাভাবিক। তুরেন থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা যেভাবে

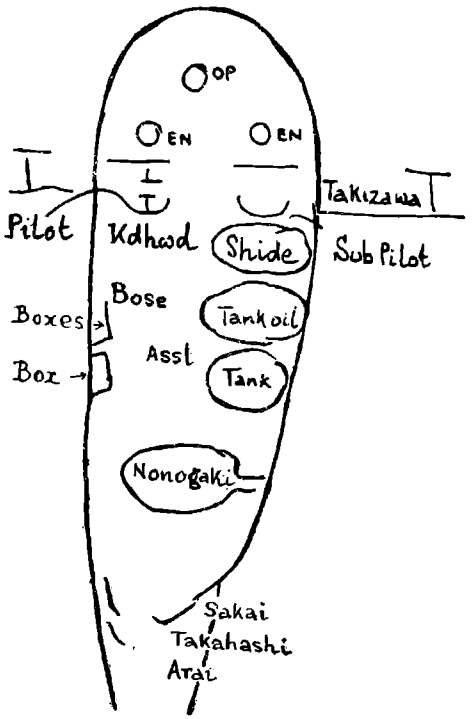

স্কেচ 2

কর্নেল নোনোগাকি কর্তৃক প্রদত্ত

বসেছিলেন তাইহকু থেকে যাত্রা করার সময় মোটামুটি সেইভাবেই বসেছিলেন—এটুকু বলা যায়। বিমানে অনড়-আসন বা fixed seat না থাকায় জ্যামিতিক হিসাবে পরস্পরের দূরত্ব ও আপেক্ষিক অবস্থান একরকম থাকা সম্ভবপর নয়। (ii) বিমানটি তাইহকু থেকে যাত্রা করার কয়েক মিনিটের মধ্যে তথাকথিত দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে কেউ যদি বলেও থাকেন (এ কথার কেউ প্রতিবাদ করেননি) যে, তুরেন থেকে যাত্রা করার সময় যে ব্যবস্থা ছিল এবারও বসার সেই ব্যবস্থা হয়, তা'হলে সে জবানবন্দীকে খুব বেশি গুরুত্ব

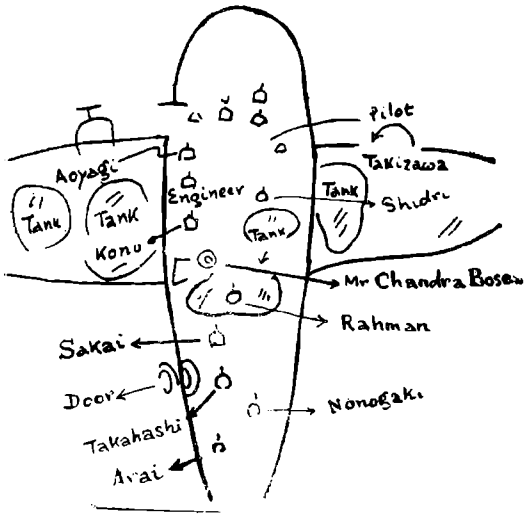

স্কেচ 3

মেজর কোনো কর্তৃক প্রদত্ত

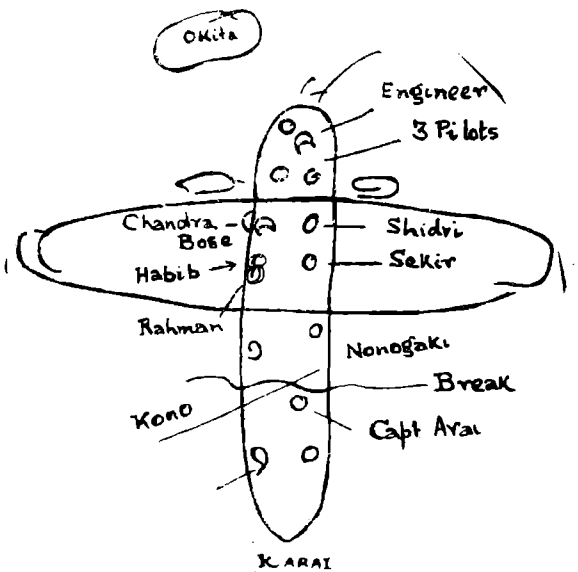

স্কেচ 4

ক্যাপ্টেন আরাই কর্তৃক প্রদত্ত

দেওয়া চলে না। কারণ এবার কে কোথায় বসেছিলেন তার স্মৃতি মাত্র কয়েক মিনিট তাঁদের স্মৃতিপটে ছাপ ফেলেছিল, যা দীর্ঘ দশ-এগারো বছর মনে রাখা সম্ভবপর নয়। (iii) বিমান দুর্ঘটনা যে হতে পারে এবং ভবিষ্যতে জবানবন্দী যে দিতে হতে পারে এ কথা কারও জানা ছিল না — ফলে লক্ষ্য করে কেউই দেখেননি, অন্যান্য সকলে কে কোথায় বসেছেন। (iv) কিন্তু মনস্তত্ত্ব বলে এক্ষেত্রে মানুষ নিজের অবস্থানটাই সবচেয়ে ভাল মনে রাখতে পারে — অর্থাৎ

'আমার সামনে অমুক ছিলেন, পিছনে তমুক' ইত্যাদি কথাগুলিই নির্ভরযোগ্য। 'অমুক'

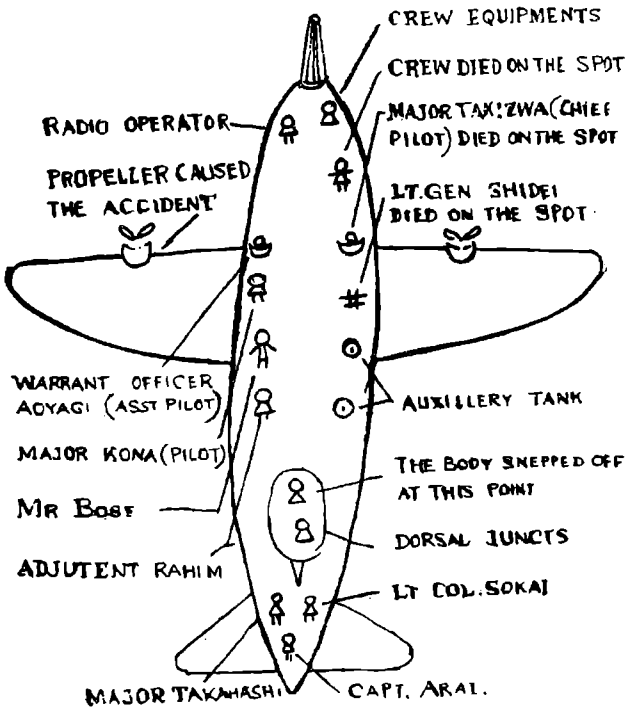

স্কেচ 5

জাপান সরকার কর্তৃক প্রেরিত

'তমুকের' পিছনে ছিলেন কিম্বা সামনে ছিলেন তা আর মনে পড়ে না। তাই স্বাভাবিক— কারণ স্মৃতিপটে যে ছাপটা থাকবে তা সাবজেক্টিভ; আমি কার সঙ্গে কথা বলতে পিছন দিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছিলাম এটুকুই মনে থাকতে পারে।

ফলে স্কেচগুলিতে সাক্ষীর নিজের অবস্থানের আপেক্ষিক কতটুকু মূল্য রাখতে

পেরেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কতটা সামঞ্জস্য-বৈপরীত্য লক্ষ্যিত হচ্ছে তাই আমাদের বিচার করতে হবে।

স্কেচগুলিতে যাবতীয় লেখা ইংরেজি হরফে। আমরা যদৃষ্টং স্কেচগুলি পুনঃপ্রকাশ

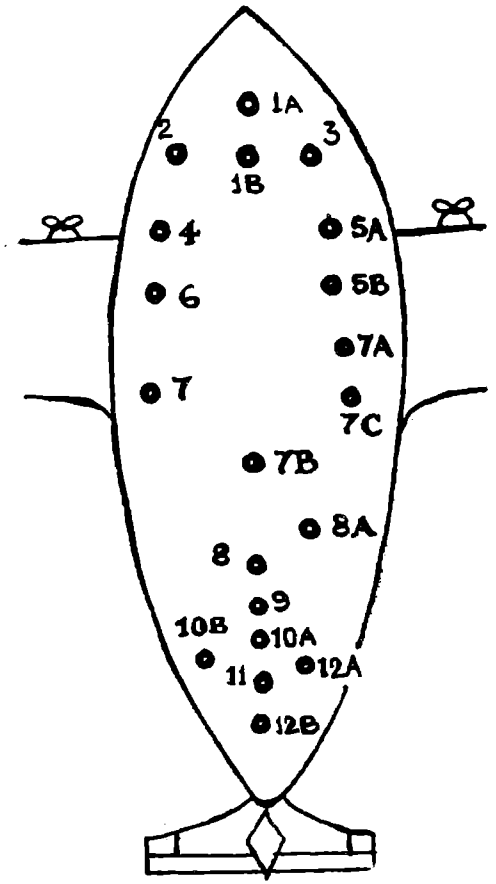

স্কেচ 6

বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে

করেছি। বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমরা ঐ পাঁচটি চিত্রের একটি চুম্বকসার—স্কেচ 6-দিলাম এবং বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য একটি তালিকাকারে প্রকাশ করলাম:

অবস্থান	চিত্র 1 কর্নেল হবিবর	চিত্র 2 কর্নেল নোনাগাকি	চিত্র 3 মেজর কোনো	চিত্র 4 ক্যাপ্টেন আরাই	চিত্র 5 জাপান সরকার
1A	x	অপারেটর	ক্রু	এঞ্জিনিয়ার	ক্রু
1B	ক্রু	x	x	x	x
2	ঐ	এঞ্জিনিয়ার	রেডিও অপাঃ	পাইলট	রেডিও অপাঃ
3	ঐ	ঐ	ক্রু	ঐ	ক্রু
4	পাইলট	পাইলট	আওয়াগী	**নেতাজী**	আওয়াগী
5A	শীদেয়ী	কো-পাইলট	তাকিজাওয়া	শীদেয়ী	তাকিজাওয়া
5B	x	শীদেয়ী	x	সাকাই	x
6	**নেতাজী**	**নেতাজী**	এঞ্জিনিয়ার	হবিব	কোনো
7	হবিব	হবিব	কোনো	x	**নেতাজী**
7A	x	x	x	x	x
7B	x	x	**নেতাজী**	x	হবিব
7C	x	x	শীদেয়ী	x	x
8	জাপানী অঃ	নোনো	হবিব	x	x
8A	x	x	x	নোনো	x
9	জাঃ অঃ	সাকাই	সাকাই	আরাই	x
10A	x	x	তাকাহাসি	x	x
10B	জাঃ অঃ	x	x	x	তাকহাসি
11	ঐ	তাকাহাসি	x	x	x
12A	ঐ	x	নোনোগাকি	x	সাকাই
12B	x	আরাই	আরাই	x	আরাই

হবিবের সাক্ষ্যে: **নেতাজী** এবং শীদেয়ী দু'জনেই তাঁর সামনে এবং জাপানী অফিসারের দল সকলেই তাঁর পিছনে। লে. জে. শীদেয়ীর অবস্থান নেতাজীর সামনে এবং তাঁর দক্ষিণে।

ক. নোনোগাকির সাক্ষ্যে: **নেতাজী** এবং শীদেয়ী দু'জনেই তাঁর সামনে এবং শীদেয়ী বসেছেন নেতাজীর সামনে এবং তাঁর দক্ষিণে। হবিবও তাঁর সামনে। সুতরাং নোনোগাকির জবানবন্দীর সঙ্গে হবিবের বক্তব্যে বেশ মিল আছে।

মেজর কোনোর সাক্ষ্যে: **নেতাজী**, হবিব এবং শীদেয়ী তিন জনেই সাক্ষীর পিছনে বসেছেন। দ্বিতীয়তঃ নোনোগাকিকে অনেক পিছনে এনে ফেলেছেন। নোনোর নিজস্ব

ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি সাকাই ও তাকাহাসির সামনে বসেছিলেন, মেজর কোনো তা বলেননি।

ক্যাঃ আরাই-এর সাক্ষ্যে: শীদেয়ী **নেতাজীর** সামনে নন, ঠিক দক্ষিণে। তা'ছাড়া সাকাই হবিবের পিছনে নন, পাশে।

জাপান সরকারের বক্তব্য: কোনোর বিবৃতির সঙ্গে সুন্দর মিলছে, যদিও কর্নেল হবিব অথবা নোনোগাকির সাক্ষ্যের সঙ্গে মেলে না।

মন্তব্য: যদিও অসঙ্গতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এগারো বছর পর কয়েক মিনিটের অবস্থানের সঠিক বর্ণনা দেওয়ায় ভুল হতেই পারে। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমরা একমত নই। অর্থাৎ সুরেশচন্দ্র এ অসঙ্গতিতে যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে অতটা গুরুত্ব আরোপ করা চলে না।

B. বিমানটি কত উঁচুতে উঠেছিল?

হবিব.....প্রথমে বলেন কয়েক শত ফুট, পরে বলেন হাজার ফুটের বেশী (2/93)
আরাই....অন্তত 1600 ফুট (2/103)
নোনো.... 60 ফুট (2/104)
কোনো... 100 ফুট (2/94)
তাকা.....সবে আকাশে উঠেছে (2/103)
নাকা..... 90 ফুট থেকে 120 ফুট (1/19)
সাকাই...150 ফুট (2/106)

(মন্তব্য: বিমানের ভিতরে বসে বিমানটি কত উঁচুতে উঠেছিল বলা খুব কঠিন এ-কথা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত দুর্ঘটনার এগারো বছর পর এ সম্বন্ধে স্মৃতির উপর নির্ভর করে নির্ভুলভাবে বলতে পারা প্রায় অসম্ভব। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় 7.9.46 তারিখে কর্নেল হবিবর রহমান শ্রীআইয়ারকে বলেছিলেন, বিমানটি মাত্র শ-দুই-তিন ফুট ওপরে উঠেই ভেঙে পড়ে। (5. 2. 1952 তারিখের লোকসভায় প্রদত্ত শ্রীআইয়ারের রিপোর্ট)

C. রানওয়ে থেকে কতদূরে বিমানটি ভেঙে পড়ে?

হবিব..... দেড় থেকে দুই মাইল দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে। (2/97)
নোনো..... রানওয়ের ঠিক প্রান্তে প্রায় 60 ফুট দূরে (1/19)
নাকা..... 300 ফুট দূরে, (1/19) —রানওয়ে পার হয়ে কিছু দূরে।
সাকাই..... 60 ফুট দূরে, প্রায় রানওয়ের উপরেই। (1/19) ।

(মন্তব্য: অন্যান্য সাক্ষীদের এ প্রশ্ন হয় জিজ্ঞাসা করা হয়নি, অথবা সে কথা রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। 'রানওয়ের প্রান্তে' এবং দেড় থেকে দু'মাইল দূরে মাঠের মাঝখানে' শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট।)

D. বিস্ফোরণের কোন শব্দ শোনা গিয়েছিল কি না?

হবিব.....হ্যাঁ, একবারমাত্র — কামানের গোলার মত প্রচণ্ড শব্দ।

আরাই....পর পর দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ।

নোনো....তিন-চারটে বিস্ফোরণের শব্দ—প্রথমটি খুব জোরে! (2/104)

তাকা.....একটি বিস্ফোরণ (2/104)

সাকাই.... বিস্ফোরণ শুনেছেন বলে কোন কথা উল্লেখ করেননি। (2/106)

(**মন্তব্য**: এ অসঙ্গতি খুবই স্বাভাবিক। চরমতম বিপদের সম্মুখে শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক থাকে না।)

E. বিমানটি পতনের পর কি দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল?

হবিব....না। (1/19)

আরাই..হ্যাঁ। (ঐ) (স্কেচ নং 4 দ্রষ্টব্য)

নোনো..হ্যাঁ। (ঐ)

কোনো..হ্যাঁ। (ঐ)

তাকা..... দৃঢ়তার সঙ্গে না। (1/19)

সাকাই....হ্যাঁ। (ঐ)

(**মন্তব্য**: মতানৈক্য বিভ্রান্তিকর। বিমানটির দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল কিনা তা যাত্রীরা লক্ষ্য করেন বিপদ্‌মুক্ত হবার পরে।)

F. দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে নেতাজীর দৈহিক অবস্থা এবং পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য:

হবিব .....''দুর্ঘটনার পরে আমি দেখলাম মালপত্রে পিছনের পথ বন্ধ, সামনে আগুন জ্বলছে। নেতাজী আমার সামনে বসেছিলেন, তিনি আমার দিকে ফিরতেই আমি বললাম, 'আগে-সে নিকালিয়ে, পিছে-সে রাস্তা নেহি হ্যায়'।.....সুতরাং আগুনের মধ্য দিয়ে তিনি সামনের দিকে দিয়ে বার হলে এলেন। আমিও ঐ আগুনের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এলাম। আমি বাইরে এসেই দেখলাম আমার থেকে দশ গজ দূরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জামাকাপড়ে আগুন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর বুশকোটের বেল্টটা অনেক কষ্টে খুলে দিলাম। তাঁর প্যান্টে আগুন লাগেনি, ফলে প্যান্ট খুলবার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর গায়ে ছিল খাকি প্যান্ট ও খাকি বুশ কোট। গরম জামা ছিল না। আমি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। তাঁর কপালে, বাম দিকে একটি গভীর ক্ষত ছিল — প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা। আমি তাঁর ক্ষতের ওপর রুমাল চেপে ধরলাম, রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে। তাঁর মুখ ও চুল আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। (1/21)

আরাই .....দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে নেতাজীকে দেখেননি বা লক্ষ্য করেননি।

নোনা .....''দেখলাম নেতাজী জ্বলন্ত প্লেনের অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দেহরক্ষী

তাঁর কোট খুলে ফেলল; কিন্তু গরম সোয়েটারটি কিছুতেই খুলতে পারছিল না। তাঁর সর্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।" (1/22)

কোনো ....."আমার নিজের গায়ে পেট্রোল ছিটিয়ে পড়ায় আমার পোশাকে আগুন লাগে। আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নিবিয়ে ফেলি। .....কয়েক মিনিট পরে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি প্লেন থেকে কিছু দূরে নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ।" (2/122)

তাকা ....."আমি নেতাজীর দিকে এগিয়ে যাই এবং তাঁকে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়াই। এতে তাঁর পোশাকের আগুন নিবে যায়। কর্নেল রহমানও আমাদের কাছে ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন, তাই নেতাজীকে সাহায্য করতে পারেননি। নেতাজীর জামাকাপড় কোন কোন স্থানে পুড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর প্যান্ট প্রায় অক্ষত ছিল। নেতাজীর প্যান্ট খোলার কোন প্রশ্নই ছিল না।"

নাকা....."নেতাজীর পোশাকে আগুন লেগেছিল ঠিকই তবে আমি নিজেই সে আগুন নিবিয়ে ফেলি। নেতাজীর জামা ও প্যান্ট খুলে ফেলতে হয়। আমিই সকলকে জ্বলন্ত প্লেন থেকে একে একে উদ্ধার করে আনি।"

সাকাই .....স্মরণ নেই।

(শাহ্‌নওয়াজ বলেছেন, "যদিও বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীতে সামান্য ইতরবিশেষ হচ্ছে, তবে মোটামুটি বলা যায় যে দুর্ঘটনার বর্ণনা সকলে একইভাবে দেন। মতানৈক্য যেটুকু হয়েছে, তা দীর্ঘদিন পরে ঠিক স্মরণ করতে না পারার জন্য।"

সুরেশচন্দ্র বলেছেন, "বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীতে এত মৌলিক প্রভেদ যে আমার মনে হয়েছে সবটাই সাজানো গল্প। আসলে এ দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি।")

(**মন্তব্য**: 'নগ্নসত্য শব্দটার ব্যবহার ভাষায় দেখেছি — কিন্তু 'উলঙ্গ-মিথ্যা' শব্দটা কেন বাঙলা ভাষায় নেই — সুরেশচন্দ্র এ-প্রশ্ন অবশ্য তোলেননি।)

G. বিমান দুর্ঘটনায় কে কে মারা গেলেন?

বিমানে নিম্নলিখিত তেরজন যাত্রী ছিলেন (10/109) । তার ভিতর 56 সালে যাঁদের জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁদের নামের কাছে তারকা চিহ্ন (*) দেওয়া হয়েছে। বাকি ছয়জন নিখোঁজ বা মৃত। এর ভিতর শ্রীশাহ্‌নওয়াজের বিশ্বাস, ন্যাভিগেটর সার্জেন্ট ওকিস্তা মারা যাননি। বলেছেন, "Attempts were made to trace Sergeant Okishta, but he was not found" (1/26) অর্থাৎ "সার্জেন্ট ওকিস্তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যায়নি।" (আমি জাপান সফর কালে যেটুকু সংবাদ পেয়েছি তা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি: সার্জেন্ট ওকিতা (ওকিস্তা নয়, Okita)-র নাকি মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে। বলা হয়েছে, তিনি তাইহকু হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত 1947 সালের শীতকালে তিনি জাপানে ফিরে

আসেন এবং তারপর Nara Prefecture-এ দীর্ঘদিন ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি আজও (1970) জীবিত। এ সংবাদ জানিয়েছেন সার্জেন্ট ওকিতার বিশিষ্ট বন্ধু মি. হিদেও মাসুই (Mr.Hideo Masui)। তাঁর ঠিকানা 31, Yaguramon, Fakuoka City. বর্তমানে তিনি টোকিও এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ফুকুওকা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। স্পটতই বোঝা যায়, সার্জেন্ট ওকিতা স্বেচ্ছায় অনুসন্ধান কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে আসেননি। কারণ 1950 সালে অনুসন্ধানকমিটি যখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী দিতে আহ্বান জানান, তখন সার্জেন্ট ওকিতা জাপানেই ছিলেন।

বিমানের তেরজন যাত্রী

1. পাইলট ... ... ডাবলু/ও আইয়োগী (তিন নং বিমান বাহিনী)
(শাহ্‌নওয়াজের মতে ইনি কো-পাইলট)
2. সহকারী ঐ ..... মেজর তাকিজাওয়া জাপানে বদলির আদেশ পেয়ে যাচ্ছিলেন (শাহ্‌নওয়াজের মতে ইনি পাইলট)

* 3. ন্যাভিগেটর .... সার্জেন্ট ওকিতা (শাহ্‌নওয়াজ কমিটির মতে ওকিস্তা)

4. রেডিও অপারেটর ..... এন. সি. ও তোমিনাগা
5. গান-অপারেটর..... নাম জানা যায়নি
6. লে জে. শীদেয়ী ..... বর্মা বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ
(মাঞ্চুরিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)

* 7. লে. ক. সাকাই স্টাফ অফিসার
* 8. লে. ক. শীরো নোনোগাকি..... স্টাফ, বিমান বাহিনী
* 9. মেজর তারো কোনো ..... ঐ ঐ
*10. মেজর আইওয়াও তাকাহাসি..... ঐ অফিসার
*11. ক্যা কৈকিচি আরাই..... বিমান বাহিনীর এঞ্জিনিয়ার
*12. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্রপ্রধান
*13. কর্নেল হবিবর রহমান ..... ঐ অ্যাডজুটান্ট

(কিছু মনে করবেন না, আমি এখানে একটি বেয়াড়া প্রশ্ন পেশ করব। তর্কের খাতিরে মনে করুন, নেতাজীর ঐ বিমান দুর্ঘটনায় পড়েনি। তিনি অপর একটি বিমানে মাঞ্চুরিয়ার দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলে গেলেন। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসাবে তাঁর অ্যাডজুটান্টকে পিছনে রেখে। তা'হলে নেতাজীর পক্ষে অপরিহার্য সঙ্গী কে কে হতেন? প্লেনটি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন পাইলট, একজন কো-পাইলট, একজন রেডিও-অপারেটর এবং শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে একজন গান-অপারেটর। এ-ছাড়া অকুস্থলে পৌঁছে কাজ হাসিল করবার জন্য মাঞ্চুরিয়ার কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অফিসার! ঠিক এই কয়জনই মারা

গেলেন; এঁদের একজনের মৃতদেহেরও ফটো নেই! কী অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা। নয়?)

H. বিমান দুর্ঘটনার কারণ কী?

(i) শাহ্‌নওয়াজ কমিটি বিমান দুর্ঘটনার হেতুটি বিশ্লেষণ করেননি। তাঁদের মতে 'দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।' দুর্ঘটনা যে হয়েছিল এটাই তাঁরা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। কেন হয়েছে তা খোঁজ করে দেখেননি। অবশ্য হেতু সম্বন্ধে যেটুকু কমিটি বলেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ:

"দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তদানীন্তন জাপানী কর্তৃপক্ষ কোন অনুসন্ধানই করেননি। ফরমোসা-বাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইসাইয়ামাকে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি প্রথমটায় বলেন, যেহেতু বিমানটি ফরমোসা বাহিনীর নয়, তাই ফরমোসা সদর দপ্তরের এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব ছিল না। পরে তিনি স্বীকার করেন, যে এলাকায় বিমান-দুর্ঘটনা ঘটে সেই এলাকার সেনাপতিরই প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং জাপানের ঊর্ধ্বতন মহলে রিপোর্ট করা। শেষে তিনি বলেন এ ক্ষেত্রে একটি রিপোর্ট টোকিওস্থ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে তিনি প্রেরণ করেছিলেন। এই রিপোর্টটি তাঁর স্টাফ অফিসার লে. কর্নেল শিবুয়া প্রণয়ন করেন এবং তাঁরই মাধ্যমে সেটি উপর মহলে পাঠানো হয়েছিল। অথচ পরে যখন আমরা লে. কর্নেল শিবুয়াকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করি তখন এ জাতীয় কোন রিপোর্ট প্রণয়নের কথা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি উপরন্তু বলেন, এ তাঁর কাজ ছিল না — দায়িত্বটা সম্পূর্ণ বিমান বাহিনীর। বিষয়টি নিয়ে কমিটি আরও অনুসন্ধান চালান এবং শেষ পর্যন্ত জাপানী বৈদেশিক দপ্তর থেকে আমরা একটি স্বীকৃতিপত্র পাই যা থেকে বোঝা যায় জাপান সরকার এই বিমান দুর্ঘটনাটি নিয়ে আদৌ কোন অনুসন্ধান চালাননি। এই স্বীকৃতিপত্রটি নিম্নোক্তরূপ:

The Gaimusha
চৌঠা জুন 1956

"প্রিয় শ্রী দার,

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইনকোয়ারি কমিশনের তৃতীয় অধিবেশনে 26.5.56 তারিখে কমিশন আমাদের যে অনুরোধ করেন তার প্রত্যুত্তরে জানাই :

1. অপারেশন সেকশন, রিপ্যাট্রিয়েশন রিলিফ ব্যুরো, স্বাস্থ্য ও সমাজ-সেবা মন্ত্রকে অনুসন্ধান করে জানা গেল, নেতাজী যে বিমানযোগে শেষ যাত্রা করেন সেই বিমানটির দুর্ঘটনা বিষয়ে এবং দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য কোন সরকারী অনুসন্ধান আদৌ করা হয়নি।

এই তথ্যটি আপনি উক্ত কমিশনকে জ্ঞাত করলে আমি আনন্দিত হব।

ইতি—

ভবদীয়

হিলাজী হাত্তোরি

চীফ অফ ফোর্থ সেকশন, এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো

গাইমুশা (1/64)

"শ্রী এ. কে. দার

ফার্স্ট সেক্রেটারি, ভারতীয় এম্ব্যাসি"

(যুদ্ধক্ষেত্রে বিমান দুর্ঘটনা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। ফলে বিমান দুর্ঘটনা হলে সে সম্বন্ধে স্থলবাহিনী অনুসন্ধান করবে, না বিমানবাহিনী অনুসন্ধান করবে—এ কথা যে-কোন যুদ্ধরত সভ্য রাষ্ট্রে পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত থাকে। বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ এবং জেনারেলের এ বিষয়ে ধারণা না থাকা সন্দেহের উদ্রেক করে। এ ছাড়া রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে কি হয়নি এ নিয়ে দ্বিমতও বিভ্রান্তিকর। সবচেয়ে বড় কথা এতবড় একটি বিমান দুর্ঘটনা —যাতে জাপান বাহিনীর একজন জেনারেল মারা গেলেন এবং সহযোগী আজাদ হিন্দ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান মারা গেলেন সে সম্বন্ধে আদৌ কোন অনুসন্ধান হল না, এটা রীতিমত বিস্ময়কর। জাপান সরকারের জ্ঞাতসারে বিদেশী গোয়েন্দার দল—মার্কিন এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল এ নিয়ে অনুসন্ধান করল—অথচ জাপান সরকার নিজে কোন অনুসন্ধান করল না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।)

(ii) শ্রীহায়াশিদা তাঁর গ্রন্থে বিমান দুর্ঘটনার ছয়টি হেতু লিপিবদ্ধ করেছেন: (10/111)

(a) বিমানটি নয়জন যাত্রী বহনের উপযোগী ছিল; কিন্তু তাতে তেরজন যাত্রী উঠেছিলেন।

(বিমানটি সাইগন থেকে সর্বময় কর্তা ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির জ্ঞাতসারে তেরজন যাত্রী নিয়ে ওড়ে। সাইগনের বিমান বন্দরে সে সময় একাধিক বিমান ছিল তা জানতে পারছি শ্রী আইয়ারের স্মৃতিকথায়। তিনি বলেছেন, 'পরদিন আমরা আবার দরবার করতে গেলাম। সাইগন বিমানবন্দরে তখন সারি সারি বিমান রয়েছে। একটিতে আমাদের পাঁচজনকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া এতই অসম্ভব?' তা'হলে ওভারলোড হচ্ছে জেনেও কেন তাঁরা নেতাজী ও শীদেয়ীর মত যাত্রীসমেত তেরজনকে সেই প্লেনে তুলে দিলেন? প্লেনটি ছিল হেভি বম্বার, মডেল '97-2 স্যালি'। মিৎসুবিসি কোম্পানির বিবরণীতে দেখছি, এ জাতীয় বিমানের ওজনবাহী ক্ষমতা 5,250 কে.জি.। প্রতিটি যাত্রীর গড় ওজন যদি হয় 150 কে.জি. তা'হলে যাত্রীদের সম্মিলিত ওজন 2,000 কে.জি-র কম। অর্থাৎ বিমানের ভারবাহী ক্ষমতার অর্ধেকও নয়।)

(b) 'টেক-অফ' রীতিমত কঠিন ছিল, কারণ তাইপে বিমানবন্দরে রানওয়েটি ছিল ছোট এবং বিমানবন্দরের কাছেই ছিল কতকগুলি ইঁটভাটা। তার সুউচ্চ চিমনিগুলি আকাশের মধ্যে উঁচু হয়ে বাধার সৃষ্টি করছিল।

(রানওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল 890 মিটার অর্থাৎ প্রায় 2,800 ফুট। ছোট বম্বার প্লেনের পক্ষে এ দৈর্ঘ্য যথেষ্ট। 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারী অ্যাভিয়েশন' আইন অনুসারে বিমানবন্দরের কাছে বাধাসৃষ্টিকারী চিমনি থাকতে পারে না। জাপান সরকার বিশ্বযুদ্ধে এই বিমান বন্দরে বহুসহস্র বিমান নামিয়েছে এবং উঠিয়েছে, যুদ্ধের প্রয়োজনে, বাধাসৃষ্টিকারী হলে নিশ্চয়ই তেমন চিমনি তারা বিমান বন্দরের গা ঘেঁষে থাকতে দিত না।

(c) যাত্রাপথেই তাঁরা রেডিও মারফত সংবাদ পান যে, রাশিয়ান বাহিনী পোর্ট আর্থার দখল করেছে। তাই তাঁরা অতি দ্রুত মাঞ্চুরিয়ার যেতে চাইছিলেন। এ জন্য সকলেরই মানসিক অস্থিরতা ছিল।

(বম্বার বিমানের পাইলট এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক পরিবেশে বিমান চালিয়ে থাকেন।)

(d) যদিও যান্ত্রিক গোলযোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তবু তাড়াহুড়োর জন্য তাঁরা সেগুলি মেরামত না করেই যাত্রা করেন।

(এ তথ্য আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, একাধিকবার যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে এঞ্জিনিয়ার ও পাইলট নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।)

(e) পাইলট যেহেতু তাইপে বিমানবন্দর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল না.....।

(এ তথ্য শ্রীহায়াশিদা কোন সূত্রে পেয়েছেন জানি না। পাইলট ও কো-পাইলট আইওয়িয়াগি এবং তাকিজাওয়া দু'জনেই নাকি দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁরা ইতিপূর্বে কতবার তাইহকু বিমানবন্দরে এসেছিলেন জানা নেই।)

(f) আত্মসমর্পণজনিত গণ্ডগোলে নথীপত্র ঠিকমত রাখা যায়নি। সুতরাং এ বিষয়ে তদন্ত নিষ্ফল হত।

(তদন্ত তো আদৌ করা হয়নি—নিষ্ফল হত অথবা ফলপ্রসূ হত সে জ্যোতিষচর্চা শাহ্‌নওয়াজের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।)

I. দুর্ঘটনার পরে কোন ফটো তোলা হয়েছিল কি?

বিধ্বস্ত বিমানের তিনটি আলোকচিত্র নাকি কর্নেল হবিবর রহমান নথী হিসাবে শাহ্‌নওয়াজ কমিটিকে দাখিল করেন। সে তিনটি আলোকচিত্রের অনুলিপি এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। সুরেশচন্দ্র সক্ষেদে বলেন, চেয়ারম্যান শ্রীশাহ্‌নওয়াজ এই ফটোগুলি তাঁকে আদৌ দেখতে দেননি (21/14)। এই ফটো তিনটি কে তুলেছিলেন কবে তুলেছিলেন কিভাবে তা কর্নেল হবিবরের হস্তগত হল—এ তথ্য লিপিবদ্ধ করা শাহ্‌নওয়াজ প্রয়োজন বোধ করেননি। যদিও সে তথ্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোকচিত্র থেকে কিছুই বোঝা যায়

না—একটি ভাঙা বিমান দেখা যায় মাত্র। তবু সেটির চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থা দেখে মনে হয় এ জাতীয় প্রচণ্ড দুর্ঘটনায় একজন মাত্র যাত্রীর পক্ষেও বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিমানের লৌহনির্মিত যন্ত্রাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে দেখা যায়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, মাটিতে পড়ার পর এবং যাত্রীরা বেরিয়ে যাবার পর অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিমানটির এই দশা হয়েছে।

ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, তাইহকুতে 23.10.44 তারিখে একটি বিমান-দুর্ঘটনা হয়েছিল। সেই বিমানটি নাকি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর গ্রন্থে তিনি বলেছেন:

"নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তাইপের বিমান দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষ্য হিসাবে তিনটি ফটোগ্রাফের সাক্ষাৎ আমরা পাই। ফটোগুলি ওপর ওপর দেখলেও সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। তদন্ত রিপোর্টের রায় 'সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হচ্ছে বিমানটি কংক্রিট রানওয়ের প্রায় একশ মিটার দূরে ভেঙে পড়েছিল।' কিন্তু ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনাস্থল একটি পাহাড়ের চূড়ায়, যার দূরত্ব কংক্রিট রানওয়ে থেকে দেড় মাইলের কম নয়। কর্নেল হবিবর রহমানও বলেন, বিমানঘাঁটির এক বা দু'মাইল দূরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হবিবর রহমান ঠিকই বলেছেন। 1944 সালের তেইশে অক্টোবর সত্যি সত্যি বিমানঘাঁটির এক বা দু'মাইল দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বিমান ভেঙে পড়েছিল। জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ এই বিমান দুর্ঘটনার কথা বলতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন হবিবর রহমানকে, যে দুর্ঘটনা তিনি নিজে দেখেননি।

"তাইপেতে অনুসন্ধানের সময় আমি নিজে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ের চূড়ায় ও রানওয়ের কয়েক ডজন ফটো তুলেছি। 1944 সালে পাহাড় চূড়ায় বিমান দুর্ঘটনাস্থলের যে ফটো আমি তুলেছি তা নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রদর্শিত রানওয়েতে দুর্ঘটনার — যা 18.8.45 তারিখে হয়েছিল বলে কথিত — ফটোর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।" (5/24)

ডক্টর সিংহের এই শেষ বক্তব্যটির প্রসঙ্গে আমার আপত্তি আছে। কয়েক ডজন ফটো যদি তিনি তুলে থাকেন তা'হলে আপ্তবাক্যের মত ও-কথা ঘোষণা না করে, যে ফটোটি হুবহু মিলে গেল সেটির একটি ব্লক তাঁর রচনায় পরিবেশন করা উচিত ছিল।

রিপোর্টে প্রদত্ত ফটোগ্রাফ তিনটি বিচার করে এবং অকুস্থলে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করে আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা এবার নিবেদন করি:

প্রথমত মনে রাখতে হবে, রানওয়েটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, বিমান পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে টেক্ অফ করে এবং তার উত্তর দিকেই য়ুসানসান পর্বতমালা অবস্থিত, বাকি তিনদিকে পাহাড় নেই। তাইপে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কম্পাসের সাহয্যে আমি যে স্কেচটি করেছিলাম তার অনুলিপি পরের পাতায় দিলাম:

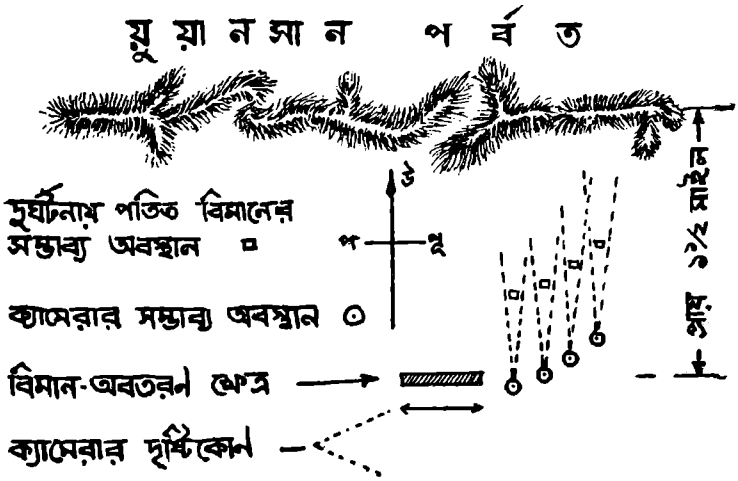

স্কেচ 7
তাইহকু বিমানবন্দরের নক্‌শা

আমরা লক্ষ্য করে দেখছি, তিনটি ফটোতেই পশ্চাৎপটে আছে পর্বত। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ক্যামেরাধারী উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ফটো তুলেছিলেন।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে রানওয়ে এবং য়ুসানসান পর্বতমালা প্রায় সমান্তরাল — ফলে টেক-অফ্ করার পরে বিমান যেখানেই ভেঙে পড়ুক না কেন এবং যেখানে দাঁড়িয়েই ফটো তোলা হোক না কেন বিধ্বস্ত বিমান এবং পর্বতের আপেক্ষিক দূরত্ব প্রত্যেকটি ফটোতেই সমান মনে হবে। অর্থাৎ বিমান যেখানেই পড়ুক এবং ক্যামেরাধারী যেখানেই দাঁড়ান না কেন, বিধ্বস্ত বিমান থেকে পাহাড়ের দূরত্ব প্রত্যেকটি ফটোতেই সমান মনে হবে। ফটো তিনটি দেখে মনে হয়, ক্যামেরাম্যান প্রতেকটি ক্ষেত্রেই বিধ্বস্ত বিমান থেকে দশ-পনের বিশ ফুট দক্ষিণে দাঁড়িয়েছিলেন — ফলে পশ্চাৎপটের পর্বতমালা প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাইল-দেড়েক দূরে বলে মনে হওয়া উচিত। কিন্তু তাই কি হয়েছে? আমার অনুমান একটি ফটোতে পশ্চাৎপটের কালো পাহাড়ের দূরত্ব অন্তত দশ-পনের মাইল, দ্বিতীয়টিতে সেটা মাইল পাঁচেকএবং আর একটিতে আমি তাইপেতে যেমন দেখছি — মাইল দেড়-দুই। এই প্রমাণ থেকে আমার স্থিরসিদ্ধান্ত, তিনটি আলোকচিত্রই তাইহকু বিমানবন্দরে তোলা নয়। সুরেশচন্দ্র এবং ড. সিংহ উভয়েই

বলেছেন—আলোকচিত্রগুলি দেখে মনে হয় পাহাড়ের মাথায় সেগুলি তোলা, সমতল রানওয়েতে নয়। এ কথাতে আমরা খুব বেশী জোর দিতে পারছি না। পশ্চাৎপটে পাহাড় থাকলে এবং ক্যামেরার অতি সন্নিকটে ভগ্নস্তূপে থাকলে সমতলভূমিতে তোলা ফটোও পাহাড়ের চূড়ায় তোলা বলে ভ্রান্তি হতে পারে।

J. তাইহকু হাসপাতালে চিকিৎসা ও মৃত্যু: 18.8.45, বেলা তিনটা থেকে মধ্যরাত্রি:

বলা হয়েছে নেতাজী ও অন্যান্য আহতদের তাইপেস্থিত নান্‌মন মিলিটারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে চারটি জেনারেল ওয়ার্ড ছিল, প্রায় আশীজন রুগী থাকবার মত ব্যবস্থা। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার সে সময়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন টি. য়োশীমি। 1938 সালে তিনি ডাক্তারী পাস করেন এবং তার দু'বছর পর চাকরিতে প্রবেশ করেন। তাঁর সহকারী ছিলেন ডাক্তার টি. সুরুতা। তিনি 1944 -এ মাত্র ডাক্তারী পাস করেন। এ ছাড়া সেখানে ছিলেন ছয় সাতজন জাপানী ও ফরমোসাদেশীয় নার্স এবং জনা-ত্রিশ মেডিক্যাল আরদালি। অনুসন্ধান কমিটি ডাক্তার দু'জনের জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন—কিন্তু একজন নার্সেরও সন্ধান পাননি। শাহ্‌নওয়াজ-কমিটি বলেছেন, "ছান-পি সাহ্ নামে একজন ফরমোসা দেশীয় নার্স শ্রীযুক্ত হারিন শাহ্ এর নিকট উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করেন—কিন্তু যেহেতু কমিটি ফরমোসায় যেতে পারেননি, তাই সেই নার্সটির জবানবন্দী আমরা নিতে পারিনি।" (এ ঘোষণা "whole truth" নয়, বস্তুত কমিটি ফরমোসায় চিঠি লিখে সেই নার্সটির লিখিত জবানবন্দী সংগ্রেহের চেষ্টা করেন, কিন্তু ছান পি সাহ্ নামের কোন নার্সের আদৌ সন্ধানও পাওয়া যায়নি। এ সংবাদটি রিপোর্টে চেপে যাওয়া হয়েছে।)

এই পর্যায়ে বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী আমরা পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করব:

1. হাসপাতালে নেতাজীর প্রথম আগমন: কী অবস্থায়, কী ভাবে ও কখন:

(i) ডা. য়োশীমির সাক্ষ্য (সাক্ষী নং 48; বাইশে ও তেইশে মে, 1955; টোকিও):

"আঠারই অগাস্ট বেলা দুইটার সময় (যদিও দুর্ঘটনার সময়কাল 2.38 মিঃ) তাইহকু বিমানবন্দর থেকে একটি টেলিফোন পান। জানানো হয়, বিমান দুর্ঘটনায় আহত কয়েকজনকে পাঠানো হচ্ছে (1/27) । কিছু পরে একটি শিদোগায় (জাপানী গাড়ি) চেপে নেতাজী প্রথম এসে উপস্থিত হন— একেবারে একা। অল্পপরেই দ্বিতীয় একখানা গাড়িতে একজন জাপানী অফিসার, এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লরিতে করে বারো-তেরো জন আহত। মি. বোস শিদোগায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় শুয়েছিলেন (2/127) । স্ট্রেচারে করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসা হল। পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর দেহ ভীষণভাবে পুড়ে গেছে, কিন্তু তাঁর দেহে কোন আঘাতও-চিহ্ন ছিল না। রক্তপাত হচ্ছিল না কোন স্থান থেকে। (2/128)

(স্মর্তব্য: কর্নেল রহমান নেতাজীর মাথায় চার ইঞ্চি ক্ষতচিহ্ন রুমাল চেপে ধরেছিলেন এবং নেতাজীর প্যান্টে আদৌ আগুন লাগেনি; প্যান্ট খুলবার প্রয়োজনই হয়নি।

(ii) ডা. সুরুতা (সাক্ষী নং 39, 1.5.56 টোকিও) :

আঠারই তারিখ বেলা তিনটার সময় একটি ট্রাকে করে দশ-বারোজন আহত হাসপাতালে

আসেন। সেই ট্রাকেই ছিলেন নেতাজী ও কর্নেল রহমান। (2/130)

(iii) মি. এম কাজুয়ো মেডিক্যাল অরডার্লির মতে:

"বেলা দুটো নাগাদ হাসতাপালের গেটে একটি মিলিটারি ট্রাক ও একটি 'জোয়োশা' (Joyosha—জাপানী গাড়ী) করে কয়েকজন আহত এসেছেন দেখে আমি অ্যালার্ম বেল বাজিয়ে দিলাম। জনাকুড়ি মেডিক্যাল অরডার্লি চার-পাঁচখানি স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে আসে। আমি প্রথম মেজর কোনোকে তুলে নিয়ে পিঠে করে পৌঁছে দিই। তাঁর আঘাত ছিল সামান্য, তাই স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাবার দরকার হয়নি (অন্যান্য সাক্ষীদের এবং মেজর কোনোর মতে তাঁর আঘাত ছিল অত্যন্ত গুরুতর)। ওঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দেখলাম ট্রাক থেকে নেতাজীকে নামিয়ে একটি স্ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর পরিধানে বিমান-বাহিনীর 'ফুল-য়ুনিফর্ম'। তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল, এবং প্যান্টের পায়া কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছিল (2/131)

(তিনজন সাক্ষীর বক্তব্য আস্‌মান-জমিন ফারাক।)

2. নেতাজী অসুস্থ অবস্থায় কোথায় ছিলেন: ঘরে আর কে ছিল?

(i) উভয় ডাক্তারের মতে: নেতাজী ও হবিবরকে একই ঘরে রাখা হয়। তৃতীয় কোন রোগী ছিল না (1/28) ।

(ii) কর্নেল রহমানের মতে: নেতাজী, হবিব এবং একজন আহত জাপানী, সম্ভবত পাইলট, একঘরে ছিলেন। ঘরে চারটি বেড, চতুর্থটি খালি ছিল (1/28) ।

(iii) তাকাহাসি বলেন: নেতাজীর অবস্থা খারাপ ছিল বলে তাঁকে পৃথক একটি ঘরে রাখা হয়। (1/28)।

(iv) লে. কর্নেল নোনোগাকির বেশ মনে আছে নেতাজী সমেত সব কয়জনকেই একটি বড় ঘরে রাখা হয়—শুধু তিনি নিজে (নোনোগাকি) অন্যত্র ছিলেন (1/28) ।

(v) জে. নাকামুরা সাক্ষী নং 55—30.5.56 টোকিও ছিলেন দোভাষী। তাঁর জবানবন্দীতে তিনি বলেন, নেতাজী যে ঘরটিতে ছিলেন সে ঘরে সর্বসমেত পাঁচটি বেড ছিল। নেতাজী ও হবিব ছাড়া অপর তিনটি বেডে ছিলেন তিনজন আহত জাপানী (1/28)।

(শাহ্‌নওয়াজ বলেছেন, 'But these are minor points and may be over-looked,' অর্থাৎ 'এগুলি অত্যন্ত সামান্য বিচ্যুতি এবং উপেক্ষা করা চলে'। 'মেজরই' হ'ক আর 'মাইনরই' হ'ক —আমার যে ছেলেবেলায় কষা সেই 'পারমুটেশান-কম্বিনেশন' অঙ্কের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পাঁচজন সাক্ষীর মধ্যে কোন দু'জনই যে একথা বলেছেন না!)

3. নেতাজীর চিকিৎসার বিবরণ:

(i) ডাঃ যোশীমি বলেন—প্রথমে যখন আসেন তখন জ্ঞান ছিল। দেহের উত্তাপ 39 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (অর্থাৎ 102 ডিগ্রী ফা.); নাড়ির গতি মিনিটে 120 । ওঁর দেহে মলম লাগানো হয়, ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়। হার্টের অবস্থা খারাপ থাকায় পর পর চারটি

ভিটা-ক্যাম্ফার এবং দুটি ডিজিটালিন ইন্‌জেকশান দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তিনটি Ringer Solution ইন্‌জেকশান দেওয়া হয়, প্রতি বারে 500 সি সি। এ জাতীয় অগ্নিদগ্ধে রুগীর রক্ত যেহেতু ঘন হয়ে যায়, এবং হার্টের উপর চাপ পড়ে তাই ঊর্ধ্বচাপের আশঙ্কায় তিনি নেতাজীর দুশো সি. সি. রক্ত বার করে দেন এবং চারশ সি. সি. নতুন রক্ত দেন। ঐ হাসপাতালের একজন সৈনিক রক্তদান করেছিল (1/29) ।

(ii) ডা. সুরুতা: ভিটা-ক্যাম্ফার ইন্‌জেকশান প্রতি আধঘণ্টা অন্তর দেওয়া হচ্ছিল। এ-ছাড়া কোন সংক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করতে তাঁকে সালফানোমাইড ইন্‌জেকশান দেওয়া হয়। নেতাজীর দেহে কোন রক্তদান করা হয়নি এবং কৃত্রিম রক্তক্ষরণও হয়নি (1/29) ।

(iii) শ্রী হারিন শাহ্ বলেছেন: প্রত্যক্ষদর্শী নার্স ছান পি সা-র জবানবন্দী অনুসারে নেতাজীকে আদৌ কোন ইনজেকশান দেওয়া হয়নি, বরং তাঁর প্রভূত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বলে তাঁকে রক্ত দিতে হয়। রক্তদান করেছিলেন কয়েক জন ফরমোসান ছাত্র। (যে ছাত্ররা রক্তদান করেছিল তাঁদের নাম-ধাম বা সাক্ষ্য না পাওয়ায় যে ছাত্রটি এই সংবাদ দিয়েছিল তাঁর ফটোই তিনি প্রমাণ হিসাবে ছাপিয়ে দিয়েছেন।) (3/81-82)

শাহ্‌নওয়াজ এ-ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, "There is no way of reconciling these different statements and they must remain as they are.", অর্থাৎ এইসব উল্টোপাল্টা জবানবন্দীকে আমরা কিছুতেই মেলাতে পারিনি—সুতরাং সেগুলি যেমন আছে তেমনিই থাক।) (1/29)

4. মৃত্যু কীভাবে এল, মৃত্যু সময়ে কে কে উপস্থিত ছিলেন?

(i) **ডা. যোশীমি** : " সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটার সময় ডা. সুরুতা আমাকে এসে বললেন নেতাজীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে; তাঁর নাড়ি ক্ষীণ হয়ে আসছে। অমি ছুটে গেলাম। পুনরায় ভিটা-ক্যাম্ফার ও ডিজিটালিন ইন্‌জেকশন দেবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। রাত আটটার কয়েকমিনিট পরে তাঁর মৃত্যু হল। আমি তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। চন্দ্র বোসের বদলে নাম লিখলাম 'কাটা কানা' (Kata Kana)। [শ্রীহরেকেষ্ট মহাতাব মহোদয়ের ভূমিকাধন্য হারিন শাহ্ এর গ্রন্থে ডেথ-সার্টিফিকেটে নাম আছে 'ওকারা ইচিরো'—'কাটা কানা' নয়; তারিখ 19.8.45–18.8.45 নয়। কাটা কানার ডেথ-সার্টিফিকেট খুঁজে পাওয়া যায়নি!] মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ছিলেন — ডা. যোশীমি, ডা. সুরুতা, দু'জন নার্স, কর্নেল হবিবর রহমান, দোভাষী নাকামুরা এবং একজন মিলিটারি পুলিস।

(ii) **মি. নাকামুরা** : দোভাষী হিসাবে আমি নেতাজীকে দেখতে যাই। একটি প্রকাণ্ড ঘরে নেতাজী, হবিব এবং আরও তিনজন আহত জাপানী শুয়েছিলেন। নেতাজীর বিছানার কাছে এসে শুনলাম তিনি কর্নেল হবিবর রহমানকে নিম্নস্বরে বললেন, তাঁর যে

সব সঙ্গীরা পরে আসছে তাঁদের দেখাশোনা করতে। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি জানতে চাইলেন শীদেয়ী কেমন আছেন। আরও আধঘণ্টা পরে বললেন, 'মাথায় রক্ত উঠে আসছে।' রাত নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার ভিতর শেষ কথাটি বলেন, 'এবার ঘুমাব।' উনি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। মিনিট দশেক পরে তাঁর মাথাটা হেলে পড়ল। ডা. পরীক্ষা করে বললেন, তিনি মৃত। সে সময়ে সে ঘরে ছিলাম — আমি, ডা. যোশিমি, কর্নেল রহমান, ছয়-সাতজন জাপানী সোলজার ও মেডিক্যাল অরডার্লি। কোন নার্স সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। (2/133)।

['আমি নেতাজীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে ছিলাম একথা এ পর্যন্ত বলেছেন পাঁচজন! তার মধ্যে সিস্টার ছান পি সা বলে বাস্তবে কেউ কখনও ছিলেন কিনা তা দু'জন মাত্র বলতে পারেন। শ্রীহারিন শাহ্ এবং ঈশ্বর। হারিন শাহ্ বলেছেন — ছিলেন, ঈশ্বর নীরব! যাই হোক, বাস্তবে ঐ নামে কেউ থাকলেও তিনি যে মিথ্যা কথা বলছেন তা সন্দেহাতীত। বাকি চারজন হচ্ছেন হাসপাতালের দু'জন ডাক্তার, দোভাষী মি. নাকামুরা এবং কর্নেল হবিবর রহমান। ডা. যোশীমির জবানবন্দী আমরা দেখেছি। ডা. সুরুতা ঠিক কী বলছেন তা কোথাও পাইনি। সেটা শাহ্নওয়াজ কমিটি প্রকাশ করেননি। সুরেশচন্দ্র বোধহয় সে নথীপত্র পাননি। বর্তমান কমিশন যদি সেটা প্রকাশ করেন তা'হলেই আমরা তা জানতে পারব। তৃতীয় ব্যক্তি মি. নাকামুরা। আমি জাপানে গিয়ে তাঁর খোঁজ করেছিলাম। তাঁর পুরো নাম Mr. Juichi Nakamura। ফরমোসার গভর্নর জেনারেলের তিনি ছিলেন দোভাষী। নেতাজী আহত হয়ে হাসপাতালে এলে নাকি তাঁকে দোভাষীর কাজ করতে হাসপাতালে আনা হয়। আমি খবর পেলাম, কিউসু দ্বীপে ফুকুওকা (Fukuoka) নামক স্থানে তিনি থাকেন (1970)। বছর চার-পাঁচ আগেও তিনি সেখানে ছিলেন। জীবিত থাকলে — তাই তিনি থাকুন — তাঁর বর্তমান বয়স আশীর ওপর। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। চতুর্থ ব্যক্তি হচ্ছেন কর্নেল রহমান। তিনি একাধিক বিবৃতি দিয়েছেন — কিন্তু আশ্চর্য, কোনবারই নেতাজীর শেষ সময়ের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। এককথায় বলেছেন, 'রাত আটটা নাগাদ তিনি মারা যান, আমি উপস্থিত ছিলাম।' তাঁর জবানবন্দীতে ঐ অংশের কোন বিস্তারিত বর্ণনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না। শাহনওয়াজ কমিটিও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব!

এই সঙ্গে বলে রাখি, এই চারজন ছাড়া নেতাজীর 'মৃতদেহ আমি দেখেছি' এ কথা আর কেউ বলেননি। মৃত্যুর পরেই নাকি মৃতদেহ কাপড়ে ঢাকা দেওয়া হয় — আর খোলা হয়নি। একমাত্র মেজর নাগামোতো বলেন, তিনি মৃতদেহের ঢাকা সরিয়ে মুখও দেখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও জানাই যে, যুদ্ধান্তে 1946 সালে ডা. যোশীমিকে মিত্রপক্ষ গ্রেপ্তার

করে। হংকঙে একটি জেলে অবস্থানকালে তিনি গোয়েন্দা বিভাগকে যে বিবৃতি দেন তাতে নেতাজীর মৃত্যুসময় রাত্রি এগারোটা বলে উল্লেখ করেছিলেন (1/30)।

তেইশে অগাস্ট '45-এ জাপানী ডোমেই এজেন্সী পরিবেশিত যে সংবাদ ছাপা হয় তাতে বলা হয়েছে, মৃত্যুসময়—মধ্যরাত্রি।

ব্রিটিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স একটি তারবার্তা উদ্ধার করেছিল। তারবার্তাটি সাদার্ন আর্মির চীফ অফ স্টাফ হিকারী কাইকানকে 20.8.45 তারিখে পাঠায়—তাতে বলা হয়েছে নেতাজী ঠিক মধ্যরাত্রে মারা যান।

শাহ্নওয়াজ কমিটি তাই বলেছেন, "So the time of death cannot be established with accuracy; it could be anytime between 8 p.m. and midnight on the 18th Aug, '45."—মৃত্যুসময় নির্ভুলভাবে বলা যায় না। রাত্রি আটটা থেকে মধ্যরাত্রের মধ্যে যে কোন সময় হতে পারে।

K. দাহকার্য : তাইহকুতে কেন? কে কে উপস্থিত ছিলেন?

20.8.45 থেকে 22.8.45।

1. কেন মহাশব টোকিও বা সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া গেল না?

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নাকি উঠে দাঁড়ান এবং পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান দেখান। হবিবর নাকি প্রার্থনা করেন, কান্নায় ভেঙে পড়েন। ডা. যোশীমি বলেন, ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলের চোখই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। যাই হোক, ডা. যোশিমী তারপর ফরমোসাস্থিত মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে টেলিফোন করে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁরা মেজর নাগামোতো নামে একজন স্টাফ অফিসারকে পাঠিয়ে দেন। নাগামোতো হাসপাতালে এসে মৃতদেহটি দেখেন — সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ বাঁধা। চারিদিকে পরদা টাঙিয়ে সেটি লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখা হয়েছিল। মেজর নাগামোতো বলেছেন, তিনি শবের মুখে কাপড় সরিয়ে মুখখানিও দেখেছিলেন।

শাহ্নওয়াজ কমিটি বলেছেন, "পরদিন অর্থাৎ উনিশ তারিখ সকালে ফরমোসাস্থিত আর্মি হেডকোয়ার্টার্স টোকিওস্থ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে একটি তারবার্তা পান—যেন শবদেহটি তারা টোকিওতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন' (1/39)। এ থেকে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তার পূর্বেই অর্থাৎ আঠার তারিখের শেষরাত্রে অথবা উনিশে অতি প্রত্যুষে নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ ফরমোসার আর্মি হেডকোয়ার্টার্স টোকিওকে জানান। এ সম্বন্ধে কমিটি বা অন্য কেউ কিছু বলেননি।

যাইহোক, টোকিও থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে মেজর নাগামোতো ডাক্তার যোশীমিকে অনুরোধ করেন যেন ফর্মালিন ইন্‌জেকশান দিয়ে শবদেহের পচনকার্য নিবারণের ব্যবস্থা করা হয়। [তা করা হয়েছিল কি না বলা হয়নি] ঐ দিনই, অর্থাৎ উনিশে, শবদেহটি একটি

কফিনে বন্ধ করা হয়। হবিবর বলেন, তিনি অনতিবিলম্বে শবদেহ নিয়ে টোকিও অথবা সিঙ্গাপুরে যাবার ব্যবস্থা করতে ওঁদের চাপ দেন।

কমিটির রিপোর্টে অতঃপর বলা হয়েছে "According to Major Nagamoto, the first telegram from the Imperial General H/Qs was followed by a second telegram, asking them not to send the body to Tokyo, but to cremate at Taihoku. No reason was given for this change of orders. Col.Habibur Rahman was told, on the 20th, that the body could not be transported by plane, because the coffin was too big to be carried in the small plane which the Japanese had." অর্থাৎ "মেজর নাগামোতো জানালেন, ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে দ্বিতীয় আর একটি তারবার্তা এল যাতে বলা হয়েছিল শবদেহ টোকিওতে পাঠাবার ব্যবস্থা যেন না করা হয় — যেন, সেটি তাইহকুতেই দাহ করা হয়। কেন এ আদেশ এল তার কারণ দেখানো হয়নি। কুড়ি তারিখে কর্নেল হবিবর রহমানকে জানানো হল যে, জাপানীদের কাছে তাইহকুতেই যে ছোট বিমানটি আছে তার অনুপাতে কফিনটি আকারে বড় হয়েছে। ফলে দেহটিকে বিমানে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

সংবাদটি রীতিমত বিভ্রান্তিকর। বেশ বোঝা যায়, টোকিওর ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্সের নির্দেশেই তথাকথিত মৃতদেহটি সিঙ্গাপুরে অথবা টোকিওতে নিয়ে যাওয়া গেল না। শবযাত্রা হল না। একটি মাল্যদান কেউ করল না, এমন কি ফরমোসাস্থিত জাপান বাহিনীর কমান্ডার-ইন চীফ জেনারেল আন্ডো, চীফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইসামায়া বা জাপান সরকারের অন্য কোন প্রতিনিধি দাহকার্যের সময় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। কফিনে ঢাকা মৃতদেহটি একান্ত গোপনে দাহ করা হল তাইপের এক সঙ্গোপন ক্রিমেটোরিয়ামে। কী কারণে টোকিও কর্তৃপক্ষ মৃতদেহটি জাপানে প্রেরণ করতে আপত্তি জানালেন তা না বলেছেন টোকিওর বড়কর্তারা, না অনুসন্ধানের সময় কোন সাক্ষী। কর্নেল হবিবরকে বলা হল যে, কফিনটি আকারে বড় — ফরমোসায় যে বিমান আছে তা আকারে ছোট তাই এ ব্যবস্থা! অথচ সকালে টোকিও থেকে রওনা হলে একটি বিমান অনায়াসে তাইহকু থেকে মহাশবকে সন্ধ্যার পূর্বেই টেকিওতে নিয়ে যেতে পারে! ছোট আকারের একটি কফিন বানাতে সুদক্ষ জাপানী ছুতোরদের কয়েকঘণ্টার বেশী সময় লাগে না! তা' হলে?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছি না —

যে সমস্ত সহযোগী রাষ্ট্রের সহায়তায় জাপান এই বিশ্বযুদ্ধে ইঙ্গো-মার্কিন প্রভাব থেকে এশিয়াকে মুক্ত করতে চেয়েছিল তার ভিতরে নেতাজীর স্থান ছিল বিশিষ্টতম! নেতাজী যে অকুণ্ঠ সম্মান লাভ করেছিলেন জাপান সরকার এবং জাপানী জনসাধারণের কাছে

যুদ্ধকালে অন্য কোন বিদেশী তা পাননি। তাঁর তিনবার জাপান সফরে জাপানী সংবাদপত্রের কাটিং এ সত্যের অভ্রান্ত প্রমাণ। যাঁরা বলেন, পূর্বমুহূর্তে জাপান আত্মসমর্পণ করায় জাপান সরকারের যাবতীয় ব্যবস্থা একটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল, যাঁরা বলেন, জাপানী বিমান সে সময় আকাশে উড়ছিল না তাঁদের সবিনয়ে বলব, এ কথায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর সাতদিন পরে জাপান তার অন্যান্য সহযোগী রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য বিমান পাঠিয়েছে, তাঁদের পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে জাপানের মূল ভূখণ্ডে নিয়ে গেছে। বর্মার রাষ্ট্রপ্রধান ডাক্তার বা ম, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট লরেল অথবা নানকিঙস্থিত চীনা-সরকারের প্রধান চেনকুঙ পাও-কে জাপান সরকার বিমান পাঠিয়ে নিয়ে গেছে নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর পাঁচ-সাত দিন পরে। তাঁরা ঐ তাইহকু হয়েই গিয়েছিলেন। অথচ এঁদের প্রত্যেকের চেয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই সময়ে জাপানে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি। এঁদের কারও জন্যে জাপানের জাতীয় কবি নোগুচি প্রশস্তি রচনা করেননি। নব্বই দিন ডুবো জাহাজে কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন এশিয়ার মুক্তিদূতরূপে টোকিওতে আত্মপ্রকাশ করলেন সেই সময় সে সংবাদ পেয়ে জাপানের জাতীয় কবি য়োনোজিরু নোগুচি 20.6.43 তারিখে যে সুভাষ-প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তার বঙ্গানুবাদ আমি কোথাও দেখিনি। তাই তাঁর সেই কবিতাটির একটি অনুবাদ এখানে পরিবেশন করার চেষ্টা করলাম:

"একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি নিয়েছিলেন
আমৃত্যু অনশনের সংকল্প!
গান্ধী দিয়ে গেছেন পথের নির্দেশ — মানবাত্মার দুর্বার শক্তি।
তাঁকে জানিয়েছিলাম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।
কিন্তু কী দিলেন তিনি?
ব্রিটিশের ক্ষমতাদর্পের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ধিক্কার!
বর্বর ব্রিটেনের বিন্দুমাত্র শৃঙ্খল ছিন্ন করবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর দুর্বল বাহুতে।
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যকে উপেক্ষা করে তিনি আবার আত্মগোপন করলেন
তাঁর ক্ষুদ্রায়তন অন্ধকার পর্ণকুটীরে।
প্রার্থনামন্ত্রে দানবশক্তি রুখবার তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ!
তিনি মহানুভব, তিনি সাধুপুরুষ — তিনি যে বড় বেশী সাধু!
সুভাষচন্দ্র বোস:
তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসা —
কী আছে ভারতের ভবিষ্যৎ মঞ্জুষায়?
মানলাম, — তোমার জন্মভূমি আজ ব্রিটেনের নাগপাশ ছিন্ন করতে চায়।
মানলাম,— জাপান তোমার হাতে রাখী পরাতে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত।

কিন্তু সেটাই তো সমাধানের শেষ যবনিকা নয়!
এ যে শুধু দুটি শুভেচ্ছার মেল-বন্ধন।
ব্রিটিশ-দানবের নাগপাশ ছিন্ন করবে কেমন করে?
কেমন করে নিশ্চিহ্ন করবে বাধার দুর্মদ পর্বতকে?
শত্রু কামড়ে ধরছে তোমার দেশজননীর কণ্ঠনালী,
সে আজও দুর্বার।
বল, —কেমন করে জেগে উঠবে ভারত?
বল, —- কেমন করে জাপান সেবা করবে তোমাকে?
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আজ উত্তাল, প্রভঞ্জন আজ দুর্বার—
সময় এগিয়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে।
দ্বিধাসংকোচ দূরে ছুঁড়ে ফেলে আজও কি জেগে উঠবে না ভারত?
শাণিত খড়্গ হাতে তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াবার মহালগ্ন কি আজও আসেনি?
জেনো, জাপান আছে তোমার পাশেই, তোমার সহকারীরূপে—
ওঠো বন্ধু! ভারতকে পৌঁছে দাও শেষবিজয়ের সিংহদ্বারে!"

এ ভাষায় জাপানের জাতীয় কবি, জাপানের রবীন্দ্রনাথ সম্বোধন করেননি বা ম'কে, লরেল বা আরও কোন এশিয়াবাসী জননেতাকে! তাই কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না, সেই নেতাজীর মৃতদেহকে সজ্ঞানে এভাবে অমর্যাদা করতে পারে জাপান—কোন কারণ না দেখিয়ে!

2. **কোন্ তারিখে দহকার্য হল?**

কোন তারিখে নেতাজীর মরদেহ তাইহকুর সেই অখ্যাত ক্রিমেটোরিয়ামে গোপনে দাহ করা হল তারও কোন সঠিক রেকর্ড নেই। এখানেও সেই পরস্পরবিরোধী জবানবন্দী। নানান নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ থেকে 20.8.45 তারিখটা মেনে নিতে পারলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে খাড়া করা যায়, অথচ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত একমাত্র ভারতীয় তাঁর প্রথম জবানবন্দীতে লিখিতভাবে বলেছেন তারিখটা 22.8.45 — যা নাকি অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে মেলে না। বিভিন্ন সূত্র সঙ্কলিত তথ্যগুলি পরিবেশন করি:

(i) কর্নেল হবিবর রহমান বিমান দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে মনে করেছিলেন যে-কোন মুহূর্তে তিনি ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হতে পারেন। তিনি বলেছেন, তাতে, পাছে ভারতবাসীরা সুভাষচন্দ্রের শেষসংবাদ থেকে বঞ্চিত হয় তাই তিনি তাইহকুতে বসেই 24.8.45 তারিখে সমস্ত ঘটনার একটি বিবৃতি লিখে ফেলেন। এই অমূল্য দলিলটি তিনি টোকিওতে পৌঁছেই প্রথম সুযোগে শ্রীরামমূর্তিকে হস্তান্তরিত করেন — বলেন, নেতাজীর কী হয়েছিল তা এ কাগজে লেখা আছে। এটাই সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল, কারণ এটা হবিবের কথা অনুযায়ী ঘটনার অব্যবহিত পরে লেখা — কারও সঙ্গে আলোচনা না

করে। এই মূল দলিলটি শাহ্‌নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে 67 পৃষ্ঠায় ছেপেছেন। আলোচ্য বিষয়ে দেখেছি হবিবর লিখেছেন, "21.8.45 তারিখে একজন সিনিয়র স্টাফ অফিসার হাসপাতালে এসে আমাকে জানালেন যে, কফিনের বাক্সটি আকারে বড় হওয়ায় প্লেনে ওঠানো যাচ্ছে না। তিনি তাইহকুতেই তাই শবদেহের দাহকার্য সম্পন্ন করতে চাইলেন। উপায়ান্তর না দেখে আমি রাজী হলাম। ফলে 22.8.45 তারিখে নেতাজীর দেহ দাহ করা হল। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। চিতাভস্ম পরদিন 23.8.45 তারিখে সংগৃহীত হল।" (1/6)

পাঁচ-দশবছর পরে তারিখের ভুল হওয়া স্বাভাবিক! কিন্তু এই প্রামাণ্য দলিলটি যে কর্নেল রহমান তাইহকুতে বসেই লিখেছিলেন 24.8.45 তারিখে। ঘটনার মাত্র অটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ! 'বাইশ তারিখে নেতাজীর দেহ দাহ করা হ'ল না বলে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন 'গত পরশু নেতাজীর দেহ দাহ করা হল!'

(i) প্রথমে লিখিত জবানবন্দীতে চব্বিশ তারিখে কর্নেল রহমান বললেন, শবদাহের তারিখ বাইশে; কিন্তু দ্বিতীয়বার মৌখিকভাবে বললেন, তারিখটা 20.8.45 । এই দ্বিতীয়বার উক্তিটি তিনি করেন 7.9.45 তারিখে টোকিওতে পৌঁছে, শ্রী আনন্দমোহন সহায়ের বাড়িতে রাত্রিকালে এস. এ. আইয়ারের কাছে। অবশ্য সত্যই তা তিনি বলেছেন কিনা জানি না। শ্রী আইয়ার অন্তত এই কথাই জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। পার্লামেন্ট প্রসিডিংস 5.3.52 দ্রষ্টব্য। মনে রাখবেন, 24.8 থেকে 7.9 হচ্ছে চৌদ্দ দিনের ব্যবধান!

(iii) এবার আসুন, 24.9.45 তারিখে, অর্থাৎ আর সতের দিন পর, আবার তারিখটা বদলে গেছে। 24.9.45 তারিখে কর্নেল হবিবর রহমান আবার বলেছেন, দাহকার্যের তারিখ একুশে বা বাইশে এবং আবার বলেছেন একুশে তাঁকে জানানো হয় যে দেহ টোকিও নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রমাণ? ব্রিটিশ ইন্ডিয়া গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন নথি!

"ব্রিটিশ এবং আমেরিকান মিলিটারি গোয়েন্দা বিভাগ

"কাউন্টার ইন্টেলিজন্স কোর

"বিষয়: সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু, টোকিও, 29.9.45"

(iv) চতুর্থবার অনুসন্ধান কমিটির কাছে জবানবন্দী দেবার সময় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বললেন, '20.8.45 তারিখে আমার উপস্থিতিতে নেতাজীর দেহ দাহ করা হয়।'(1/40)

(v) (vi) (vii) শ্রীহারিন শাহ্‌ বলেছেন, 1956 সালের অগাস্ট মাসে সরেজমিনে তদন্ত করার সময় ক্রিমেটোরিয়ামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁকে বলেছিল, একুশ তারিখে দাহকার্য শুরু হয় এবং বাইশ তারিখে সকালে চিতাভস্ম সংগৃহীত হয়। ভারপ্রাপ্ত দাহকারীর নাম নাকি চু-সাঙ। লেখক তাঁর ফটোও ছেপেছেন। শ্রী শাহ্‌নওয়াজ তাঁকে

প্রত্যক্ষদর্শী বলে মেনেও নিয়েছেন।

(vi) মেজর নাগামেতো (সাক্ষী 60) 1.6.56 তারিখে জবানবন্দী দেবার সময় কমিটিকে জানান, তাঁর বেশ মনে আছে দ্বিতীয় টেলিগ্রাফখানি যেদিন পাওয়া যায় সেই দিনই বৈকালে দাহকার্য হয়। মেজর নাগামোতো ফরমোসো বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জাপানী অফিসার। তিনিই জাপান সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দাহকার্য সম্পন্ন করেন এবং দাহের সময়ে উপস্থিত থাকেন। ফলে তাঁর বক্তব্যই জাপানের সরকারের বক্তব্য। যেহেতু ঐ দ্বিতীয় তারবার্তাটি 19.8.45 তারিখ সকালে তাইহকুতে পৌঁছেছিল তাই মেজর নাগামোতো হিসাব অনুযায়ী দাহকার্যের তারিখ 19.8.45 (1/40).

(vii) শ্রী হায়াশিদা বলেন, এ বিষয় তাঁর কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তিনি জাপান সরকারের আদেশে চিতাভস্ম তাইহকু থেকে টোকিও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি শুনেছিলেন 20.8.45-এ দাহকার্য হয় (10/114)।

3. **দাহকার্যের সময় কে কে উপস্থিত ছিলেন?**

তাইহকুতে সে সময় অন্তত দু'জন জাপানী জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। ফরমোসা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল অ্যান্ডো এবং চীফ-অফ- স্টাফ জেনারেল ইসায়ামা। এ ছাড়া জাপানের রাজকুমারের 18.8.45 তারিখে তাইহকুতে আসার কথা ছিল একথা আগেই বলেছি। তিনি আদৌ এসেছিলেন কিনা জানি না।

মেজর নাগামোতো বলেন, "নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আন্ডো তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যান, তাঁর যে আদ্যশ্রাদ্ধ বা funeral ceremony নিশী হঙ্কোজী মন্দিরে (তাইহকুতেই) অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও উপস্থিত থেকে নেতাজীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।"(1/43)

অথচ চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল ইয়াসামা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। চীফ-অফ-স্টাফের পক্ষেই প্রধান সেনাপতির গতিবিধি নির্ভুলভাবে জানা স্বাভাবিক। তিনি বলেন, জেনারেল আন্ডো অথবা তিনি নেতাজীর মৃতদেহ দেখতে একবারও হাসপাতালে যাননি, দাহকার্যের সময়ও উপস্থিত ছিলেন না, অথবা হঙ্কোজী মন্দিরের শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন না। এই অচরণ সমর্থনের জন্য তিনি বলেন, নেতাজীর মত উচ্চপদস্থ একজন ইঙ্গো-মার্কিন শত্রু যে পূর্ব এশিয়া থেকে টোকিওতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন এ সংবাদ গোপন রাখবার জন্যই তাঁদের এই ব্যবহার। মজার কথা এই যে, তিনি ঐ একই জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে, এই ঘটনার সাতদিন পরে তিনি ও জেনারেল আন্ডো তাইহকুতে বিমানবন্দরে এসে বর্মার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বা ম' এবং বর্মাবাহিনীর চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল তানাকাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁদের সশরীরে গোপনে জাপানে পলায়নে নানাভাবে সাহায্য করেন!

জেনারেল ইয়াসামা টোকিও ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে একটি তারবার্তায়

আদিষ্ট হয়েছিলেন তাইহকুতে নেতাজীর দেহ দাহ করতে। ভদ্রতার বা সৌজন্যের খাতিরে না হোক, এই মিলিটারী আদেশ তিনি কী ভাবে পালন করেছিলেন সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "I left the matter of disposal of Mr. Bose's ashes to my Staff Officer, and since I did not receive any report from him, I presumed everything must have worked out smoothly." অর্থাৎ "মিস্টার বসুর ভস্ম সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব আমি আমার স্টাফ অফিসারের উপর ন্যস্ত করেছিলাম (এই অফিসারটি নেক্সট-ইন-কমান্ড নন, কর্নেল বা লেঃ কর্নেল নন, অধস্তন একজন মেজর।) যেহেতু কার্য সম্পন্ন করার বিষয়ে তিনি কোনও রিপোর্ট করেননি তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, যাবতীয় কাজ সুষ্ঠু ভাবেই মিটে গেছে।"(1/43)

" এইসঙ্গে উল্লেখ করা কি অপ্রাসঙ্গিক হবে যে, 21.1.45 তারিখে, অর্থাৎ আট মাস আগে, টোকিওতে রাসবিহারীর মৃত্যু হলে স্বয়ং জাপান সম্রাট রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁর বংশের রাজকীয় শবাধার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন — রাজবংশের বাইরের কারও মরদেহ বহনের জন্য যে শবাধারের ব্যবহার ছিল নিয়ম বহির্ভূত?" (7 ভূমিকা)

বলা হয়েছে, একটি অনাড়ম্বর শবদেহ 'তাইহকুতে সিটি ক্রিমেটোরিয়ামে' দাহ করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন:

1. কর্নেল হবিবর রহমান (যাঁর মতে তারিখটা প্রথমে বাইশে, পরে একুশে, শেষ পর্যন্ত বিশ তারিখে)।

2. মেজর নাগামোতো — জাপান সরকারের তরফে (যাঁর মতে তারিখটা উনিশে)

3. শ্রী যুচি নাকামুরা — (দোভাষী যাঁর মতে বিশ তারিখ)।

4. বৌদ্ধ পুরোহিত — (এঁর নাম জানা যায়নি, সন্ধান পাওয়া যায়নি, সুতরাং এঁর জবানবন্দীর প্রশ্নই ওঠে না)।

5. মি. চু সাঙ — শ্মশানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (যাঁর মতে তারিখটা একুশে।)

আবার সেই পার্মুটেশনের অঙ্ক—পাঁচজন সাক্ষীর কোন দু'জন এক তারিখ বলছেন না!

4. হাসপাতাল থেকে মহাশবের শ্মশানে নিয়ে যাবার বর্ণনা:

(i) হবিবর : " The Hospital Staff and a large number of others accompanied the cortege"অর্থাৎ হাসপাতালের কর্মীরা এবং বহুসংখ্যক সাধারণ লোক মহাশবের অনুগমন করেন।

(ii) ডা: যোশীমি: "The body was taken away from the Hospital by the Capt. of the guard posted there on the 18th. The coffin placed in the truck and carried away." অর্থাৎ যে সান্ত্রীকে আঠারো তারিখ হাসপাতালে পাহারায় রাখা হয়েছিল তার তত্ত্বধানে মৃতদেহটি একটি ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল

(হাসপাতালের কেউ সঙ্গে যাননি বা বহুসংখ্যক শবানুগামীর উল্লেখ নেই) (1/40)

(iii) মেজর নাগামোতো: কফিনটি একটি ট্রাকে চাপানো হল। তার সম্মুখ ছিল বারো জন সৈনিক। এই ট্রাকের আগে আগে যাচ্ছিল একটি গাড়ী—তাতে ছিলেন কর্নেল রহমান ও দোভাষী নাকামুরা।

(হবিবের সাক্ষ্যে প্রশ্ন জাগে, বহুসংখ্যক লোক এবং হাসপাতালের কর্মীরা শবানুগমন করলে, কেন তিনি বললেন দাহকার্যের প্রত্যক্ষদশী মাত্র পাঁচজন ? বাকি লোক কোথায় গেল? দ্বিতীয়ত, হাসপাতালের কর্মীরা শবানুগমন করলে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু কি সে কথার উল্লেখ করতে ভুলতেন?)

5. ক্রিমোটোরিয়াম থেকে চিতাভস্ম সংগ্রহ করার বর্ণনা:

মেজর নাগামোতোর সাক্ষ্যে চিতাভস্ম সংগ্রহের বর্ণনা পাচ্ছি। মেজর নাগামোতো (সাক্ষী 60) টোকিওতে 1.6.56 তারিখে সাক্ষ্য দেন। তাঁর জবানবন্দী শ্রীসুরেশচন্দ্র যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, শ্রী শাহ্‌নওয়াজের সরকারী রিপোর্টে ঠিক সে ভাষায় লেখা নেই। কোনটি নির্ভুল আজ বলা কঠিন। আমরা দু'টি জবানবন্দীর আক্ষরিক অনুবাদ করে দিলাম:

(i) শাহনওয়াজের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী মেজর নাগামোতোর জবানবন্দী (1/41):

"পরদিন সকাল আটটার সময় আমি হাসপাতালে এলাম ভারতীয় অ্যাডজুটেন্টকে আমার গাড়িতে তুলে নিতে। আমি গাড়ি চেপেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং যতদূর মনে পড়ছে, দোভাষী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন। ক্রিমোটোরিয়ামে পৌঁছে ফার্নেসের তালাটি খুলে ফেললাম। চাবি আমার কাছেই ছিল। স্লাইডিং প্লেটটি টেনে বার করলাম। আমার দপ্তর থেকে আসবার সময়েই আমি একটি কাঠের ছোট্ট চৌকো বাক্স নিয়ে আসি, প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা চওড়া ও খাড়াই (a small wooden box about 8" cube)। যে প্লেটের উপর পূর্বদিন কফিনটি রাখা হয়েছিল সেটি টেনে বার করলাম। আমরা দেখলাম সমস্ত কঙ্কালটি অবিকৃতই আছে, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্মের নিয়মানুসারে আমি দু'টি চপ-স্টিকের সাহায্যে কণ্ঠের একটি অস্থি ঐ কাঠের বাক্সে রাখলাম। তারপর বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কিছু কিছু অস্থি নিয়ে ঐ বাক্সে রাখলাম। ভারতীয় অ্যাডজুটেন্টও আমার সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন। (হবিবের ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের আলোকচিত্রটি স্মর্তব্য। দোভাষীও অনুরূপ কার্য করেছিলেন কিনা আমার স্মরণে নেই। এইভাবেই কাঠের বাক্সটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর কাঠের বাক্সটির ডালা বন্ধ করে আমি পেরেক মেরে দিলাম। আমার অবশ্য ঠিক মনে নেই যে, এই পেরেক মারার কাজটি আমি সেখানে করি, অথবা মন্দিরে পৌঁছে। যাই হোক, বাক্সটি বন্ধ করে একটি সাদা কাপড়ে সেটি জড়িয়ে নিলাম। তারপর একটি কাপড় দিয়ে বাক্সটি ঐ

ভারতীয় অ্যাডজুটেন্টের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। অতঃপর আমরা তিনজনে গাড়িতে করে নিশী (পশ্চিম) রেঙ্কোজী মন্দিরে চলে যাই। সেখানে এইদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল।" (1/40)

(ii) শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু লিখিত মেজর নাগামোতোর জবানবন্দী:

" পরদিন (অর্থাৎ একুশে) তিনি দুপুরবেলা ক্রিমেটোরিয়ামে এসে দেখলেন কর্নেল রহমান ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে জনা-পনের সৈনিক উপস্থিত এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারও হাজির। ক্রিমেটোরিয়ামের একজন কর্মী তাঁদের ভিতরে আসতে বললেন। ওঁরা সদলবলে প্রবেশ করলেন, সবার আগে আগে যাচ্ছিলেন কর্নেল রহমান। কর্মীটি ফার্নেসের মুখ খুলে দিল এবং 'স্লাইডিং ট্রে' -টি টেনে বার করল। একজন পুরোহিত দু'টি চপ-স্টিক নিয়ে এলেন — যেহেতু হবিব কাঠি-দু'টি ধরতে পারছিলেন না, তাই বৌদ্ধ পুরোহিত নিজেই কাঠির সাহায্যে কণ্ঠনালীর একটি অস্থি বার করে আনলেন — তারপর চোয়ালের একটি হাড় এবং একে একে তা ভস্মাধারে রাখতে থাকেন। কর্নেল রহমান বার দুই কাঠি দু'টিকে স্পর্শ করলেন। এভাবে ভস্মাধারটি পূর্ণ হয়ে গেল। সেটি একটি কাপড়ে জড়িয়ে কর্নেল রহমানের গলায় ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা হল; কিন্তু রহমানের ঘাড়ে ক্ষত থাকায় ও ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকায় বাধ্য হয়ে সেটি জাপানী জঙ্গী অফিসারের গলা থেকেই ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এরপর তাঁরা দু'জনে — তৃতীয় কেউ সঙ্গে ছিলেন না — নিশী (পশ্চিম) রেঙ্কোজী মন্দিরে চলে আসেন। সেটাই ক্রিমেটোরিয়ামের কাছাকাছি মন্দির। ওখানে পৌঁছে ভস্মাধারটি তাঁরা মন্দিরের পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করেন। সেই মন্দিরে তাঁরা অপর একটি ভস্মাধারও দেখেছিলেন, পুরোহিত বললেন, সেটি জেনারেল শীদেয়ীর চিতাভস্ম। মেজর নাগামোতো এরপর বাড়ি ফিরে যান এবং কর্নেল ফিরে যান হাসপাতালে।" (2/41)

একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। 1.6.56 তারিখে টোকিওতে যখন মেজর নাগামোতো জবানবন্দী দেন তখন সম্ভবত তিনি জাপানী ভাষায় বলেন এবং দোভাষী তা ইংরেজী অনুবাদ করে শোনান। তখনই সরকারী শ্রুতিধর তা লিখে ফেলেন এবং নিশ্চয়ই তা টাইপ করে ফেলা হয়। তা' হলে সরকারী রিপোর্টের বক্তব্যে এবং সুরেশচন্দ্রের বক্তব্যে এত পার্থক্য কেন? যদি ধরে নিই সুরেশচন্দ্র সে জবানবন্দীর অনুলিপি পাননি — তিনি নিজের রাখা নোট থেকেই পরে এই জবানবন্দী রেখেছেন, তাতেই বা এত মৌলিক পার্থক্য থাকবে কেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলব। কর্নেল রহমান কমিটির কাছে একটি ফটো দাখিল করেছিলেন যাতে তিনি বলেছেন যে, নেতাজীর চিতাভস্মের সম্মুখে তাঁর বসে থাকার ফটো এটি। চিত্রে দেখছি একটি চেয়ারে একজন লোক বসে আছেন তাঁর সর্বাঙ্গই কাপড়ে ঢাকা। শুধু কান একটি চোখ, নাক ও কবজির কাছে কিছুটা অনাবৃত ।

সামনে একটি টুল, তাতে একটি চিনামাটির ভস্মাধার বা urn, তার সম্মুখে একটি মোমবাতি। ফটোটি বিচার করে মনে এই কয়টি প্রশ্ন জাগে:

(i) এ ফটো তোলার উদ্দেশ্য কী? স্মৃতিচিহ্ন না দলিল?

যদি স্মৃতিচিহ্ন হয় তাহলে প্রশ্ন: কর্নেল রহমানের মুখে এমনভাবে কেন ব্যান্ডেজ জড়ানো আছে যাতে তিনি কথা বলতে পারবেন না? তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর তিনি বারবার কথা বলেছেন। তারপর চারপাঁচদিন কেটে গেছে। অন্তত ফটো তোলার সময় তিনি মুখের উপর ব্যান্ডেজ সরিয়ে নেবেন না কি? যদি প্রমাণ হিসেবে ফটো তোলা হয়ে থাকে তা হলে তো মুখের আবরণ খোলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী।

(ii) মেজর নাগামোতো বলেছেন, তিনি একটি 8" x 8" x 8" কাঠের বাক্সে চিতাভস্ম সংগ্রহ করেন। তারপর সেটিকে বন্ধ করে পেরেক এঁটে দেন। রেঙ্কোজী মন্দিরেও তিনি কাঠের বাক্সটি প্রধান পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রী হায়াশিদা বলেছেন যে, রেঙ্কোজী মন্দির থেকে তিনি একটি "কাঠের বাক্স" (তারও মাপ 8" x 8" x 8") টোকিও নিয়ে যান। শ্রী রামমূর্তি বলেছেন, তিনি একটি পেরেক দিয়ে আঁটা কাঠের বাক্স টোকিও ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে সংগ্রহ করেন এবং রেঙ্কোজী মন্দিরে প্রধান পুরোহিতকে তিনি সমর্পণ করেন। এ গ্রন্থের গ্রন্থকারকে রেঙ্কোজী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছিলেন তিনি একটি কাঠের বাক্সে চিতাভস্ম সংগ্রহ করেন। সুতরাং ক্রিমেটোরিয়াম থেকে রেঙ্কোজী মন্দির পর্যন্ত চিতাভস্ম বরাবর কাঠের বাক্সে ছিল। অথচ চিত্রে দেখছি, হবিবর রহমানের সম্মুখে রক্ষিত আছে একটি চিনেমাটির আর্ন (urn), যার উচ্চতা বা ব্যাস কোনমতেই 8" হবে না। অর্থাৎ যার ভিতর একটি 8" x 8" x 8" মাপের কাঠের বাক্স রাখা যাবে না। এই চিনামাটির 'urn' টি কোথা থেকে আবির্ভূত হল? এর মধ্যে চিতাভস্ম রাখাই বা হল কেমন করে, কখন?

(iii) চিত্রে দেখেছি, আলো এসেছে ডানদিকের খোলা জানলা দিয়ে তির্যক ভাবে। টেবিলের পায়ার ছায়া দেখলেই সেটা বোঝা যায়। টেবিল- চেয়ারের পায়াগুলির অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে, স্বাভাবিক আলোয় যা হওয়া উচিত। ফ্ল্যাশবাল্বের সাহায্যে ফটো তোলা হয়নি, কারণ সে ক্ষেত্রে পায়াগুলির সামনের দিক আলোকিত হত। আলোর গতিপথ অনুযায়ী কর্নেল হবিবর অথবা উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির পোশাকে ছায়াপাত হওয়া উচিত ছিল, তাঁর ডান হাতের নিম্নাংশ, পিঠের দিকে বা পোশাকের খাঁজে খাঁজে কালো রেখা দেখতে পাওয়ার কথা । অনুরূপভাবে আর্ন বা চিনেমাটির গোলাকৃতির ভস্মাধারের অর্ধেক কালো ও অর্ধেক সাদা হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। এ থেকে মনে হয় ফটোর ওপর রি-টাচ করা হয়েছে। ভস্মাধার ও ভদ্রলোকের জামাকাপড়ে সাদা রঙ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই দুটি দ্রব্যকে স্পষ্ট করে তোলা। আসলে ভদ্রলোককে এতে আরও সনাক্তের অতীত করে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া সরকারী রিপোর্টে আদ্যোপান্ত কাপড়ে মোড়া একটি পুঁটলির ছবি ছাপা হয়েছে। তার ক্যাপশন "object covered with a sheet" 'কাপড়ে ঢাকা কোন বস্তু!' এ ছবিটি কেন ছাপা হল — খোদায় মালুম! এটি যে অগ্নিদগ্ধ কোন মৃতদেহের ছবি তা-ও সাহস করে কমিটি বলতে পারেননি! কোন সূত্রে এটি ওঁরা পেয়েছেন তা-ও বলেননি।

6. চিতাভস্ম তাইহকু থেকে টোকিওতে আনয়ন — ছয়ই থেকে আটই সেপ্টেম্বর।

(ক) রেঙ্কোজী মন্দির থেকে জাপানের কিউসু দ্বীপে , টোকিওতে।

" পাঁচই সেপ্টেম্বর একটি প্লেন তাইহকু থেকে জাপানে যাচ্ছিল। তাতে কর্নেল রহমানের যাওয়ার ব্যবস্থা হল। ফরমোসা বাহিনীর স্টাফ অফিসার লেঃ কর্নেল শিবুয়া ঐ প্লেনেই নেতাজীর চিতাভস্মের আধার এবং সম্পদের বাক্সটি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি লেঃ কর্নেল সাকাইকে এ দু'টির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলেন। সাব লেঃ টি. হায়াশিদাও ফরমোসা থেকে ওঁদের সঙ্গে জাপান যাবেন বলে স্থির হল।"(1/45)

(সরকারী রিপোর্টে সম্পদের বাক্সটি কোথা থেকে এল, কোথায় ছিল তার বিবরণ এখনও পাইনি। আরও লক্ষণীয়, রিপোর্টে এই প্রথম 'urn' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে— 'নেতাজীর চিতাভস্মের আধার' (the urn containing the ashes) এবং মূল্যবান দ্রব্যে পূর্ণ বাক্সটি (the box containing the valuables)। কিন্তু ঐ 'urn' শব্দটি পরে সরকারী রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্পটাক্ষরে বলা আছে, " There were in fact two boxes one containing Netaji's ashes, and the other gold and jewellery. THE FIRST BOX WAS 1 FOOT CUBICAL IN SHAPE, and the second box was 3ft x $2^{1}/_{2}$ x 2ft. BOTH WERE OF WOOD." অর্থাৎ "বস্তুত দু'টি বাক্স ছিল — একটিতে ছিল নেতাজীর চিতাভস্ম এবং দ্বিতীয়টিতে স্বর্ণালঙ্কার ও জড়োয়া গহনা। প্রথম বাক্সটি চৌকো এক ফুট মাপের এবং দ্বিতীয়টির মাপ তিন x আড়াই x দুই ফুট। দুটোই কাঠের বাক্স।" (1/46)

(Urn শব্দের আভিধানিক অর্থ " Vessel or vase with foot, usually with rounded body, especially as used for storing ashes of the dead" 'পায়াওয়ালা গোলাকৃতি আধার। চিতাভস্ম রাখার প্রয়োজনে সচরাচর ব্যবহৃত।'

শ্রী শাহ্‌নওয়াজ খান জঙ্গী মানুষ, যোদ্ধা, চতুষ্কোণ কাঠের বাক্সকে যে 'আর্ন' বলা যায় না তা তাঁর জানা নাও থাকতে পারে; কিন্তু রিপোর্টটি রচনা করেছেন শ্রী মৈত্র; তিনি আই. সি. এস.। কীটসের 'ওড টু এ গ্রীশিয়ান আর্ন-'এর বেড়া না ডিঙিয়ে তিনি পরীক্ষা-সমুদ্র পার হননি নিশ্চয়। তা হলে এ ভুল হল কেন? আমার বিশ্বাস, ভুলটা হল ঐ ফটোটির জন্য। সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক ঐ ফটোর ভেল্কি ওঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শ্রী হায়াশিদা তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, "তাইপের সাউথ এরোড্রোমে আমি উপনীত হলাম পাঁচই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটার সময়। ....বিমানবন্দরে লে কর্নেল সাকাই, কর্নেল হবিবর রহমান এবং ফরমোসা বাহিনীর মেজর নাকামিয়ার সাক্ষাৎ পেলাম। লেঃ কর্নেল সাকাই-এর হাত দু'টি তখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা; তিনি কোনও মালপত্র তুলতে পারছিলেন না। দীর্ঘদেহী কর্নেল রহমানকে একেবারে পরিশ্রান্ত বলে মনে হল। তাঁর দেহের একদিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটি হাতও স্লিং থেকে ঝুলছে। মেজর নাকামিয়া মালয়ে যুদ্ধ করছিলেন—তিনি আমার সিনিয়ার ছিলেন এবং তিনি কর্নেল হবিবরের পূর্বপরিচিত বন্ধু। দু'টি বাক্স ছিল—একটিতে ছিল নেতাজীর চিতাভস্ম, সেটি ছোট; দ্বিতীয়টি অত্যন্ত ভারী। একজনের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর নয় । তাতে ছিল স্বর্ণালঙ্কার ও জড়োয়া গহনা। প্রথম বাক্সটি 1' x 1' x 1', দ্বিতীয়টি 3' x 2½ x 2'। দু'টিই পেরেক দিয়ে বন্ধ করা।" (10/119)

কর্নেল হবিবের মতে ওঁরা যে প্লেনে তাইহকু থেকে টোকিও যান সেটি একটি রেড-ক্রস প্লেন। (1/46)

শ্রী হায়াশিদার মতে সেটি একটি জাপানী জঙ্গী যাত্রীবাহী বিমান। (10/22)

শ্রী সাকাইয়ার মতে সেটি একটি বোমারু বিমান — 97 heavy bomber.

যাই হোক, ওঁরা বেলা আড়াইটেয় তাইহকু থেকে রওনা হয়ে জাপান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম দ্বীপে কিউসুর অন্তর্গত ফুকুওকা শহরের বিমানঘাঁটি গান্নোসু (Gannosu)-তে গিয়ে নামলেন বিকেলবেলায়। (5.9.45)

এরপর আবার নানা মুনির নানা মত!

কর্নেল হবিবর বলছেন —"আমরা চারজনে ঐ দু'টি সম্পদ নিয়ে সেই রাত্রেই একটি মালগাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত যাত্রীবাহী কোচে ট্রেনে করে ফুকুওকা থেকে টোকিও-র দিকে রওনা হই এবং ছয় তারিখ সকালে সেখানে পৌঁছাই।"(1/46)

লেঃ কর্নেল সাকাই বলেন, "ফুকুওকাতে পৌঁছে আমাদের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। স্থির হল চারজনের একসঙ্গে যাওয়া ঠিক নয়। এই পরামর্শ অনুসারে কর্নেল রহমান এবং মেজর নাকামিয়া বিমানযোগে টোকিওতে চলে গেলেন। আমি আর হায়াশিদা ট্রেনে করে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গেই ছিল চিতাভস্ম এবং ধনভাণ্ডার । আমাদের সঙ্গে তিনজন বন্দুকধারী সৈনিকও ছিল। এই তিনজন সৈনিককে আমরা স্থানীয় আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমরা ছয় তারিখ সকালে ফুকুওকা থেকে রওনা হই এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় টোকিও পৌঁছাই।"(14/6)

শ্রী হায়াশিদা তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, (তাঁর স্মৃতিচারণে (10/121) ঐ একই কথা বলেছেন) "— আমরা সাবধানতা অবলম্বন করতে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেলাম। কর্নেল রহমান ও মেজর নাকামিয়া বিমানযোগে টোকিও চলে গেলেন। আমি ও কর্নেল

সাকাই একটি ট্রেনে করে রওনা হই। কর্নেল সাকাই ছিলেন ফার্স্ট ক্লাসে। আমি ও তিনজন গার্ড ছিলাম সেকেন্ড ক্লাসে। আমরা ছয়ই বৈকাল তিনটের সময় ফুকুওকা থেকে রওনা হই এবং সাতই সন্ধ্যা ছয়টার সময় টোকিওতে পৌঁছাই!"(10/120-21)

শাহ্নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, "লেঃহায়াশিদার প্রদত্ত সময়ই যুক্তিসঙ্গত। ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের দু'জন অফিসার —মেজর কিনোসিতা এবং লেঃ তাকাকুরার জবানবন্দীর সঙ্গে এটা খাপ খায়। তাঁরা দু'জনেই চিতাভস্ম গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, সময় সম্বন্ধে এই তারতম্যে বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই !" (1/47).

আমরা মনে করি 'তাৎপর্য নেই' শুধু তাঁর কাছে, যিনি 'যেন-তেন প্রকারেণ' জোড়াতালি দিয়ে একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী খাড়া করতে চান। এই পথ কর্নেল হবিবর রহমান মালগাড়িতে গিয়েছিলেন না বিমানে গিয়েছিলেন সেটুকুও তাঁর মনে থাকবে না? কিউসু দ্বীপ থেকে টোকিও ট্রেনে করে যেতে হলে অনেকটা পথ সমুদ্রের নীচে দিয়ে যেতে হয় — সে যাত্রার কথা মানুষে ভুলতে পারে না! ভারতবর্ষে আর পাকিস্তানেই শুধু নয় , সমগ্র এশিয়ায় সমুদ্রের নীচ দিয়ে এমন রেলপথ আর দ্বিতীয় কোথাও নেই। কর্নেল রহমান যদি এ পথ রেলগাড়িতে অতিক্রম করে থাকেন তা'হল মাত্র এগারো বৎসরের নয়, শতায়ু হলেও তিনি তা ভুলতে পারতেন না! কিন্তু কিউসু দ্বীপ থেকে টোকিও ট্রেনযোগে আসতে হলে বর্তমান ট্রেনের টাইম টেবেল্ অনুসারে দ্রুততম এক্সপ্রেস ট্রেনেরও দেখছি অন্তত বিশ ঘণ্টা সময় লাগছে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে কেউ যদি সে পথ বারো ঘণ্টায় মালগাড়িতে অতিক্রম করার কথা বলে থাকেন তবে তাঁর জবানবন্দী ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া উচিত। অন্তত জঙ্গী শাহ্নওয়াজের বদলে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কমিটির চেয়ারম্যান হলে তাই ফেলতেন।

কর্নেল সাকাই একজন জাপানী, তাঁর এ-জাতীয় ভুল হওয়ার কথা নয়। ফুকুওকা থেকে টোকিও যেতে তিনি বলে বসলেন, 'আমরা 6.9.45 তারিখ সকালে ফুকুওকা থেকে রওনা হয়ে ঐ দিন সন্ধ্যায় টোকিও পৌঁছাই। 'একজন উচ্চপদস্থ জাপানী জঙ্গী অফিসারের পক্ষে এ ভ্রান্তি বিস্ময়কর. তবু তাই তিনি বলেছেন।

কিন্তু তাতে শেষ সিদ্ধান্তে আসতে সর্বশ্রী যোদ্ধা শাহ্নওয়াজ এবং আই. সি. এস্ . মৈত্রের কোন অসুবিধা হয়নি। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত, 'সময় সম্বন্ধে এই তারতম্যের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই!'

কারণ বিকল্প সম্ভাবনার কথা তাঁরা ভেবে দেখতে একেবারে গররাজি ,অর্থাৎ রেঙ্কোজী মন্দিরের চিতাভস্ম ওভাবে আদৌ আসেনি তাইহকু থেকে। জাপান সরকারের আদেশে এই কাহিনীটি খাড়া করা হয়েছে এবং তাই বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীতে এত ভূরি ভূরি গলদ! তাঁরা শুনতে রাজি নন, আব্রাহাম লিঙ্কন এর সেই অনবদ্য উক্তিটি—'No man has memory enough to be a successful liar!'

(খ) **টোকিও ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স থেকে রেঙ্কোজী মন্দির:**

(i) এই পর্যায়ের ঘটনাবলী শ্রী হায়াশিদা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন তাঁর বর্তমান বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থে। আমরা সেই গ্রন্থ অবলম্বনে অগ্রসর হতে পারি:

"জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা —জেনারেল ম্যাকআর্থারের জাপানের পদার্পণের সঙ্কটময় মুহূর্তে আমরা (লেখক এবং সাকাই) টোকিওতে এসে উপনীত হলাম। লে: কর্নেল সাকাই এবং আমি নেতাজীর চিতাভস্ম এবং ধনরত্নের আধারটি ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিলাম সাতই সেপ্টেম্বর রাত এগারোটায়। অফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে; ফলে আমরা ডিউটি অফিসার মেজর কিনোসিতাকে আমাদের সম্পদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন পরদিন সকালে সর্বপ্রথমেই তিনি স্টাফ অফিসারকে এই সম্পদ দু'টি সমর্পণ করবেন। পাছে কোন ভুল হয় তাই আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বলে দিলাম যে, ছোট বাক্সটিতে নেতাজীর চিতাভস্ম আছে এবং বড়টিতে আছে ধনরত্ন।

"অবশেষে এই তিনদিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অভিযাত্রার অবসান হল। আমার সহকর্মীরা তখনও ফরমোসায় রয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত মালপত্রও পড়ে আছে ফরমোসাতে। কিন্তু সেখানে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনা এখন নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে জাপানেই থেকে যেতে হল।

'ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে গৃহীত কার্যক্রম:

"বাক্স দু'টি যেহেতু আমরা গভীর রাত্রে গচ্ছিত রেখেছিলাম তাই মেজর কিনোসিতা সে দু'টি রাত্রে নিজের হেপাজতে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরদিন সকালে তিনি ডিউটি অফিসার লে: কর্নেল তাকাকুরার হাতে সমর্পণ করেন। সেদিন (8.9.45) সকালেই লেঃ কর্নেল সাকাই ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে লে: কর্নেল তাকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লে: কর্নেল তাকাকুরা বস্তুত ছিলেন মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স সেকশনের প্রধান। তিনি জানালেন যে, তিনি সকালেই (8.9.45) নেতাজীর চিতাভস্ম ও ধনরত্নের বাক্সটি মেজর কিনোসিতার কাছ থেকে পেয়েছেন। ডিউটি -অফিসার অবশ্য কোন রশিদ দেননি বা নেননি। কোন পাকা খাতায় কিছু লেখেনওনি। লে: কর্নেল তাকাকুরা চিতাভস্মটি গ্রহণ করার পর হেড-কোয়ার্টার্সে সমস্ত অফিসারদের সমবেত করলেন এবং সেই চিতাভস্মের সম্মুখে অভিবাদন জানালেন। তারপর তিনি টোকিওতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডন্স লীগের সভাপতি মি. মূর্তিকে টেলিফোন করলেন। তাঁকে হেড কোয়ার্টার্সে আসতে বললেন, চিতাভস্ম গ্রহণের জন্য। আধঘন্টার মধ্যেই শ্রী মূর্তি এসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রী আইয়ার। শ্রী আইয়ার ইতিমধ্যে টোকিওতে এসে পৌঁছেছিলেন। ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সের প্রধান প্রবেশপথে লে: কর্নেল তাকাকুরা, শ্রী মূর্তি এবং শ্রী আইয়ারের হাতে আটই সেপ্টেম্বর সকালে চিতাভস্ম সমর্পণ

করেন।" (ধনরত্নের বাক্সটি নয়)

শ্রী মূর্তি এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন:

ঘটনাস্থলে লে: কর্নেল তাকাকুরা এবং আরও দু-তিনজন জাপানী অফিসার উপস্থিত ছিলেন। কর্নেল তাকাকুরা বললেন, আর্মি চীফ-অফ-স্টাফ জেনারেল উমেজুর ইচ্ছানুযায়ী তিনি জাপানীদের তরফ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে এই পবিত্র চিতাভস্ম আমাদের হস্তান্তরিত করছেন। ভস্মাধারটি একটি সাদা কাপড়ে জড়ানো ছিল—একটি সেফ্-লকার থেকে বার করে সেটি আমাদের দেওয়া হল। সেটিতে লম্বা ফিতা লাগানো ছিল, যাতে বাহক সেটি গলায় ঝুলিয়ে নিতে পারে। এটি একটি বাক্স — মাপ দু-ফুট। সমবেত সকল মিলিটারি অফিসারই সেটিকে অভিবাদন করল। শ্রী আইয়ার হাত বাড়িয়ে সেটিকে গ্রহণ করলেন। বেশ বোঝা যায়, তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। একটি জঙ্গী সিডান্ বডি গাড়িতে আমাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রী আইয়ার ও আমি — আমার দু'জনে প্রথমে আমার বাড়িতে চলে আসি।"

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে আমি একটি টেলিগ্রাফের কথা শুধু বলব। বস্তুত এটির কথা হয়তো ইতিপূর্বেই আলোচনা করা উচিত ছিল। এই তারবার্তাটি ইঙ্গো-মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী তাইহকুতে তদন্তের সময় উদ্ধার করে—এটির কথা শাহ্নওয়াজ কমিটির রিপোর্টেও স্বীকৃত হয়েছে (1/33) এবং সেই রিপোর্ট থেকে আমি বঙ্গানুবাদ করে দিচ্ছি:

প্রাপক : ও সি কাইকান [অফিসার-কমান্ডিং , হিকারি কাইকান]

প্রেরক : চীফ-অফ-স্টাফ , সাদার্ন আর্মি, স্টাফ II.

সিগন্যাল নং 66, 20.8.1945.

'একান্ত গোপনীয়'

রাজধানীতে যাবার পথে 'T' তাইহকুতে আঠারো তারিখে দুইটার সময় গুরুতরভাবে আহত হন এবং ঐদিন মধ্যরাতে মারা যান। ফরমোসা বাহিনীর একটি বিমানে তাঁর দেহ টোকিওতে পাঠানো হয়েছে।

["To: O. C. KIKAN
From: Chief of Staff, Southern Army, Staff II.
Signal 66, August, 1945
"Top SECRET"
'T', while on his way to the capital, as a result of an accident to his aircraft at TAIHOKU at 14.00 hours on the 18th, was seriously injured and died at midnight on the same date. His body has been flown to TOKYO by the Formosan Army."] (1/33)

যুদ্ধকালে নেতাজীর 'কোড-নেম' বা সঙ্কেত নাম ছিল 'T'। শাহ্‌নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, জাপান সরকারের প্রতিনিধি কর্নেল টাডাকে প্রশ্ন করা হয়, বিশে তারিখে ফরমোসা থেকে কেন জানানো হয়েছিল—নেতাজীর শব ফরমোসা বাহিনীর বিমানো পাঠানো হয়েছে। জবাবে কর্নেল টাডা বলেছিলেন "The Statement' regarding Netaji's death and not his body, was flown to Tokyo." অর্থাৎ "নেতাজীর মৃতদেহ নয়, বলা হয়েছে নেতাজীর 'মৃত্যুবার্তাটি' বিমানযোগে টোকিও পাঠানো হয়েছে।"

আমাদের ইংরেজি জ্ঞান অল্প। শাহ্‌নওয়াজ সাহেবের মতে আমরা পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নই এবং শ্রী মৈত্রের মত আই. সি. এস. পরীক্ষাও পাস করিনি। তাই কোন ছাত্র যদি " His body has been flown to Tokyo by the Formosan Army." এই পঙ্‌ক্তির অনুবাদ করে "নেতাজীর মৃত্যুবার্তাটি বিমানযোগে টোকিওতে পাঠানো হল" তা' হলে পরীক্ষার খাতায় আমরা নম্বর কেটে নিই। 'Body' শব্দের অনুবাদ 'মৃত্যুবার্তা' লিখতে পারে দুজন: হয় সে fool, নয় সে knave; দ্বিতীয়ত, 'মৃত্যুবার্তা' 'has been flown' হতে পারে না। মৃত্যুবার্তা 'বেতারে' যাতায়াত করাই স্বাভাবিক। তৃতীয়ত যদি ধরে নিই তারবার্তায় এ সংবাদ পাঠানোর চেয়ে একটি বিমানেই ফরমোসার চীফ-অফ-স্টাফ সংবাদটি পাঠিয়েছিলেন তা' হল তার জবাব কেমন করে তাঁরা পেলেন সেই দিনই? কমিটিই তো স্বীকার করেছেন, উনিশ তারিখের সকালে টোকিও থেকে একটি তারবার্তায় বলা হয় যে, শবদেহ টেকিওতে পাঠিয়ে দিতে। মধ্যরাত্রের বিমানযোগে কখন বার্তা রওনা হল যাতে পরদিন সকালেই তার জবাব এসে গেল?

এখানে আরও একটি কথা বলব। এই টেলিগ্রাফটির উদ্ধৃতি দিয়ে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি বলেছেন: On being questioned, the discrepancy about the body was sought to be clarified by saying that the statement regarding Netaji's death and not his body, was flown to Tokyo. Col. Tada was specially brought down from Tokyo to Saigon for questioning on this point." (1/33) অর্থাৎ "দেহ সম্বন্ধে এই বিভ্রান্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বিভ্রান্তির নিরসন করা হল এই যুক্তিতে যে, নেতাজীর মৃত্যুবার্তাই বিমানযোগে টোকিওতে প্রেরণ করা হয়েছিল — তাঁর শবদেহ নয়। এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার জন্য কর্নেল টাডাকে টোকিও থেকে সাইগন বিশেষভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল।" এই পঙ্‌ক্তি দুটি কমিটি কর্তৃবাচ্যে রচনা করেননি। পাঠক স্বতই মনে করবেন প্রথম পঙক্তির ক্রিয়াপদ 'জিজ্ঞাসা করা' এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'নিয়ে আসা' ক্রিয়াপদের কর্তা বুঝি শাহ্‌নওয়াজ কমিটি! আমিও প্রথমটা তাই মনে করেছিলাম; কিন্তু খটকা বাধল এ জন্যে যে, কর্নেল টাডা 1956 সালের পূর্বেই মারা গেছেন। লক্ষ্য করে আরও দেখলাম, সাক্ষীর তালিকায়

কর্নেল টাডার নাম নেই। এখন বুঝতে পারছি, 'জিজ্ঞাসা করার' কর্তা কমিটি নন, অন্য কেউ। তাই কর্তৃবাচ্যে এটা লেখা হয়নি। অর্থাৎ এই বিরাট বিভ্রান্তিকর তারবার্তা সম্বন্ধে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি কাউকে কোন প্রশ্ন করেননি এবং তা যে করেননি এটা গোপন করতেই ঐ ভাবে পঙ্‌ক্তি দুটি রচিত হয়েছে। এটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই সাহস পাননি তাঁরা। কারণ এটি ওঁদের সিদ্ধান্তের বিপরীত দিকে নিয়ে যায়। কেন তাই বলছি :

তর্কের খাতিরে ধরে নিন — তাইহকুতে নেতাজীর মৃত্যু একটা মিথ্যা প্রচার। নেতাজী এবং জাপান সরকার সতের বা আঠার তারিখে স্থির করেছিল — তাইহকুতে নেতাজীর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হবে। নেতাজীর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির দাহ-কার্য তাইহকুর মত অখ্যাত স্থানে হলে তা সন্দেহের উদ্রেক করবে। টোকিওতে লক্ষ দর্শকের সম্মুখে দাহকার্য সম্পন্ন হলে কারও কিছু বলার থাকবে না। তাই স্থির হয়েছিল আঠারই তারিখ রাত্রে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এ খবর ফরমোসা থেকে টোকিওতে পাঠানো হলে টোকিও থেকে আদেশ যাবে, 'মহাশব বিমানযোগে টোকিওতে পাঠিয়ে দাও।' সে তারবার্তা পেলেই ফরমোসা থেকে তারবার্তা যাবে, 'মহাশব বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এবং সেই তারবার্তাগুলি ফাইলে এমনভাবে রাখা হবে যাতে ভবিষ্যৎ খানাতল্লাশির সময় সেগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর টোকিও ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে একটি কফিনে কোন গলিত শব (যা তখন টোকিওতে সহজলভ্য) কোন বিখ্যাত ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে দাহ করা হবে। ধরা যাক, এই সূত্র অনুযায়ীই কাজ হচ্ছিল; কিন্তু দিন-দুয়েকের মধ্যে মার্কিন অকুপেশন আর্মি টোকিওতে প্রবেশ করায় টোকিও কর্তৃপক্ষ এ ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি। মার্কিন বাহিনী হয়তো কফিন খুলে দেখতে চাইত। পোস্টমর্টেম করতে চাইত বা অন্যান্য রাসায়নিক রঞ্জন রশ্মির পরীক্ষায় চালাকি ধরে ফেলত। তাই পূর্ব-পরিকল্পনা বদল করে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় টেলিগ্রাফে বলা হল যে, তাইহকুতেই দাহ করা হোক। এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে নানারকম গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল। যেমন, (1) বিশে তারিখের উক্ত টেলিগ্রাফটির কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, (2) শবদাহ তাইহকুতে দাহ হবে বলে কোন পরিকল্পনা না থাকায় জেনারেল আন্ডো বা জেনারেল ইসায়িয়ার উপর নির্দেশ দেওয়া যায়নি যে, বিকল্প ব্যবস্থায় তাঁরা উপস্থিত থেকে খাতাকলমে জাপান সরকারের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাঁরাও এ শব নেতাজীর নয় বলে কোন গুরুত্ব নিজে থেকে দেননি। (3) কবে দাহ হল তা কেউ ঠিকমত বলতে পারছেন না। (4) দাহকার্য থেকে টোকিও পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে নানান বিভ্রান্তি। (5) বরাবর চিতাভস্ম কাঠের চৌকা বাক্সে থাকা সত্ত্বেও আর্নের সম্মুখে হবিবরের ফটো।

আমি আপনাদের কিছুই বিশ্বাস করতে বলছি না। বিকল্প সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলাম মাত্র!

প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করতে পারছি না। এরপর কমিটি যা বলেছেন তার অনুবাদও লিপিবদ্ধ করতে হল, "ভারতবর্ষের ডিরেক্টর অফ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অথবা কান্ডিস্থিত এ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেনের তত্ত্বাবধানে এই সময়েই আর একটি সমান্তরাল তদন্ত কার্য চালানো হয়। কর্নেল এফ. জি. ফিগার্স নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয়ে এই অনুসন্ধান করেন। তিনি ছিলেন টোকিওস্থিত জেনারেল ম্যাকআর্থারের হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে যুক্ত। একজন মার্কিন গোয়েন্দা অফিসার (সুপ্রীম কমান্ডার এ্যালয়েড পাওয়ার্সের হেড-কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যুক্ত) এটি দাখিল করেন। এই সব রিপোর্ট থেকে যে শেষ সিদ্ধান্তে আসা হয় তা হল এই : নেতাজী একটি বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাইপেতে মারা গেছেন।"

আমাদের বক্তব্য এ বিষয়ে এই যে, ভারত সরকারের ব্যয়ে যখন শাহ্‌নওয়াজ কমিটি জাপান-ভ্রমণে গেছেন তখন তাঁরা তাঁদের যে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। গণতান্ত্রিক ভারতের মানুষ হয়ে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে অপরের সিদ্ধান্তকে বিকৃত করার অধিকার কমিটির নেই। মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ যে সিদ্ধান্তে এসেছিল তা আপ্তবাক্যের মত ঘোষণা না করে কমিটির উচিত ছিল তার উদ্ধৃতি দেওয়া। আমরা আমাদের স্বল্প ইংরেজি জ্ঞানে তার অর্থ বুঝে নিতাম। ওঁরা 'body'-র বাংলা 'মৃত্যুবার্তা' ধরে নিতে যখন সক্ষম, তখন ঐসব রিপোর্টেরও অর্থ অন্যরকম বুঝবেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। ইংরেজির অর্থগ্রহণ নিয়েই যখন মতদ্বৈধ তখন ঐ সব রিপোর্টের বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মূল ইংরেজিটুকুও তুলে দিতে বাধ্য হলাম ইংরেজি-অভিজ্ঞ পাঠকের কথা চিন্তা করে।

" American Military Intelligence Depts.
Top Secret
Main file no. 10 Misc, I. N. A. 273
Sub: Subhas Chandra Bose
(Extracts bearing on his alleged death).
Page10-Ref : B2, dated 5.10.1945

" Bose had been trying to persuade the Japanese to allow him to go to Manchuria since October, 44. When he told them that they had no chance of invading India through Burma, and that, therefore, he would prepare to try another road to Delhi via Moscow. Reference should be made to Hikari's telegram at the time Bose arrived in Saigon. Isoda also was there and this fact may be significant that there was a plan on the part of Hikari Kikan to allow Bose to escape and to publish a false story regarding his death. This would have been the ideal time for Isoda

to put into operation any such plan... if they are part of a colossal and well-executed deception manouvre. This file of telegrams among with numerous other documents must have been purposely left for the British to find them. Although at this stage one cannot rule out the possibility of Bose being still alive. This file of telegram contains four and the most important one, which gives an idea of the plan to allow to escape and to publish a false story regarding his death is as follows:

"To O. C. Kikan, From Chief of Southern Staff, II
Signal 66 ...
His body has been flown to Tokyo
by the Formosan Army,"

....

Page 5, No. C-5, Intelligence Bureau
Date 19.5.46:

"Habib-ur-Rahman's report is unsatisfactory. The multitude of discrepancies in account of the actual air crash, as given first to the Combined Intelligence Corps inTokyo and later to CSDIC is being taken up. You will understand our pressing anxiety to get the truth of whether Bose is actually and permanently dead. Govt. wants to know where they stand in the matter in view of the sayings by Gandhi and others in India that he is still alive. Our examination so far only permits us to say, **unless there was a very cleverly contrived and executed deception plot involving a very few of the highest Japanese officers, Bose is almost certainly dead.**"

অর্থাৎ—

"আমেরিকান মিলিটারি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট [চূড়ান্ত গোপনীয়]
প্রধান ফাইল নং 10 বিবিধ, আই. এন. এ. 273
বিষয়: সুভাষচন্দ্র বোস (তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সারাংশ)
পৃষ্ঠা 10: স্মারকচিহ্ন বি২, তাং 5.10.45
"1944 সালের অক্টোবর মাস থেকেই বোস জাপানীদের ওপর চাপ দিচ্ছিল তাকে মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাওয়ার সুবিধা করে দিতে। তখন সে বলেছিল যে, বর্মার ভিতর দিয়ে ভারত অভিযানের সম্ভাবনা আর নেই, সুতরাং সে মস্কোর পথে দিল্লীতে পৌঁছবার একটা বিকল্প প্রচেষ্টা করতে চায়। বোস যে সময় সাইগণ্ডে পৌঁছান সেই সময়ে প্রেরিত হিকারীর তারবার্তা এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ইসোদা স্বয়ং তখন সেখানে উপস্থিত ; এবং একথা মনে

রাখা দরকার যে, হিকারী কাইকানের তরফে একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরী করা হয়েছে, যাতে বোসের পলায়নের আর তার মৃত্যু সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক গল্প প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকেই সে পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রচেষ্টা ইসোদার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক ছিল .... যদি ধরে নেওয়া যায় এটা ওদের তরফে একটা প্রকাণ্ড এবং সুপরিকল্পিত ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়! এই তারবার্তাপূর্ণ ফাইলটি এবং আরও নানান নথিপত্র ইচ্ছে করেই ওরা ফেলে রেখে যায়, যাতে ব্রিটিশরা সেগুলি পরে খুঁজে পায়। যদিও এই পর্যায়ে 'বোস যে এখনও বেঁচে আছে' এই সম্ভাবনাকে নিঃসন্দেহে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবু এই ফাইলের চারটি তারবার্তা --- বিশেষ করে একটি টেলিগ্রাফ আমাদের ধারণা করতে সাহায্য করে --- কিভাবে বোসের পলায়নের আয়োজন হয়েছিল, আর কী ভাবেই বা অলীক কাহিনী প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই টেলিগ্রাফটি নিম্নোক্তরূপ:

"প্রাপক: ও. সি. কাইকান:

প্রেরক: চীফ অফ স্টাফ, সাদার্ন আর্মি, স্টাফ II, সিগন্যাল 66

তাঁর মৃতদেহ ফরমোসা বাহিনীর বিমানে টোকিওতে প্রেরিত হয়েছে।"

" পৃষ্ঠা 5, নং সি- 5 ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, 19.5.46:

"হবিবর রহমানের বিবৃতিটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কম্বাইন্ড ইনটেলিজেন্স কোরের কাছে টোকিওতে এবং পরে সি. এস. ডি. আই. সি.-তে প্রদত্ত বিভিন্ন বিবৃতিতে যে অসঙ্গতিগুলি লক্ষিত হয়েছে সেগুলি পুনর্বিবেচিত হচ্ছে। বোস সত্যি সত্যিই এবং 'চিরতরে'-র জন্য মারা গেছে কিনা এ খবরটা জানতে আমরা কী পরিমাণ আগ্রহী তা নিশ্চয় আপনি অনুমান করেছেন। গান্ধী এবং ভারতবর্ষের আরও অনেকে বলছে যে, বোস এখনও বেঁচে আছে---এক্ষেত্রে গভর্মেন্ট তার সত্যিকারের অবস্থাটা ঠিক মতো বুঝে নিতে চায়। এ-পর্যন্ত যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তাতে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারছি যে **কয়েকজন জাপানীর সহযোগিতায় বোস যদি একটা অত্যন্ত ধূর্ত ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণ না করে থাকে, তা'হলে বলা যায় বোস বোধহয় সত্যি সত্যিই এবার মরেছে।**"

মূল এবং অনুবাদ মিলিয়ে পাঠক দেখবেন যে, আমরা মোটামুটি নিষ্ঠা সহকারে অনুবাদ করেছি। এটা পাঠ করে কমিটি যদি মনে করে থাকেন যে, গোয়েন্দা বিভাগের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নেতাজী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তা'হলে তা আবার আমাদের চারটি বিকল্প সিদ্ধান্তের একটিতে পৌঁছে দেবে:

(i) কমিটি সত্যি সত্যি এ তদন্ত রিপোর্টটি পড়ে দেখেননি। শুধু শেষ পঙক্তিটির শেষ বাক্যাংশটি পাঠ করবার সময় পেয়েছিলেন: "Bose is almost certainly dead." "বোস বোধহয় সত্যি সত্যিই এবার মরেছে।"

(ii) কমিটি জ্ঞাতসারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন—তাঁরা আশা করেছিলেন ঐ দুর্লভ গোয়েন্দা রিপোর্ট কোনদিনই সাধারণ ভারতীয় পাঠকের হাতে পৌঁছবে না।

(iii) কমিটির বিবেচনায় যুক্তি এবং সত্যের কাছে তাঁদের কোন আনুগত্য নেই, তাঁদের আনুগত্য শুধু তদানীন্তন নেহেরু সরকারের ইচ্ছার প্রতি।

(iv) কমিটি দীর্ঘ রিপোর্টের উদ্ধৃত অংশটি পড়েননি—অন্য অংশে বোধ হয় বলা হয়েছে যে, নেতাজীর মৃত।

এই শেষ বিকল্প সম্ভবনাটি কিন্তু শেষপর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। রিপোর্টের কোথাও বলা হয়নি যে, গোয়েন্দা বিভাগ শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন নেতাজীর "সত্যি সত্যি এবং চিরতরে" মৃত্যু হয়েছে। বত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখছি ইনটেলিজেন্স ডিভিশনের ডাবলু ম্যাকরাইট একটি পত্রে মেজর সি. ইয়ংকে লিখেছেন এ বিষয়ে আরও ঘনিষ্ঠ তদন্ত চালাতে এবং ফলাফল জানাতে। চিঠির তারিখ নয়াদিল্লি, 19.2.46– অর্থাৎ তথাকথিত মৃত্যুর ছয়মাস পরে। তিনি কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন, " এখানে বোসের তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে এটুকু বুঝেছি যে, মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না, যতক্ষণ না এ বিষয়ে নানান উল্টোপাল্টা সংবাদগুলির একটি সামঞ্জস্য করা যায়।" দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার SAC কমিশনের ছয়ই নভেম্বর, '45 তারিখের এক নং রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে —'আমরা নিঃসন্দেহ যে, সে (বোস) তার বিপ্লবীদলের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল।' তার আগে করা 18.10.45 তারিখের রিপোর্টে কমিশন বলেছেন যে, জাপানীরা বোসকে আত্মগোপন করতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

এই পত্রটির জবাবে মেজর ইয়ং জানাচ্ছেন (চূড়ান্ত গোপন পত্র নং SLO/CS/1 তাং 1.3.46):

"প্রিয় ম্যাকরাইট,

শবদেহ কিভাবে দাহ করা হল সে বিষয়েও দেখছি নানান সন্দেহ উদ্রিক্ত হবার কারণ রয়েছে। আমরা একটি তারবার্তা উদ্ধার করেছি যাতে বলা হয়েছে তাইহকুতে হাসপাতালে মধ্যরাত্রে বোস মারা গেছে এবং তার শব ফরমোসা বাহিনীর বিমানে টোকিওতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসোদা-ও এ তারবার্তাটি নকল নয় বলে স্বীকার করেছে। ডোমেই এজেন্সির সংবাদ — বোস জাপানের মূল ভূখণ্ডে মারা গেছে; অথচ হবিবর রহমান বলে — তাকে (বোসকে) তাইহকুতেই দাহ করা হয়েছে। এই বিভ্রান্তি গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে সন্দেহের উদ্রেক করে। তা'ছাড়া এটি যদি একটি ষড়যন্ত্রই হয়, তবে বলব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তাকে রূপায়িত করা হয়েছে। উপসংহারে বলব, এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল যে, বোস শেষ পর্যন্ত সাইগণ্ড থেকে একটি বিমানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে এবং তাইহকুতে সম্ভবত একটি বিমানে দুর্ঘটনাও ঘটে। এটা এমন কিছুই অসম্ভব নয় যে, বোস ঐ বিমানু

দুর্ঘটনায় পড়লেও অনাহত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং হয় নিজ চেষ্টায় আত্মগোপন করে অথবা তাকে স্থানীয় জাপানীরা আত্মগোপন করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া অন্য কোন পথে আমি চিন্তা করতে পারছি না --- অন্য কোনও পথে তদন্ত চালানোও নিরর্থক।"

এইসব নথিপত্র দেখে কোন নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীরও বলতে সঙ্কোচ হবে যে, গোয়েন্দা বিভাগ শেষ সিদ্ধান্তে এসেছিল — নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগুলি অবশ্য শাহ্‌নওয়াজ কমিটি যথেচ্ছভাবে নাকচ করেছেন। স্থানে স্থানে, এমনকি, হাস্যকরভাবে। যেমন ধরা যাক, 52 পৃষ্ঠায় কমিটি যেভাবে শ্রী এস. এম. গোস্বামীর যুক্তি নাকচ করেছেন তাতে বোঝা যায় তাঁরা প্রচলিত লজিকের ধার ধারেন না। কমিটি বলেছেন "তৃতীয় সাক্ষী যিনি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি শ্রী এস. এম. গোস্বামী। কমিটির সামনে দু'বার সাক্ষ্য দিতে আসেন। ষোলই জুন তারিখে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য দিতে এলে তিনি বলেন যে, 1953 সালে তিনি গিয়ে দেখেছিলেন ভস্মাধারের গায়ে বাঁকাবাঁকা অক্ষরে (italics) লেখা আছে 'Netaji Subhas Chandra Bose's Ashes'। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ফটোতে ঐকথাগুলি বড়হাতের অক্ষরে NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE লেখা দেখে নাকি অবাক হয়ে যান। তাঁর মতে 1953 সালের পরে গোটা জিনিসটাই বদলে গেছে। আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় পাঁচই জুন, 1956 তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। সেটা মোটেই বাঁকাবাঁকা অক্ষরে নয়, সেটা বড়হাতের অক্ষরে ছাপা।" (1/53)

না! অত তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেলে চলবে না! আপনাদের আমি অনুরোধ করব আরও বার-তিনেক ঐ পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করুন, তারপর বলুন মেজর-জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান এবং এস. এন. মৈত্র, আই. সি. এস., দু'জনে সংযুক্তভাবে সরকারী ব্যয়ে ছাপা রিপোর্টে এখানে কী বলতে চেয়েছেন! শ্রী গোস্বামী বললেন, যে, অমৃতবাজার পত্রিকার ফটোতে তিনি দেখেছেন যে, লেখাটা বড়হাতের— তাই কমিটি নিজেরাই সে ফটোখানি জোগাড় করে দেখলেন—দেখে বুঝলেন যে, শ্রীগোস্বামী ভুল বুঝেছেন—অমৃতবাজারে ছাপা ফটোতে মোটেই বাঁকা হরফে লেখাটি ছাপা হয়নি —সেটা বড়হাতের অক্ষরে ছাপা!

জানি আপনারা কী বলতে চাইছেন —ভাবছেন বোধহয় আমি ইংরেজি রিপোর্ট থেকে অনুবাদ করতে ভুল করেছি। 'Body'র অনুবাদ করেছি 'মৃত্যুবার্তা!' আসুন, মূল ইংরেজিটা তুলে দিচ্ছি:

"Mr. Goswami says that whereas in 1953 he found that the writing on the urn of the words "NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S ASHES " was in italics, he was surprised to find a picture in Amrita

Bazar Patrika, dated the 5th June, 1956, that the writing "NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE" was in block letters. He concluded that the whole thing had been changed since 1953. On looking at the Amrita Bazar Patrika, dated the 5th June, '56 in the picture of the urn appearing on its front page, it is seen that the writing is in block letters....."

একজন মেজর জেনারেল এবং একজন আই. সি. এস. যৌথভাবে এ রিপোর্ট লিখে বৈদেশিক মন্ত্রকে দাখিল করেন। সেই মন্ত্রকের তা-বড় তা-বড় অফিসারবৃন্দ যুক্তিগুলি পরীক্ষা করে তার সারবত্তা প্রণিধান করলেন। অতঃপর পণ্ডিতপ্রবর জওয়াহরলাল নেহেরু সেটি অনুমোদন করলেন। সরকারী ব্যয়ে তা ছাপা হল। প্রচার-বিভাগে বিক্রয়ার্থে তা পাঠানো হল—'নগদ মূল্য এক টাকা!'

না! এ কৌতুকনাট্যের যবনিকা এখনও পড়েনি। কমিটি শুধু ঐটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। ফটো দুটি তাঁদের রিপোর্টে ছাপিয়ে বলেছেন, "The writing on all these photos 'NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE' appears identical. They are in block letters. A copy of the photo submitted by Mr. Ayer and the one taken by the committee are endorsed (Annexure II). It will be seen that Mr. Goswami has made completely erroneous statement."অর্থাৎ

"সবগুলি ফটোতেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস কথাগুলি হুবহু একই ভাবে লেখা। সবগুলিই বড় হাতের ছাপা অক্ষরে। শ্রী আইয়ার যে ফটোটি দিয়েছেন এবং কমিটি যে ফটো তুলেছেন তা এখানে সংযুক্ত করে দেওয়া হল। পাঠক দেখবেন শ্রী গোস্বামী সম্পূর্ণ ভুল বলেছেন।"

[প্রসঙ্গত একটি কৌতুককর সংবাদ পরিবেশন করি: আনন্দবাজার, 17.10.70, নয়াদিল্লি, —"আজ এখানে নেতাজী তদন্ত কমিশনের সামনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রাক্তন সেনাপতি শাহ্নওয়াজ খান নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেন, 'নেতাজী সম্পর্কে আমার তদন্তে কোন ভুল যদি এই কমিশন প্রমাণিত করতে পারেন তা' হলে আপনারা আমায় সর্বজনসমক্ষে ফাঁসি দেবেন।' এ থেকে প্রমাণিত হয় শাহ্নওয়াজ সাহেবের পিনাল কোড সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচুর! কোন অপরাধে ফাঁসি হতে পারে তাও তাঁর জানা আছে!"]

নেহেরু সরকার নির্বাচিত দুই পণ্ডিত এ প্রসঙ্গে অনায়াসে তাই শেষ সিদ্ধান্তে এসেছেন, "After having examined the statements of these witnesses, it is clear that the reasons for doubting that the ashes did not belong to Netaji are either based on insubstantial grounds or on wrong facts and therefore have to be discarded"– অর্থাৎ এই সব সাক্ষীর বক্তব্য পরীক্ষা করে বেশ বোঝা যায় যে চিতাভস্মটি যে নেতাজীর নয় এ আশঙ্কা করার হেতু নেই। এ সন্দেহ

করার পিছনে কোন জোরাল যুক্তি নেই, ভ্রান্ত যুক্তির ওপর সেইগুলি খাড়া করা হয়েছে—ফলে সেগুলি সবই পরিত্যাজ্য।"

কী বললেন? আমি রেঙ্কোজী মন্দিরে গিয়ে ঐ লেখাটি কী বানানে দেখেছিলাম? আজ্ঞে না! আমি রেঙ্কোজীর মন্দিরে কোন লেখা দেখিনি—দেখেছিলাম অন্যত্র; সেখানে বানানটা বদলেছে অন্যস্থানে! আমি দেখেছিলাম NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S ASSES! সুভাষচন্দ্র অবশ্য তাদের পিঠেই গুরুভার চাপাতেন , মস্তিষ্কে নয়! তিনি জানতেন, কাকে দিয়ে কোন কাজ করানো যায়!

আমরা একথা বলতে চাই না যে, শ্রী গোস্বামীর বক্তব্য আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছি—অর্থাৎ রেঙ্কোজী মন্দিরে 1945 সালে তথাকথিত চিতাভস্মটি উপস্থিত করার পর তা বদল করা হয়েছে। এই সম্ভাবনার সপক্ষে শ্রী গোস্বামী একটিমাত্র যুক্তি দেখিয়েছিলেন—বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর মন্দিরে সফরকালে দেখেন লেখাটি বাঁকা হরফে (italics-এ) লেখা ছিল, কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত ফটোতে দেখেন লেখাটি ছাপা হরফে (Block capital-এ) লেখা। প্রথমত শ্রী গোস্বামী যে বাঁকা হরফে বা ইটালিকস্ অক্ষরে ঐ লেখাটি দেখেছিলেন তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষী বা ফটো-জাতীয় প্রমাণ নেই। শ্রী গোস্বামীর মৌখিক বিবৃতিই একমাত্র প্রমাণ। দ্বিতীয়ত একটা কাগজের ওপর আর একটা কাগজ সাঁটা থাকতে পারে। অর্থাৎ শ্রী গোস্বামী যা বলেছেন তা সত্য হলেও মনে করার কোন কারণ নেই যে চিতাভস্মটি বদল করা হয়েছে। তৃতীয়ত ওঠে 'মোটিভ'-এর প্রশ্ন। রেঙ্কোজী মন্দিরে কে কেন এভাবে তথাকথিত চিতাভস্মটি চুরি করতে বা বদল করতে চাইবে? আমাদের প্রশ্ন তা নয়—আমাদের আপত্তি শাহ্নওয়াজ কমিটি এই তিনটি যুক্তির একটিরও অবতারণা করেননি। শ্রী গোস্বামীর অভিযোগ খণ্ডন করতে কমিটি বলেছেন, প্রথমত অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে লেখাটি ছাপা হরফে (যদিও সেকথাই বলেছিলেন শ্রী গোস্বামী।) সুতরাং শ্রী গোস্বামী ভুল বলেছেন। দ্বিতীয়ত অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ফটো এবং ওঁদের তোলা ফটোর লেখা হুবহু এক (identical)। সে কথা সত্য নয়!

শাহ্নওয়াজ কমিটি এরপর বলেছেন (1/35) :

"নেতাজীর এই বিমান দুর্ঘটনাজনিত নিশ্চিত মৃত্যুর বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন এখনও বিশ্বাস করেন যে, তিনি জীবিত। একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দল বিশ্বাস করেন নেতাজী জীবিত, তিনি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে আছেন। কেউ তাঁর সন্ধান জানে না — সময় উপস্থিত হলে তিনি অবির্ভূত হবেন। বসু পরিবারের কয়েকজন এই মতে বিশ্বাসী — এবং শ্রী অরবিন্দ বসু এ দলের প্রধান বক্তা। অপর দল দাবি করেন যে, নেতাজী শুধু যে জীবিত আছেন তাই না, তাঁকে অনেকে দেখেছে, তিনি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশও করেছেন — বিশেষ

করে চীন এবং ভারত-চীন সীমান্তে।'

কমিটি অতঃপর ঐসব বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। সুতরাং ঐ চিন্তাধারার লোকেরা কী বলে, কী তাঁদের যুক্তি এবং কমিটি তাঁদের সন্দেহাতীত স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে কী ভাবে সে যুক্তি খণ্ডন করেছেন তা এবার আমরা একে একে দেখব।

(ক) শ্রী অরবিন্দ বসু: শাহ্নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন,"শ্রী অরবিন্দ বসুর মতে নেতাজী এ জাতীয় পরিকল্পনায় ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তিনি তাঁর শেষ অন্তর্ধান এমনভাবে রূপায়িত করেছিলেন যে, কোন গোয়েন্দাই কোন ছিদ্রপথ খুঁজে পায়নি। জাপান সরকার তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, ফলে তারা বিস্তারিতভাবে একটি কাহিনী তৈরী করেছে— যে কাহিনীকে বিভিন্ন জাপানী সাক্ষী তাঁদের বিবৃতি দিয়ে খাড়া করে রেখেছেন। কর্নেল হবিবর রহমানের সম্বন্ধে শ্রী অরবিন্দ বসুর মত—"তিনি গোপনতার শপথ নিয়েছিলেন, এবং তাঁর আঘাত চিহ্নগুলি জাল।" (1/35)

শাহ্নওয়াজ কমিটি এবার তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন..." এ যেন বড় বেশী অনুমান করা হয়েছে (these are largely presumptions)। আমরা আগেই দেখিয়েছি বিমান দুর্ঘটনাটি যে সত্যি সত্যি হয়েছিল, এবং নেতাজী তাতে মারা গিয়েছিলেন তার স্বপক্ষে যথেষ্ট সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে [পাঠক এগুলির প্রত্যেকটিকে তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখেছেন]। জাপানী এবং অন্যান্য জাতির বিভিন্ন সাক্ষীকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। [কী আশ্চর্য! কারণটা তো এই মাত্র আপনিই বললেন শ্রী অরবিন্দ বসুর যুক্তির কথা বলতে] । ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে মনে হয় কর্নেল রহমানের আঘাত জাল নয় [প্রসঙ্গত আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। ব্যাঙ্ককে নেতাজীর একজন ভক্তকে আমি প্রসঙ্গক্রমে কর্নেল রহমানের আঘাত-চিহ্নের কথা বলেছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তিনি জওয়াহরলাল অথবা গান্ধীজীকে মিথ্যা কথা বলবেন? সেই বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকের দৃপ্ত জবাবটা এখনও কানে বাজছে, তাঁর কোটরগত চক্ষুতে হঠাৎ যেন পঁচিশ বছর আগেকার আগুন আবার হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠেছিল। তিনি জবাবে বলেছিলেন—'না জানে কৈসে হবিবকো চোট লাগা থা ঔর কেঁও উন্হোনে ঝুট বোলা থা! লেকিন সানিয়াল সাব...,' বলেছিলেন — ঘটনাচক্রে সেদিন যদি হবিবের বদলে আমি উপস্থিত থাকতাম, আর নেতাজী যদি আমাকেই বলতেন ফিরে গিয়ে ঐ কথা বলতে, তা' হলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আমিও অনায়াসে আমার দুটি হাত প্রবেশ করিয়ে দিতাম! ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর শুধু গান্ধীজী নন, স্বয়ং পয়গম্বর এসে আমাকে প্রশ্ন করলেও আমি হলপ নিয়ে ঐরকমই জবানবন্দী দিতাম!] যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, কর্নেল রহমানের ওপর গোপনতার নির্দেশ ছিল তবু স্বীকার করতেই হবে অন্যান্য জাপানী সাক্ষীর ওপর কেউ ঐ জাতীয় গোপনতার আদেশ জারী করেনি। [কেমন করে জানলেন?] সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ বসু প্রমুখ এ দলের যুক্তি মানতে পারা যায় না। (1/36)

(খ) শ্রী মুথুরামলিঙ্গম থেবর, এম. এল . এ মাদ্রাজ)

কমিটির সাক্ষী তালিকায় ইনি হচ্ছেন প্রথম সাক্ষী। 4.4.56 তারিখে দিল্লীতে সাক্ষ্যদানকালে তিনি ডা. রাধাবিনেদ পালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন—সেকথা আগেই বলেছি এঁর সম্বন্ধে কমিটি বলেছেন (1/36): "শ্রীথেবর ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে কয়েকটি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, নেতাজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষিত হয়েছে। কমিটি তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর গোপন সংবাদের উৎস প্রকাশ করতে রাজি হলেন না। তিনি বলেছিলেন সর্বপ্রথম তিনি জানতে চান, নেতাজীর নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় আছে কিনা। আমরা ভারত সরকারের কাছে তখন এ-বিষয়ে জানতে চাইলাম [আশ্চর্য! এই প্রাথমিক সংবাদটি তা'হলে কমিটি জিজ্ঞাসিত না হয়ে জানবার চেষ্টা করেননি?] এবং জবাবে যখন শ্রী থেবরকে জানলাম যে ভারত সরকারের কাছে ঐ রকম কোন তালিকা নাই, তখনও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। [না হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? কারণ ভারত সরকারের জবাবে বোঝা গেল যে, বিজয়ীপক্ষ ইঙ্গো-মার্কিন ব্লক তাঁদের যুদ্ধাপরাধীদের কোন তালিকা ভারতেকে আদৌ দেয়নি! ভারত সরকারের জবাবে একথা বোঝা যায় না যে, যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেতাজীর নাম নেই।] একাধিকবার শ্রী থেবর তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে, তিনি একটি রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত (ফরওয়ার্ড ব্লক)। সুতরাং তাঁর প্রতিটি বাক্য ও আচরণ সেই রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। তিনি প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি যে জবাব দিলেন সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, —তিনি বললেন, 'এটা একটা সরকারী অনুসন্ধান কমিটি, সেটা ছিল পাবলিক-অ্যাফেয়ার (জনসাধারণের ব্যাপার)।' যে ব্যক্তি জনসাধারণের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণ বা সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতির সঙ্গে সরকারী তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া জবানবন্দীর সামঞ্জস্য বিধান করতে অক্ষম তাঁর বক্তব্যকে কোন গুরুত্ব দেওয়াই নিষ্প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।"

[চেয়ারম্যান শাহ্‌নওয়াজ খানের দৃষ্টি এই প্রসঙ্গে অপর একটি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত সংবাদ প্রতি আর্কষণ করা বোধ হয় প্রয়োজন:]

আনন্দবাজার পত্রিকা, পঁচিশে জানুয়ারি, 1951—"নেতাজীর জন্মদিনে লক্ষাধিক জনসমাবেশ তুমুল বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ্ এবং নেতাজী জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন করিতে উঠিয়া মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান বলেন—'আগামী বৎসর যখন তাঁহারা নেতাজীর ছাপান্নতম জন্মোৎসব করিবেন, তখন তিনি স্বয়ং তাহাদের মাঝে একান্তভাবে থাকিবেন বলিয়া আশা রাখেন।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 1951 সালে শাহনওয়াজ স্বয়ং প্রচার করেছিলেন যে, নেতাজী জীবিত এবং আগামী বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হবেন। সে সময় মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ ছিলেন সুভাষদরদী একজন জননেতা। পরে তিনি কংগ্রেস টিকিটে সংসদের সভ্য হন এবং নেহেরুজীর সরকার তাঁকে

পালামেন্ট-সেক্রেটারি পদে চাকরি দেন। রিপোর্ট প্রকাশের পর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব পান!

(গ) শ্রী এস. এম. গোস্বামী:

ইনি নেতাজী রহস্যের উপর 65 পৃষ্ঠার একটি চাঞ্চল্যকর পুস্তিকা লিখেছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তাতে তথ্য ও প্রমাণ খুব কিছু নেই; কিন্তু বহু প্রশ্নবোধক চিহ্নের মাধ্যমে অনেক ইঙ্গিত আছে। তথ্য পরিবেশনও এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তা যাচাই করা শক্ত। যেমন, পৃষ্ঠা ছয়-এ একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক বলেছেন, "নেতাজীকে হয়তো তিব্বতের পথে ভারতে প্রবেশ করতে দেখা যেতে পারে। [ইন্ডিয়ান লাইফ, 29শে, 1949]" এখন এই তথ্যটি যাচাই করতে হলে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান লাইফ পত্রিকায় সত্যই ঐ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানতে হলে আপনাকে 1949 সালের কতগুলি কাগজ ঘাঁটতে হবে, বিবেচনা করে দেখুন। শ্রী গোস্বামী অ্যান্টি-কোরাপশন বিভাগের পদস্থ অফিসার ছিলেন, তথ্য কিভাবে পরিবেশন করতে হয় তা তাঁর না জানার কথা নয়। ফলে এ পুস্তিকাটির যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া যাচ্ছে না। প্রসঙ্গত এই পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় একটি বিজ্ঞাপন আছে "Author's next, EVEREST, IS IT CONQUERED ?-- Sensational revelation of Hunt's Himalayan Hoax" অর্থাৎ "লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ—'এভারেস্ট কি সত্যই বিজিত? —হান্টের হিমালয়াস্তিক মিথ্যার বিষয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ!" এ বিজ্ঞাপনটি দেখে মনে হয়, লেখক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনে দক্ষ! এই পুস্তিকার বত্রিশ পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে একটি ফটো ছাপা হয়েছে, যার দ্বিতীয় সারিতে বাম দিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তিকে অনেকটা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত দেখতে, শ্রী গোস্বামী তাঁর সাক্ষ্যদানকালে নাকি কমিটিকে বলেছিলেন, ঐ ফটো হয়তো নেতাজীর। কমিটি পিকিংস্থিত ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরকে ফটোটির অনুলিপি পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা তদন্ত করে জানান যে, ঐ ভদ্রলোক মি. লী-কে-হাঙ্ নামে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

(ঘ) শ্রী এ. কে. গুপ্ত হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক: এঁর সম্বন্ধে কমিটি বলেছেন, "শ্রী গুপ্ত বলেন যে, 1951 সালে ওঁদের পার্বত্য-অঞ্চলে সফরের সময় তাঁর সঙ্গে নাগা নেতা মিস্টার ফিজোর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শ্রী ফিজো তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার পূর্বেই তিনি সংবাদ পান যে, এ জাতীয় একটি অলীক কাহিনী প্রচার করা হবে। শ্রী গুপ্তের এই অভিজ্ঞতার কথা 1.5.51 তারিখে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীগুপ্ত যখন মিশমি পাহাড়ে ঘুরছিলেন তখন কয়েকজন মিশ্‌মি দলপতি তাঁকে জানায় যে, ইতিপূর্বেই তাদের কয়েকেজনকে চীনা অফিসারেরা সীমান্তের ওপারে একজন ভারতীয়ের কাছে নিয়ে যায়। তারা যাঁকে দেখে আসে তাঁকে দেখতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত। শ্রী গুপ্ত স্বীকার করেন, ঐ মিশ্‌মি দলপতিরা ইতিপূর্বে নেতাজীকে দেখেনি এবং তাদের কাহিনী যে সত্য এ কথার প্রমাণ

আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝে এমন কথা শোনা যায় যে, নেতাজী চীনাদের বাহিনীতে আছেন অথবা তিনি বিদ্রোহী নাগাদলে আছেন, কিংবা একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করে নেতাজী একদিন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হবেন। এইসব কথার জবাবে নেতাজীর সেই অনবদ্য উদ্ধৃতিটিই শোনাব—যেটি তিনি চৌঠা জুলাই, 1943 সালে সিঙ্গাপুরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—" এমনকি আমার শত্রুরাও সাহস করে বলবে না যে, আমি আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি।"

[শ্রী এ. কে. গুপ্তের পরিবেশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে আমরা জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারি না, তবে এই প্রসঙ্গের উপসংহারে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি যে কথাটি বললেন তার অর্থ কিন্তু আমাদের বোধগম্য হল না। আমাদের তো মনে হয় এ উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক। 1943 সালে নেতাজী এ উক্তিটি কেন করেছিলেন? করেছিলেন এ জন্যে যে, তদানীন্তন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতারা —জওয়াহরলাল, আজাদ, রাজাগোপালাচারী প্রমুখ নেতার দল তখন বলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে থেকে যদি একটি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তদানীন্তন ভারত সরকারকে আক্রমণ করেন তবে তিনি ভুল করবেন। তাই সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তদানীন্তন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও তাঁর সে কাজ দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে করা হবে না। এবার আসুন। 1956 সালে। যখন মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ এ উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, তখন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীথেবর বা সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা হয়তো মনে করতেন, সুভাষচন্দ্র ঠিক অনুরূপভাবে ভারতের বাইরে থেকে একটি সশস্ত্র বাহিনীর পুরোভাগে আবির্ভূত হবেন, তদানীন্তন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দুঃশাসক গোষ্ঠীকে গদিচ্যুত করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর সে কাজ ভারত শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে গেলেও তা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে না। তাঁদের সে ধারণা ঠিক হোক আর ভুল হোক, ঐ উদ্ধৃতিটি তাঁরাই দিতে অধিকারী — শ্রী শাহ্‌নওয়াজ নন। শ্রী শাহ্‌নওয়াজের পক্ষে এ উদ্ধৃতি শুধু অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। উদ্ধৃতিটি বস্তুত তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি!]

✡ ✡ ✡

নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে ক্রমানুসারে সকল তথ্যই আমরা আলোচনা করেছি। সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে করছি, কারণ এগুলিও প্রকৃত সত্য ঘটনার ওপর হয়তো আলোকপাত করবে।

(1) নেতাজীর যে ঘড়িটি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে তার সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য।

(2) নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা মারা যান তাঁদের সম্বন্ধে কী জানা যায়?

(3) যে-সব সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়নি তাঁরা কী বলেছিলেন?

(4) শাহ্‌নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এবং সংবাদপত্রের বিবৃতিতে (অমৃতবাজার পত্রিকা, 9.8.56) শ্রীসুরেশচন্দ্র স্বাক্ষরিত যে দলিলটির কথা বলা হয়েছে তাতে কী ছিল?

(5) নেতাজীর সঙ্গে দুটি বাক্সে যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ছিল তা কোথায় গেল?

এগুলি আমরা এবার একে একে আলোচনা করব:

1. নেতাজীর হাতঘড়ি

অনুসন্ধান কমিটি টোকিও থেকে ছয়ই জুন, 1956 সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। পরদিন কমিটি স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়িতে তদন্ত করতে যান। সেখানে শরৎচন্দ্রের পুত্র শ্রী অমিয় বসু (সাক্ষী নং 24) কমিটিকে দু'টি হাতঘড়ি দেখান। একটি চতুষ্কোণ, দ্বিতীয়টি গোলাকার। শ্রী বসু বলেন ঐ চতুষ্কোণ হাতঘড়িটি জওয়াহরলাল এনে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে। জওয়াহরলাল এটি পেয়েছিলেন আজাদ্ হিন্দ্ মামলার কৌঁসুলি ভুলাভাই দেশাই-এর কাছ থেকে। এটি মামলায় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। জানা যায় ভুলাভাই এটি পেয়েছিলেন শাহ্‌নওয়াজ খান মারফৎ কর্নেল হবিবর রহমানের কাছ থেকে। তাইহকু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নাকি নেতাজীর দেহান্ত ঘটলে এই চতুষ্কোণ হাতঘড়িটি কর্নেল রহমানের হাতে দেন। শ্রী অমিয়নাথ বসু যখন এই হাতঘড়িটি কমিটিকে দেখাচ্ছিলেন তখন শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, নেতাজীর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অমিয়নাথ বসু সেই সময় নেতাজীর দুটি আলোকচিত্র কমিটিকে দেখান। তাতে দেখা যায়, নেতাজীর হাতে যে ঘড়ি পরা আছে তা গোলাকার। অনুসন্ধান কমিটির তিনজন সদস্য সমেত সে সময় সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই স্বীকার করে নেন, যে, ফটোতে দৃষ্ট গোলাকার ঘড়িটি এবং অমিয়নাথ কর্তৃক দাখিল করা গোলাকার ঘড়িটি অভিন্ন। একমাত্র শ্রী শাহ্‌নওয়াজ স্বীকার করতে পারলেন না সে কথা। শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু তখন বলেছিলেন এই ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করে ফেলতে। সে সময় কমিটির শ্রুতিধরও (স্টেনোগ্রাফার) উপস্থিত ছিলেন— ফলে অমিয়নাথ প্রদর্শিত ঘড়ি ও ফটোর কথা, শ্রী শাহ্‌নওয়াজ ছাড়া সকলের স্বীকৃতি এবং শ্রী শাহ্‌নওয়াজের অস্বীকৃতি নথি হিসাবে লিপিবদ্ধ করায় কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু চেয়ারম্যান শ্রী শাহ্‌নওয়াজ এই তথ্য লিপিবদ্ধ করতে আপত্তি করেন। কেন তিনি অনুসন্ধান কার্যের পরম্পরা বা Inquiry Proceedings লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন না তাও জানাতে অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের নির্দেশই শেষ কথা। ফলে এ রেকর্ড রাখা হল না। শ্রী অমিয়নাথ বসু অবশ্য পরদিন সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে এ ঘটনার কথা দেশবাসীকে জানান; তিনি চেয়ারম্যানের এই জাতীয় স্বেচ্ছাচারিতায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। (2/35)

পরদিন নয়ই জুন কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে আসেন নেতাজীর অপর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (সাক্ষী নং 22)। পূর্বদিন তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং সেই দিনকার সকালের সংবাদপত্রে শ্রীঅমিয়নাথের বিবৃতিও নিশ্চয় তিনি দেখে থাকবেন। ফলে

দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমেই ঐ ঘড়ির প্রসঙ্গে এলেন। চেয়ারম্যান তৎক্ষণাৎ সাক্ষীকে থামিয়ে দেন। সুরেশচন্দ্র লিখেছেন —

"চেয়ারম্যান তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন নেতাজীর এ ঘড়িটি সম্বন্ধে শ্রী এস. এম. গোস্বামী, সাক্ষী নং 16, ইতিপূর্বেই আলোচনা করে গেছেন, সুতরাং সে বিষয়ে পুনরায় আলোচনা আর হতে পারবে না। সাক্ষী এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁর জবানবন্দী চালিয়ে যাবার দাবি জানান। তখন আমাদের সহযোগী শ্রী এস. এন. মৈত্র চেয়ারম্যান সাহেবকে মদৎ দিতে আগিয়ে আসেন এবং ছোট ছেলেকে যে-ভাবে বোঝানো হয়, সেই ভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, কোন সাক্ষী যদি বলেন যে, দেওয়ালের হুক থেকে তিনি একটা লাল রঙের শার্ট ঝুলতে দেখেছেন, তাহলে অপর সাক্ষীর বলতে কোন বাধা নেই যে, শার্টটি লাল রঙের নয়, সবুজ রঙের এবং তৃতীয় আর একজন অনায়াসে বলতে পারেন যে, শার্টটি ছিল সাদা রঙের। সুতরাং বর্তমান সাক্ষীর পক্ষে হাতঘড়ি সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু জানা আছে তা বলতে বাধা নেই।"

সুরেশচন্দ্র সক্ষেদে বলেছেন —

"আমার মনে হয়, বিচার বিভাগীয় তদন্তের ইতিহাসে এটি একটি অশ্রুতপূর্ব ঘটনা এবং এ থেকেই প্রমাণ চেয়ারম্যান সাহেব অনুসন্ধান কী-ভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।" (2/17)

সে যাই হোক, আমরা বরং এই চতুষ্কোণ ঘড়িটি সম্বন্ধে আর কী জানা যায় তা খুঁজে দেখি। কর্নেল হবিবর রহমান (সাক্ষী নং 4) তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে, হাসপাতালের ডাক্তার টি. যোশীমি তাঁকে এই হাতঘড়িটি দিয়েছিলেন নেতাজী মারা যাবার পর, মৃতদেহ কফিনে নেবার আগে। তিনি সেটি নিয়ে আসেন এবং লালাকেল্লায় বিচার চলা কালে সেটি শ্রী শাহ্‌নওয়াজ খান মারফত কৌঁসুলি স্বর্গত ভুলাভাই দেশাইকে দেন। বিচার অন্তে ভুলাভাই সে গচ্ছিত সম্পত্তি জওয়াহরলালকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং শেষ পর্যন্ত সেটি শরৎচন্দ্র বসুকে দেওয়া হয়। ডাক্তার যোশীমিকে (সাক্ষী নং 48) যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন যে, তিনি কর্নেল রহমানকে কোন হাতঘড়ি দিয়েছিলেন বলেন আদৌ স্মরণ করতে পারেন না.। শ্রী অরবিন্দ বসু নাকি তাঁর সাক্ষ্যদান কালে চেয়ারম্যান শ্রী শাহ্‌নওয়াজ খানকে নেতাজীর পনের-বিশখানি ফটো দেখিয়ে বলেন, 'লক্ষ্য করে দেখুন , প্রত্যেকটি ঘড়িই গোলাকার।' পূর্ব -এশিয়ায় নেতাজীর যত ফটো তোলা হয়েছে তার ভিতর একটি মাত্র ফটো তিনি চেয়ারম্যানকে দেখাতে বলেন, যাতে তাঁর হাতে চতুষ্কোণ ঘড়ি দেখা যাবে! এ চ্যালেঞ্জের উত্তর শ্রী শাহ্‌নওয়াজ কিভাবে দিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই, তবে এ বিষয়ে তিনি রিপোর্ট লিখেছেন, "কর্নেল হবিবর রহমান যে ঘড়িটি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটির সম্পর্কে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। ঘড়িটি পণ্ডিত জওয়াহররলাল নেহেরু নেতাজীর অগ্রজ স্বর্গীয় শ্রী শরৎচন্দ্র বসুকে

দিয়েছিলেন। এটি চতুষ্কোণ হাতঘড়ি। কর্নেল হবিবর রহমানের বক্তব্য এটি হাসপাতালের ডাক্তার যোশীমি তাঁকে দিয়েছিলেন. বলেছিলেন এটি নেতাজীর। কিন্তু ডাঃ যোশীমি বলেন, ঘড়িটির সম্বন্ধে তাঁর কিছুই মনে পড়ে না। নেতাজীর যে সমস্ত ছবি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশতেই দেখা যায়, তাঁর হাতে গোলাকার ঘড়ি। তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য কুন্দন সিংও বলেছে, তিনি সচরাচর যে ঘড়িটি পরতেন তা গোল-আকারের। । অপরপক্ষে একথাও সত্য যে নেতাজীর সঙ্গে যে ব্যাগ ছিল তাতে অনেকগুলি হাতঘড়িও ছিল, এবং তার মধ্যে চতুষ্কোণ ঘড়িও ছিল। এগুলি নেতাজী বিভিন্ন সূত্রে উপহার পেয়েছিলেন। তাইহকু বিমানক্ষেত্র থেকে উদ্ধার পাওয়া কিছু মূল্যবান দ্রব্য বর্তমানে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে সংরক্ষিত আছে। সেগুলি কমিটি পরীক্ষা করে দেখেছেন — তার ভিতর ভগ্নাবস্থায় কতকগুলি চতুষ্কোণ ঘড়িও ছিল। যাই হোক, ঘড়ি নিয়ে এই যে বিতর্ক এর কোন সমাধান আমরা খুঁজে পাইনি।'(1/32)

এবার আমরা প্রাপ্ত-সংবাদের মাধ্যমে বিষয়টা বিচার করে দেখি:

(ক) আশ্চর্যের কথা , একটা বিষয় শাহ্‌নওয়াজ কমিটি অথবা সুরেশচন্দ্র কেউই আলোচনা করেননি দেখছি। বিমান দুর্ঘটনায় আহত কোন আরোহীর মৃত্যু হলে তাঁর হাতে ভগ্নাবস্থায় যে ঘড়িটি পাওয়া যাবে তাতে দুর্ঘটনার অভ্রান্ত সময় লক্ষিত হওয়া উচিত! কারণ প্রথমত বিমান আরোহীর হাতের ঘড়ি দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তে নিশ্চয় চালু ছিল। দ্বিতীয়ত দুর্ঘটনায় যে প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগবে তাতে ঘড়ির স্প্রিং বা অন্যান্য অংশ ভেঙে যাবে। ঘড়ির কাঁটা দুটি যদি ভেঙে না যায় তবে ঐ প্রচণ্ড ধাক্কাটি ঠিক কখন লেগেছিল তা সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে।

ধরা যাক, ঐ চতুষ্কোণ হাতঘড়িটি দুর্ঘটনার মুহূর্তে নেতাজীর হাতে ছিল। তা হলে ঘড়িতে ঠিক দুটো আটত্রিশ বেজে থাকা উচিত। কিন্তু তা নেই। ঘড়িটি বন্ধ হয়েছে একটা বেজে ছয় মিনিটে। যে-হেতু আমরা ধরে নিয়েছি ঘড়িটি নেতাজীর হাতেই পরা ছিল, ফলে আমাদের এই অভ্রান্ত তথ্য থেকে নিম্নলিখিত বিকল্প সিদ্ধান্তের একটিকে মেনে নিতেই হবে :

(i) দুর্ঘটনার পর আরও প্রায় সাড়ে দশ ঘণ্টা ঘড়িটি চলেছিল তারপর বন্ধ হয়ে যায়। (ঘড়িটির অবস্থা প্রমাণ করে তা একান্ত অসম্ভব!)

(ii) নেতাজী হাতঘড়িতে দম দিতে ভুলেছিলেন — দুর্ঘটনার দেড় ঘণ্টা আগে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। (অসম্ভব! তখন প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, নেতাজী নিশ্চয় বারে বারে সময় দেখছিলেন। দেড় ঘণ্টা আগে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর খেয়াল হত, দম দিয়ে তিনি ঘড়িটি চালাতেন।)

(iii) নেতাজী পূর্বরাত্রে নাকি তুরেনে (দ্রাঘিমাংশ 108° পূ) ছিলেন তাই পূর্বরাত্রে তাঁর ঘড়ি সম্ভবত তুরানের সময় দিচ্ছিল। পরদিন দ্বিপ্রহরে তাইহকুতে (দ্রাঘিমাংশ

122° পূ) তিনি যদি ঘড়ির কাঁটা না ঘুরিয়ে থাকেন তবে তাঁর ঘড়ি সূর্যোদয় অনুপাতে ছাপ্পান্ন মিনিট পেছিয়ে যাবে। ফলে বেলা 2.38 মিনিটে দুর্ঘটনা ঘটলে তাঁর ঘড়িতে দেখা যাবে দুটো বাজতে আঠারো মিনিট। আমি যতদূর জেনেছি, যুদ্ধকালে তুরেন এবং তাইহকুতে একই সময় মেনে চলা হত— তবে একথা হলপ করে বলতে পারি না। যুদ্ধকালীন নথিপত্র থেকে এ হিসাব বার করা খুব শক্ত নয় নিশ্চয়। তাছাড়া বিমানযাত্রায় অভ্যস্ত নেতাজী নিশ্চয়ই স্থানীয় সময় রাখতে ঘড়ির কাঁটা ঘোরাবেন। ফলে নেতাজীর ঘড়িতে বেলা একটা ছয় মিনিট বেজে থাকার কোনও যুক্তিসম্মত কারণ নেই।

অর্থাৎ আমাদের যা প্রতিজ্ঞা (hypothesis) তা ধোপে টিকছে না। ভাষান্তরে, হাতঘড়িটি দুর্ঘটনার সময়ে নেতাজীর হাতে ছিল না।

(খ) শ্রী শাহ্‌নওয়াজ তাঁর রিপোর্টে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হয়তো ঘড়িটি নেতাজীর হাতে বাঁধা ছিল না। তাঁর সঙ্গে যে সুটকেস ছিল তার ভিতরেই ঐটি ছিল এবং সেই কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়িটি দুর্ঘটনার পরে কর্নেল রহমানকে দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত যুক্তি এ সম্ভাবনাকে অপ্রমাণ করে:

(i) কর্নেল রহমান বলেছেন, নেতাজীর মৃত্যুর পরে হাসপাতালের ডাক্তার যোশীমি সেটা তাঁকে দেন। যদিও অবশ্য ডা: যোশীমি বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছুই মনে পড়ে না। ধরা যাক —(ক) দীর্ঘ এগারো বৎসর পরে ডা: যোশীমি ভুলে গেছেন একথা। তিনি সত্যিই ঘড়িটি মৃত রুগীর হাত থেকে খুলে আইনমাফিক তাঁর নিকটতম আত্মীয়ের হাতে দিয়েছিলেন, অথবা (খ) কর্নেল রহমানের ঠিক মনে নেই, আসলে তাঁকে ঘড়িটি দিয়েছিলেন অপর ডাক্তারবাবু, অর্থাৎ ডাক্তার সুরিতা (তাঁকে বোধহয় এ বিষয়ে আদৌ প্রশ্নই করা হয়নি)। দুটি বিকল্প সম্ভাবনাকে এক সূত্রে গেঁথে আমরা আপাতত ধরে নিই— ঘড়িটি কর্নেল রহমানকে হাসপাতালের কোন কর্তৃপক্ষ দেন।

এ কথা ধরে নিলে তৎক্ষণাৎ মেনে নিতে হবে যে, আহত রুগীদের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত জিনিসই শুধু দিতে পারেন ডাক্তারবাবুরা। কারণ শাহ্‌নওয়াজ কমিটির মতে নেতাজীর জিনিসপত্র কুড়িয়ে আদৌ হাসপাতালে আনা হয়নি—তা ছিল মিলিটারি হেপাজতে। ফলে সে জিনিস ডাক্তারবাবুদের হাতে কোনভাবেই পৌঁছতে পারে না।

সিদ্ধান্ত: যে কোন ডাক্তারবাবুর হাত থেকে যদি কর্নেল রহমান ঐ চতুষ্কোণ ঘড়িটি পেয়ে থাকেন তবে তা নেতাজীর হাতে-পরা হাতঘড়ি ছাড়া হতে পারে না।

যেহেতু পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এ ঘড়ি নেতাজীর হাতে ছিল না, ফলে কর্নেল রহমান ভুল বলেছেন —ঘড়িটি তাঁকে হাসপাতালের কেউ দেয়নি।

(ii) এবার মনে করা যাক, কর্নেল রহমান ঘটনাটা ভুলে গেছেন। আসলে তাঁকে হাসপাতালের কোন কর্তাব্যক্তি ঘড়িটি আদৌ দেননি। তবে তাইহকুতে থাকতে কোন জাপানী অফিসার সেটি তাকে দিয়েছিলেন। যেহেতু ঐ অফিসার হাসপাতালের কেউ নন,

ফলে তিনি জঙ্গী অফিসার।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, কর্নেল রহমানের জবানবন্দী অনুসারে এ সম্ভাবনাকেও ধরে নিতে পারছি না আমরা। কর্নেল রহমান দৃঢ়স্বরে বলেছেন, তাইহকুতে অবস্থানকালে তিনি নেতাজীর ধনসম্পদ — যা নাকি কুড়িয়ে এনে মিলিটারির হেপাজতে রাখা হয়েছিল — তার কিছুই গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয় — তিনি নাকি চর্মচক্ষে তা দেখেনওনি। ফলে 'কর্নেল হবিবর রহমান নেতাজীর হাতে পরা ঘড়িটি আনেননি, এনেছেন বিমান থেকে ছিটকে-পড়া নেতাজীর সুটকেসের একটি ঘড়ি— এ কথাও তাই মেনে নেওয়া চলে না। নেতাজীর যে সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল তা নাকি কর্নেল রহমান স্পর্শ মাত্র করেননি। তা প্রথমে ছিল মিলিটারির হেপাজতে, পরে রেঙ্কোজীর মন্দিরে , তারপর শ্রী হায়াশিদা ও কর্নেল সাকাই কর্তৃক বাহিত হয়ে টোকিওতে, সেখান থেকে শ্রী রামমূর্তির হেপাজতে।

জানি না, আপনারা শ্রী শাহ্‌নওয়াজের শেষ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন কিনা যে—" The point about the watch remains inconclusive."

ঐ বিচিত্রঘড়ির অদ্ভুত আবির্ভাব এবং তৎসংক্রান্ত তথ্য কি শাহ্‌নওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তের বিপরীত দিকে কিছু একটা ইঙ্গিত করে না?

2. নেতাজীর সহযাত্রী যাঁরা মারা গেছেন :

ইতিপূর্বেই বলেছি তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজীর যে কয়জন সহযাত্রী নিখোঁজ হন বা মারা যান, ঘটনাচক্রে ঠিক ঐ কয়জন সহযাত্রীকে পেলেই তাঁর পক্ষে মাঞ্চুরিয়া চলে যাওয়া সম্ভবপর হত। যাঁরা জীবিত থাকলেন তাঁদের কাউকেই নেতাজীর প্রয়োজন হত না মাঞ্চুরিয়ায় যাওয়ার জন্য, অথবা সেখানে পৌঁছে মাঞ্চুরিয়াস্থ রাশিয়ান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। এটা তো নিতান্ত কাকতালীয় যোগাযোগ। এখন আমরা দেখতে চাইছি ঐ কয়জন মৃত বা নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কতদূর কী জানা যাচ্ছে। আমি যাবতীয় নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাশ করে যেটুকু জেনেছি তার চুম্বকসার এখানে দিলাম।

(ক) মেজর তাকিজাওয়া ও আইওগি :

শাহ্‌নওয়াজ কমিটির মতে তাকিজাওয়া ছিলেন চীফ-পাইলট (1/15)। মেজর কোনোর জবানবন্দী অনুসারে 'মেজর তাকিজাওয়া যে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিলেন সেটাই এসে তাঁর কপালে ও মুখে আঘাত করে, তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান' (1/15)। গ্রাউন্ড এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামাতো দৃঢ়স্বরে বলেন যে, পাইলট তাকিজাওয়া এবং কো-পাইলট আইওগি বিমান থেকে আদৌ বার হতে পারেনি। জেনারেল শীদেয়ীর সঙ্গে তাঁরা প্লেনের ভিতরেই জীবন্ত দগ্ধ হন (1/23)। তিনি (নাকামুরা) তাঁদের দেহাবশেষ বাক্সে ভরে নেন।

যদিও অনুসন্ধান কমিটি বলেছেন যে, মেজর তাকিজাওয়া-ই ছিলেন চীফ পাইলট,

কিন্তু শ্রী হায়াশিদা তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন, মেজর তাকিজাওয়া বস্তুত ছিলেন কো-পাইলট — তিনি জাপানে বদলির আদেশ পেয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন (10/109)। শ্রী হায়াশিদার অনুসন্ধান অনুযায়ী ওয়ারেন্ট-অফিসার তৃতীয় বিমানবাহিনীর বৈমানিক — যাঁকে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি বলেছেন কো-পাইলট — তিনিই ছিলেন এ বিমানের চীফ পাইলট। যাই হোক, ঐ দু'জনেই বিমানের ভিতর প্রচণ্ড আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন অথবা মারা যান। বিমানের সঙ্গেই তাঁরা অগ্নিদগ্ধ হন। (10/133)।

অথচ হাসপাতালের দু'জন ডাক্তার, যোশীমি এবং সুরুতা দৃঢ়স্বরে বলেন যে, কো-পাইলট (অর্থাৎ শ্রী হায়াশিদার মতে, যিনি পাইলট) হাসপাতালে নীত হন। তাঁর চিকিৎসা করা হয় এবং তিনি পরে মারা যান।

দোভাষী শ্রী নাকামুরার জবানবন্দি অনুসারে বিমান-চালককে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়।

হাসপাতালের রেকর্ডে এঁদের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়নি।

(খ) রেডিও-অপারেটর—এন. সি. ও. তোমিনাগা এবং গান অপারেটার — 'যথানাম' এন. সি. ও. :

অনুসন্ধান কমিটি এঁদের সম্বন্ধে এক কথায় সেরেছেন। বলেছেন "From all this it would appear that General Shidei died instantaneously. One or two others also died with him, but it is not certain who they were. Most likely Major Takizawa, Chief Pilot, was one of them."

"— এই তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায় যে, জেনারেল শীদেয়ী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরও দু'একজন ঐ সঙ্গে মারা যান — কিন্তু তাঁরা ঠিক কে কে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। খুব সম্ভব চীফ পাইলট মেজর তাকিজাওয়া তাঁদের মধ্যে একজন।"

এঁদের সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। এঁদের আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা, ঠিকানা কী, কিছুই জানা যায়নি।

(গ) লেফটানেন্ট জেনারেল শীদেয়ী — চীফ অফ স্টাফ, বর্মাবাহিনী : ইনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ জঙ্গী অফিসার। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষায় তাঁর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মাঞ্চুরিয়ার বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন অথরিটি। শাহ্‌নওয়াজ কমিটির মতে তিনি বিমানের ভিতরেই মারা যান। মেজর নাগাতোমো তাঁর জবানবন্দীতে বলেন যে, তাঁরা যখন নেতাজীর চিতাভস্ম তাইহকুর রেঙ্কোজী মন্দিরে রাখতে যান তখন সেই মন্দিরে তাঁরা অপর একটি ভস্মাধার দেখেছিলেন — মন্দিরের পুরোহিত বলেছিলেন যে, সেটি শীদেয়ীর চিতাভস্ম (2/142)।

আগেই বলেছি, বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সরকারীভাবে জাপান কোন অনুসন্ধান করেনি।

লে. জেনারেল শীদেয়ীর চাকরি জীবনের রেকর্ড নিম্নোক্তরূপ :

সাব-লেফটানেন্ট ক্যাভালরি রূপে নিয়োগ	...পঁচিশে ডিসেম্বর	1915
মেজর জেনারেল পদে উন্নীত	...পয়লা অগাস্ট,	1940
লে. জেনারেল পদে উন্নীত	...সাতাশে অক্টোবর,	1943
বর্মায় অবস্থিত সমগ্র জাপানী বাহিনীর চীফ-অফ-স্টাফ পদে বৃত	...তেইশে মে,	1945
ফরমোসায় যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু	...আঠারই অগাস্ট,	1945

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর জাপান বাহিনীতে চাকরি করেছেন, ধাপে ধাপে অতি উচ্চপদে উন্নীত হন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় প্রাণ দেন।

আরও জানা গেছে যে, তাঁর তথাকথিত মৃত্যুর পরে সমর দপ্তর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর মরণোত্তর প্রমোশন-সুপারিশ করেন। কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। সুপারিশ পত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ :

RYU-SEN-MAN N0.483, August 4, 1947.

প্রাপক : ডিমোবিলাইজেশন এজেন্সির প্রেসিডেন্ট।

প্রেরক : কোরিয়ান এবং মাঞ্চুরিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেকশনের চীফ। প্রথম ডিমোবিলাইজেশন ব্যুরো, ডিমোবিলাইজেশন এজেন্সী।

[বিষয়: যুদ্ধরত অবস্থায় মৃতের জন্য মরণোত্তর সম্মানের সুপারিশ]

যেহেতু নিম্নলিখিত ব্যক্তির বিষয়টি ICHIFUKU-এর 26th আর্টিকেলের পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুসারে (নং 744, 1946 সালের) বিবেচনাযোগ্য তাই আপনার বিবেচনার জন্য তাঁর মরণোত্তর সম্মানের সুপারিশ করা হচ্ছে:

মৃত্যুর তারিখ ..... আঠারই অগাস্ট 1945
মৃত্যুর কারণ .... যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু
মৃত্যুর স্থান তাইহকু বিমানবন্দর
অবস্থান .... মাঞ্চুরিয়ার মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সের সহিত যুক্ত
মিলিটারি র‍্যাঙ্ক .... লেফ্‌টানেন্ট জেনারেল
নাম সুনামাসা শীদেয়ী
জন্ম তারিখ .... সাতাশে জানুয়ারি, 1895
স্থানীয় ঠিকানা .... চব্বিশ নং ওক্-ওনোই-চো,
ইয়ামাশিনা-যুশি.
হিপাশিরা মা-কু,
কিয়োতো, জাপান।

এই সংকলিত সংবাদের ওপর আমরা এবার আলোচনা করতে পারি:

(i) যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত সৈনিকের (বিশেষ করে অতি উচ্চপদস্থ জঙ্গী অফিসারের) জন্য যদি মরণোত্তর সম্মানের সুপারিশ করা হয় তা'হলে বিশেষ হেতু ছাড়া তা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। বস্তুত সুপারিশের পর ঊর্ধ্বতন অফিস শুধু একটি ছাপ মেরে সই দিয়ে থাকেন (মৃত শহীদের ক্ষেত্রে)। যদি কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে সমর দপ্তরের সুপারিশ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখান করেন তবে বুঝতে হবে তার পিছনে কোন গোপন হেতু আছে— এমন তথ্য যা নিম্নতম অফিস জানেন না, যা অত্যন্ত গোপন কারণ। বর্তমান ক্ষেত্রে লে. জেনারেল শীদেয়ীর চাকরিজীবন দেখছি সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি জঙ্গী অফিসাররূপে কাজ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে সেবা করেছেন, তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে জাপান-বাহিনীতে কাজ করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয়, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ষোলো মাস পূর্বেই তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধে জাপান যোগদান করার দু'বছর পরে লেফটানেন্ট জেনারেল পদে তাঁর প্রমোশন হয় 1943 সালের অক্টোবরে। তারপর দু'বছর তাঁর আর কোন প্রমোশন হয়নি, যদিও তিনি বর্মাস্থিত সমগ্র জাপানী বাহিনীর চীফ-অফ-স্টাফ পদ অলঙ্কৃত করেন। এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই রকম একজন জঙ্গী অফিসারের প্রোজ্জ্বল রেকর্ড উপেক্ষা করে যদি তাঁকে মরণোত্তর সম্মান দিতে অস্বীকার করেন তখন আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? স্বতই মনে হয় না কি যে, কর্তৃপক্ষ জানতেন খাতা কলমে লে. জেনারেলকে মৃত বলে দেখানো হলেও আসলে তাঁকে মরণোত্তর সম্মান জানানোতে কোন একটা গোপন বাধা আছে?

(ii) জেনারেল শীদেয়ীর বাড়ির ঠিকানা দেওয়া আছে ঐ সুপারিশপত্রে। কমিটি নেতাজীর সহযাত্রী ঐ সম্মানিত জঙ্গী অফিসারের বাড়িতে গিয়ে কেন তাঁর পরিবারবর্গের কাছে ভারতবর্ষের তরফ থেকে সমবেদনা জানালেন না, তা বোঝা যায় না। তা'হলে আমরা জানতে পারতাম লে. জেনারেল শীদেয়ীর পরিবারে কে কে আছেন। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাঁর স্ত্রী-পুত্রে বর্তেছে কিনা — তাঁর কোন সমাধি আছে কিনা — জাপান সরকার এই শহীদের প্রতি মরণোত্তর সম্মান জানাতে অস্বীকার করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ কিনা! বস্তুত 'নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রতিষ্ঠা করার' উদ্দেশ্য ছাড়া সত্যিই নেতাজীর মৃত্যুরহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্য যদি কমিটির থাকত, তা'হলে এতবড় একটি সূত্রকে ওঁরা এভাবে উপেক্ষা করতেন না! লে. জে. শীদেয়ীর সরকারী মৃত্যুর সংবাদ সত্ত্বেও মানুষ শীদেয়ীর মৃত্যু তাঁর পরিবারের লোকেরা কী ভাবে গ্রহণ করেছে তা অনুসন্ধান করে দেখতেন। শ্রী হায়াশিদার স্মৃতিকথায় তিনি কোথাও বলেননি যে, তাইহকু থেকে নেতাজীর চিতাভস্মের সঙ্গে লে. জেনারেল শীদেয়ীর চিতাভস্মও তিনি টোকিওতে নিয়ে আসেন। শহীদ শীদেয়ীর চিতাভস্মের বিষয়ে জাপানী অফিসারবৃন্দ এবং সুরেশচন্দ্র-সহ অনুসন্ধান কমিটি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব!

(iii) আরও একটি কথা। জাপান আত্মসমর্পণ করেছে 15.8.45 তারিখে। সুতরাং 18.8.45 তারিখে বিমান দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে তাকে 'যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু' বলা চলে কী? অবশ্য খাতা-কলমে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও অনেককে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে—যাদের আঘাত আগেই লেগেছে; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নতুন আঘাতেও। এরিক মারিয়া রেমার্কের নায়কও পশ্চিম রণাঙ্গণে মৃত্যুবরণ করে যুদ্ধ শেষ হবার পরে। এঁদের কি "যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যু" বলা হয়? জঙ্গী-কানুনের এ বিষয়ে কী নির্দেশ জানি না।

3. স্বতঃপ্রণোদিত সাক্ষী :

শ্রীসুরেশচন্দ্র তাঁর মতান্তরের রিপোর্টে অভিযোগ করেছেন (2/12) যে, চেয়ারম্যান শুধু সেইসব সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন যাঁরা তার মত—অর্থাৎ নেতাজীর মৃত্যুবিষয়ের মত — সমর্থন করেন। কমিটি টোকিওতে উপনীত হবার পূর্বেই সেখানকার সংবাদপত্রে নেতাজীর মৃত্যু অথবা বিমান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁদের কিছু জানা আছে তাঁদের সাক্ষী দিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সুরেশচন্দ্র বলছেন, এই বিজ্ঞপ্তি দেখে অনেক লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষ্য দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দরখাস্ত করেন। কমিটি সেই দরখাস্তগুলি দেখে সকলকেই সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান; কিন্তু মাত্র তিনজনের সাক্ষ্য গ্রহণের পরেই চেয়ারম্যান এ জাতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ বন্ধ করে দেন। অতঃপর সাক্ষীদের আর কমিটি সরাসরি আমন্ত্রণ করেননি। জাপ-সরকার মাধ্যমে তাঁরা এসেছেন। জাপানের বহির্দেশীয় মন্ত্রক তারপর সাক্ষীদের একে একে পাঠাতেন এবং তাঁদের জবানবন্দী নেওয়া হত।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, জাপান ইতিপূর্বেই সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে, বিমান দুর্ঘটনায় 18.8.45 তারিখে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে, তাইহকুতে তাঁর দাহকার্য হয়েছে এবং রেঙ্কোজী মন্দিরে তাঁর চিতাভস্ম রাখা আছে। সেজন্যই এতদিন জাপ-সরকার এ-বিষয়ে কোন তদন্ত করেনি বা করবে না। ফলে তদন্ত কমিটি যদি সত্যই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে ইচ্ছুক হতেন, তাহলে তাঁদের উচিত ছিল সাক্ষীদের সরাসরি আমন্ত্রণ করা। জাপানে বহির্দেশীয় মন্ত্রকের মাধ্যমে সাক্ষীদের আহ্বান করা যে সুযুক্তিপ্রসূত হয়নি একথা শিশুও বুঝবে। তা সে যাই হোক, ঐ প্রথম তিনজন সাক্ষী — যাঁরা জাপান-সরকারের মাধ্যমে আসেননি — সরাসরি এসে কমিটির কাছে জবানবন্দী দিয়ে যান, তাঁরা কে কী বলেছিলেন এবার তা জানা যাক। এ বিষয়ে কমিটির রিপোর্টে বিশেষ কিছু বলা হয়নি, যদিও সাক্ষীর তালিকায় এঁদের নাম স্বীকার করা হয়েছে। সুরেশচন্দ্র পরিবেশিত সংবাদে এই তিনজন সাক্ষীর বিষয়ে যেটুকু জেনেছি এবার তা বলি :

(i) শ্রী সাতো কাজো (সাক্ষী নং 40, টোকিও, 16.5.56) :

শ্রী সাতো ছিলেন একজন বম্বার মেকানিক। তাইহকু বিমান পোতাশ্রয়ে 18.8.45 তারিখে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন 136 নং এয়ার-য়ুনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রী সাতো বলেন, ঘটনার দিন সকাল সাতটার সময় (বেলা আড়াইটায় নয়) একটি সামান্য বিমান দুর্ঘটনা ঘটে (minor plane accident)। বিমান থেকে প্রথমে লাফ দিয়ে নেমে আসেন একজন বিদেশী (non-Japanese); তাঁকে দেখতে ঠিক নেতাজী চন্দ্র বোসের মত। দ্বিতীয় যাত্রীকে টেনে বার করা হয়, তিনি একজন জাপানী অফিসার। শ্রী সাতোকে তখন কেউ বলেন যে, ঐ বিদেশীটি হচ্ছেন আসলে নেতাজী চন্দ্র বোস। শ্রী সাতোর মতে কয়েকজন জাপানী অফিসারও বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন— তাঁদের মধ্যে কেউ আহত বা অগ্নিদগ্ধ হননি— তাঁরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রী এইচ. কে. রায়ও (সাক্ষী নং 14, গোয়েন্দা হিসাবে যিনি ব্রিটিশ-ভারতের তরফে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে তদন্ত করেন) বলেছেন, তাইহকুতে 18.8.45 তারিখ সকালের দিকে একটি সামান্য বিমান-দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা গেছে।

শ্রী সাতোর জবানবন্দী সম্বন্ধে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি সম্পূর্ণ নীরব।

(ii) শ্রী এস. এন. সেন (সাক্ষী নং 49, টোকিও, বাইশে এবং তেইশে মে, 1956):

শ্রী সেন পূর্ববতী বিশ বছর ধরে জাপানে ছিলেন। তিনি নেতাজীকে চিনতেন এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সাক্ষী দিতে আসেন, এবং তাঁর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হোক বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, যে বিমানটি তাইহকুতে দুর্ঘটনায় পড়ে, নেতাজী তাতে ছিলেন না। সুরেশচন্দ্র বলেছেন (2/12), 'এ কথা শুনেই চেয়ারম্যান বলেন, পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকা হোক।'

শ্রী সেনের সাক্ষ্য কমিটির সরকারী রিপোর্টে স্থান পায়নি।

(ii) মিস্টার এম. মিৎসুই (সাক্ষী নং 59, টোকিও, 1.6.56):

ইনি ছিলেন তাইহকুর সেই হাসপাতালের একজন মেডিকেল অর্ডারলি। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, 1945 সালের অগাস্ট মাসে তিনি ঐ হাসপাতালে কাজ করতেন। চন্দ্র বোসের নাম তিনি জানতেন; কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় উক্ত চন্দ্র বোস যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, বা তিনি সেখানে মারা যান, অথবা তাঁর মৃতদেহ যে দু'দুদিন হাসপাতালে ছিল — এসব কোন কথাই তিনি জানতেন না। চেয়ারম্যানের প্রশ্নে মিৎসুই বলেন যে, কফিনে আবদ্ধ একটি মৃতদেহ তিনি অপর চারজন বাহকের সাহায্যে একটি ট্রাকে তুলে দেন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু সেটি কার মৃতদেহ তা তিনি জানতেন না। এঁর সম্বন্ধে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি অবশ্য একটি লাইনে লিখেছেন, One Kazo Mitsui, a medical orderly at that time at the Manmon Military Hospital, came of his own, and gave evidence and said that he had helped the doctor attending on Netaji by bringing medicines etc." অর্থাৎ "কাজো মিৎসুই নামে একজন মেডিকেল অর্ডারলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষী দিতে আসেন। তিনি

ঐ সময়ে নান্‌মন জঙ্গী হাসপাতালে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, যে ডাক্তার নেতাজীর চিকিৎসা করেছিলেন তিনি তাঁকে সাহায্য করেন — ঔষধ প্রভৃতি এনে দেন।"

এ ক্ষেত্রে কমিটি জ্ঞাতসারে একটি অন্যায় করেছেন। সাক্ষীর জবানবন্দি direct speech of narration-এ বলা উচিত ছিল, কারণ সাক্ষী যদি বলে থাকেন যে, নেতাজী ঐ হাসপাতালে চিকিৎসারত ছিলেন কিনা তাই তিনি জানেন না, তখন তাঁর বক্তব্য নিশ্চয় ছিল "and said that he had helped the doctor attending on patients by bringing medicines etc." অর্থাৎ "তিনি বলেন, যে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন তিনি তাঁকে সাহায্য করেন— ঔষধ প্রভৃতি এনে দিয়ে।" শাহ্‌নওয়াজ জঙ্গী মানুষ— direct narration-কে indirect speech of narration-এ রূপান্তরিত তাঁকে হয়তো ইস্কুলে করতে হয়নি, কিন্তু আই. সি. এস. মৈত্র মহাশয় এ ভুলটা করলেন কেন?

(iv) শ্রী বোন্দাই মোরি (Mr. Bondai Mori):

ইনি একজন জাপানী। খনির মালিক। ইনি স্বতঃপ্রণোদিতে হয়ে নেতাজীর বিষয়ে কিছু বলতে আসেন! চেয়ারম্যান তার পূর্বেই সম্ভবত স্থির করেছিলেন যে, জাপান সরকারের মাধ্যমে ছাড়া কারও জবানবন্দি নেবেন না। যে কারণেই হোক, তিনি এই খনি-মালিকের জবানবন্দি নিতে অস্বীকার করেন। তার ফলে শ্রী মোরি ক্ষুব্ধ হয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন—বলেন, নিরপেক্ষ তদন্তে এভাবে তাঁকে সাক্ষী দিতে না দেওয়া কমিটির অন্যায় হয়েছে। তাঁর বিবৃতি, এমনকি, কলকাতার দৈনিক পত্রগুলিতে (13.5.56) প্রকাশিত হয়েছিল।

4. শ্রীসুরেশচন্দ্র স্বাক্ষরিত সেই মারাত্মক দলিলটিতে কী ছিল?

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, অমৃতবাজার পত্রিকায় 9.8.56 তারিখে খবর বেরিয়েছিল, "জানা গেল তৃতীয় সদস্য হয়তো বিশেষ কারণে সই দিতে অস্বীকার করতে পারেন। তা হোক, কমিটির কাছে তাঁর স্বাক্ষরিত এমন একটি দলিল আছে যাতে তিনি স্বীকার করেছেন যে, নেতাজীর মৃত্যুসম্বন্ধে তিনিও একমত।" অবশ্য প্রধানমন্ত্রী পরে বলেছিলেন, এ তথ্য সরকারী ঘোষণা নয়, কোনও বুদ্ধিমান সাংবাদিকের 'স্কুপ' করা খবর কিন্তু এ তথ্য শাহ্‌নওয়াজ কমিটি তাঁদের রিপোর্টে পুনরায় ছাপিয়ে স্বীকার করেছেন যে, 'বুদ্ধিমান' সাংবাদিকটি ওঁদের মনের কথাই প্রকাশ করেছিলেন। কমিটি বলেছেন, "অতঃপর কমিটির সভ্যগণ সমস্ত বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু সমেত সকল সদস্য যে মূল সিদ্ধান্তে এসেছেন তার পয়েন্টগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় ত্রিশে জুন, 1956 তারিখে। তিনজন সদস্যই এই কাগজটির নিচে সই দেন। সেই অনুষঙ্গ 1-এ এখানে যুক্ত করা হল। এই কাগজে দেখা যাবে তিনজন সদস্যই একমত হয়েছেন যে, "ফরমোসা অন্তর্গত তাইহকুতে একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটে, নেতাজী

সেই দুর্ঘটনায় মারা যান, তাঁকে সেখানে দাহ করা হয় এবং টোকিওর রেঙ্কোজী মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম খুব সম্ভবত তাঁরই। তারপর থেকে, কী কারণে তা তিনিই জানেন, শ্রীবসু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন; এই রিপোর্ট তৈরি হবার পর তাতে স্বাক্ষর দিচ্ছেন না।''

এই প্রাথমিক রিপোর্টটি আমরা পড়ে দেখেছি। তা পুনরায় এখানে ছাপা সম্পূর্ণ নিরর্থক, কারণ ঐ পয়েন্টগুলি অবলম্বনে তিনজন সদস্য কীভাবে শেষসিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা আমরা জেনেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা কী সিদ্ধান্তে আসার পথ খুঁজছিলেন তার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই। এই দলিলটির উল্লেখ তবু করতে হচ্ছে এই কারণে যে, শাহ্‌নওয়াজ কমিটি একটি মারাত্মক ইঙ্গিত করেছেন, বলতে চেয়েছেন যেন শ্রীসুরেশচন্দ্র প্রাথমিক অবস্থায় নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল — তিনি সেই মর্মে একটি কাগজে স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন এবং পরে 'কী কারণে তা তিনিই জানেন' একটি মতান্তরের রিপোর্ট লেখেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে ঐ প্রাথমিক রিপোর্টের একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি — বস্তুত শেষ পঙ্‌ক্তিটি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এই তিনজনের স্বাক্ষরিত কাগজটির শেষ পঙ্‌ক্তি হচ্ছে : 'Shri Thevar's statements and the statements of Shri Goswami should be discussed while dealing with Netaji's death or otherwise and a little more in detail separately later on." আমরা ঐ পঙক্তিটিরই অর্থ এভাবে বুঝেছি, "সর্বশ্রী থেবর এবং গোস্বামীর জবানবন্দীগুলি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে, যখন নেতাজীর মৃত্যু হয়েছিল কিনা বিচার করা হবে।" Netaji's death or ortherwise শব্দের অর্থ ঐ রকমেই হবে না কি? তার মানে, নেতাজীর মৃত্যু ঐ পর্যায়ে নিরঙ্কুশভাবে সদস্যদলের কেউ মেনে নেননি। নিলে "or ortherwise" শব্দ দুটির ব্যাখ্যা হয় না। ঐ " or otherwise" শব্দ দুটি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, প্রাথমিক পর্যায়েও স্বাক্ষরকারীরা নেতাজীর মৃত্যু চূড়ান্তভাবে মেনে নেননি। এই কাগজখানিকে 'ট্র্যাম্প কার্ড'-রূপে ব্যবহার করার চেষ্টা হাস্যকর। শাহ্‌নওয়াজের তরফে না হলেও মৈত্রমশায়ের পক্ষে!

5. **নেতাজীর সঙ্গে যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ছিল তার পরিণতি:**

এবার আমরা দেখব, নেতাজীর সঙ্গে যে অতুল সম্পদরাশি ছিল তার কী হল। নেতাজীর অন্তর্ধান অপেক্ষা ঐ অতুল ধন-সম্পদের অন্তর্ধান কম বিস্ময়ের, কম রহস্যজনক নয়। আর এ কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, নেতাজীর মৃত্যু অথবা অন্তর্ধানের সঙ্গে এই বিপুল সম্পদের অন্তর্ধান অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নয়। দুর্ভাগ্যবশত নেতাজীর রহস্য নিয়ে তবু লোকদেখানো তদন্ত হয়েছে; কিন্তু নেতাজীর এই অন্তর্হিত ধনরাশির বিষয়ে বস্তুত কোন তদন্তই হয়নি। এই পর্যায়ে আমরা শ্রী শাহ্‌নওয়াজ ও শ্রীমৈত্রকে ধন্যবাদ দেব, যে ভারত সরকারের টার্মস্-অফ-রেফারেন্সে এই প্রাসঙ্গিক

বিষয়টির কোন উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নজরে যেটুকুই এসেছে তাঁরা তা একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে যুক্ত করেছেন। বস্তুত সেইটুকুই আমাদের হাতে ট্যাক্স-পেয়ারের পয়সায় ওঁদের বিদেশভ্রমণে আমাদের নগদ লাভ। শ্রী সুরেশচন্দ্র তাঁর রিপোর্টে এ বিষয়ে কেন আলোচনা করলেন না তাও আমরা বুঝতে পারি না। তিনিও নিশ্চয় এ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী গোস্বামী কতকগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য এবং কতকগুলি চিহ্ন রেখেই ক্ষান্ত হয়েছেন। শ্রী হায়াশিদা অবশ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কিন্তু তিনি বস্তুত শাহ্‌নওয়াজ কমিটির পরিবেশিত তথ্যের ওপরেই তাঁর বক্তব্যকে সাজিয়েছেন।

এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা আগে পেশ করি। জাপানে অভারতীয় সুভাষদরদীদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, তাঁরা জাপসরকার পরিবেশিত তথ্য-অনুসারে সর্বান্তঃকরণে নেতাজীর মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন। রেঙ্কোজী মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম যে নেতাজীরই এ সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত সন্দেহ থাকলেও তা তাঁরা আমার কাছে প্রকাশ করেননি। তাঁদের বরং অভিযোগ, কেন নেতাজীর এই লুণ্ঠিত সম্পদ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ এমন উদাসীন, নির্লিপ্ত। একজন বিশিষ্ট এবং অতিপ্রবীণ সুভষদরদী আমাকে স্পষ্টভাবে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন — 'সময়ে যদি আপনারা তদন্ত করতেন, তা হলে ঐ লুণ্ঠিত সম্পদের অনেকখানিই উদ্ধার করতে পারতেন। বর্মা ও মালয়প্রবাসী ভারতীয়রাই এ সম্পদ নেতাজীকে দিয়েছিল — এ ভারতের সম্পদ; এবং আমি জানি, আপনারা তখন সন্ধান করলে অনায়াসে তার একটা বিরাট অংশ উদ্ধার করতে পারতেন।'

তিনি বিশেষ করে একজন ভারতীয়ের নাম উল্লেখ করলেন, যিনি একটি জাপানী মেয়েকে বিবাহ করেছেন, যুদ্ধান্তে জাপানে ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ভারতে আছেন। তিনি নাকি পুনরায় জাপানে যাবার ভিসা চেয়ে তা পাননি। তাঁর অভিযোগ, উচ্চতম ভারতীয় মহল এ সব কথাই জানেন।

যা প্রমাণ করতে পারব না তা বলে কোন লাভ নেই। আমি বরং **'সম্পদ'** এই শিরোনামায় শাহ্‌নওয়াজ কমিটি যা আমাদের জানিয়েছিলেন তা নিবেদন করি:

(i) 'যদিও কমিটিকে ভারত সরকার যে তদন্ত করতে বলেছেন তার ভিতর নেতাজীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ধনসম্পদের উল্লেখ নেই, তবু আমরা জানতে চাই একাধিক সাক্ষী তাঁদের জবানবন্দীতে সে সম্পদের উল্লেখ করেছেন। সত্য কথা বলতে কি, নেতাজীর এই সম্পদের কী হল, সে সম্বন্ধে জাপানীদের অদম্য কৌতূহল দেখা গেছে — সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীই সে আগ্রহের প্রমাণ। জনসাধারণ এ বিষয়ে কৌতূহলী বলে মনে করায় কমিটি স্থির করেছেন তাঁদের হাতে যে-সকল নথিপত্র এসেছে তা এই রিপোর্টে প্রকাশ করাই উচিত।

(ii) নেতাজী সর্বদা চাইতেন যে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী পরিচালনার জন্য অর্থসাহায্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রাই করবে, এ-বিষয়ে সহযোগী জাপানের কাছে তিনি হাত পাততে অনিচ্ছুক ছিলেন। এজন্য নেতাজী স্বয়ং চাঁদা সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সহকারীরা নিয়মিতভাবে নানা সূত্রে অর্থসংগ্রহ করতেন। ফলে প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হয়েছিল। (অন্য সূত্র থেকে আমরা জেনেছি সর্বমোট প্রায় বাইশ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।) 'নেতাজী ফান্ড কমিটি' নামে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছিল — অর্থসচিবের অধীনে সেই কমিটি কাজ করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়রা অকৃপণ হস্তে স্বর্ণালঙ্কার এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য এতে দান করেছেন। 1945 সালে নেতাজীর জন্মদিবসে তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। শুধু নগদ টাকা আর স্বর্ণালঙ্কারই নয়, স্থাবর সম্পত্তিও দান করা হত। একসময় একটি চিনি কলের স্বত্ব পর্যন্ত নেতাজী ফান্ডে দান করা হয়, বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতি তো অনেকবারই দেওয়া হয়েছে। রেঙ্গুনে হবিব সাহেব একবার তাঁর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি নেতাজীকে দান করেন — জমিজমা, নগদ ও অলঙ্কারে মিলিয়ে সে সম্পত্তির মূল্য এক কোটি তিন লক্ষ টাকা। তার বদলে তিনি নেতাজীর কাছে এক জোড়া খাকি প্যান্ট ও শার্ট চেয়ে নেন, যাতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ করতে পারেন। শুধু হবিবভাই একাই নন, আদমজী করিমও এ ভাবে তাঁদের যাবতীয়-স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আজাদ হিন্দ্ ফান্ডে দান করে 'সেবক-ই-ভারত' খেতাবে ভূষিত হন। একজন পাঞ্জাবী অজ্ঞাতনামা শিখ ভদ্রলোকও তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে নেতাজীর গলার একটি ফুলের মালা নিলামে ক্রয় করেন। এসব তথ্য বিস্তারিতভাবে আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'আমি নেতাজীকে দেখেছি'-তে আলোচিত হয়েছে।

আজাদ হিন্দ্ সরকারের অর্থ জমা থাকত আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কে। রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এবং পরবর্তী পদযাত্রায় নগদ অর্থ নেতাজী কত নিয়ে যাচ্ছিলেন তা জানা যায়নি। (সম্ভবত রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কিছুই নিয়ে যাননি—সে পথের অনেকটাই তিনি পদব্রজে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে মালপত্র বেশি ছিল না—যা কিছু তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন, মনে হয় তা সিঙ্গাপুর থেকে।) শ্রীদেবনাথ দাশ বলেন, রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি প্রায় এক কোটি টাকার মত সম্পদ — স্বর্ণালঙ্কারে এবং সোনার বারে — সঙ্গে নিয়ে যান। এ সম্পদ তিনি রেঙ্গুনস্থ আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সতেরটি ছোট ছোট বাক্সে সঙ্গে নেন। (আমার বিশ্বাস, শ্রীদাশ এ ভাষায় বলেননি। নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করেন 24.4.45 তারিখে—বস্তুত বিজয়ী ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী শহরে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে। নেতাজী যদি এক কোটি টাকার সম্পদ সতেরটি বাক্সে রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুরের দিকে পাঠিয়ে থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই তার পূর্বে অপসারিত করেন। রানী বাহিনীর মেয়েদের অপসারণের ব্যবস্থা না হওয়ায় তিনি রেঙ্গুন ত্যাগে বিলম্ব করেন। শেষ সময়ে যেভাবে তিনি শহর ত্যাগ করেন তাতে মনে হয়,

অর্থসম্পদ তার পূর্বেই তিনি অপসারিত করেন।)

জেনারেল ভোঁসলে বলেন, নেতাজী 16.8.45 তারিখে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। ব্যাঙ্ককে আসার সময় ছ'টি স্টিলের ট্রাঙ্কে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে আসেন। স্বর্ণালঙ্কারগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের দান। জেনারেল ভোঁসলে স্বর্ণালঙ্কারগুলি দেখেননি এবং তার মূল্য সম্বন্ধেও তাঁর কোন ধারণা নেই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্কের শ্রীদীননাথকে প্রশ্ন করে জানতে পারে যে, 24.4.45 তারিখে রেঙ্গুন ত্যাগের সময়ে নেতাজী 140 পাউন্ড সোনা তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অন্যতম কর্মকর্তা পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মার মতে নেতাজীর শেষ যাত্রার সময় জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য যা নিয়ে গিয়েছিলেন তার মূল্য এক কোটি টাকার ওপর। নেতাজীর সঙ্গে যে প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই—কিন্তু বিভিন্ন তথ্য থেকে তার পরিমাণ বা মূল্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা বলেছেন যে, এই সম্পদ দশ-বারোটি স্টিলের ট্রাঙ্কে বোঝাই করা হয়—বাক্সগুলির মাপ 13 ইঞ্চি x 2 ইঞ্চি x 10 ইঞ্চি। কয়েকটি বাক্স হয়তো আকারে কিছু ছোট ছিল। জেনারেল ভোঁসলে বলেছেন, ব্যাঙ্ককে পৌঁছে দু'টি ক্যাম্বিসের ব্যাগে ঐ সম্পদ বদল করা হয়েছিল। ব্যাঙ্কক ত্যাগের সময় নেতাজীর সঙ্গে ছিল ঐ দু'টি ক্যাম্বিসের ব্যাগ। কিন্তু শ্রীদেবনাথ দাশ বলেন, তিনি আগে যে সতেরটি ছোট বাক্সের কথা বলেছেন তা থেকে সম্পদগুলি দুটি বড় চামড়ার সুটকেসে ভরে নেওয়া হয়। সে দুটির মাপ 30" থেকে 36" । ঐ মাপের দুটি সুটকেসে এক কোটি টাকার সম্পদ আদৌ ঢোকানো যায় কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগে।

নেতাজীর খাশ আর্দালি কুন্দন সিং-এর জবানবন্দি কমিটি গ্রহণ করেছেন। তার মতে ঐ সম্পদ চারটি লোহার ট্রাঙ্কে ভরে নেওয়া হয়েছিল, তাদের মাপ 20" x 13" x 16" এবং 12" x 6" x 6" । নেতাজী ব্যাঙ্কক ত্যাগ করবার আগে যখন এই বাক্সগুলি মিলিয়ে দেখা হচ্ছিল তখন সে নিজে উপস্থিত ছিল। সে বলে, বাক্সগুলি সোনার গহনায় ভরতি ছিল। ভারতীয় মেয়েরা সচরাচর যে সমস্ত গহনা ব্যবহার করে তাই। সোনার ঘড়ির চেন, নেকলেস, বালা, ব্রেসলেট, কর্ণাভরণ ইত্যাদি। মেয়েদের গহনাই ছিল বেশী। পাউন্ড এবং গিনিও ছিল। কতকগুলি গিনি-গাঁথা সোনার চেনও ছিল। সোনার তারও ছিল, কিন্তু সোনার বাঁট ছিল না। .....এই চারটি বাক্স ছাড়া একটা চামড়ার অ্যাটাচি কেসে ছিল সিঙ্গাপুর থেকে আনা নেতাজীর ব্যক্তিগত কিছু মূল্যবান জিনিস। হিটলার নেতাজীকে যে সোনার সিগারেট কেসটি উপহার দিয়েছিলেন সেটাও তার ভিতর ছিল। হিকারি কাইকানের লে. কুনিজুকা নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন বরাবর; তিনি বলেন, ঐ রাত্রে তিনিও সেই সম্পদগুলি দেখেছিলেন। তিনি কুন্দন সিং-এর সঙ্গে একমত; কিন্তু

কতগুলি বাক্স ছিল তা তিনি বলেননি।

(iii) শেষ মুহূর্তে নেতাজী সিঙ্গাপুরে এবং ব্যাঙ্ককে অনেককে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। তাঁর জাপানী সেক্রেটারি এবং দোভাষী শ্রীনিগোশী বলেন যে, সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার আগে নেতাজীর আদেশে তিনি জাপানী ব্যাঙ্ক থেকে আট কোটি ইয়েন (বর্তমানে 47 ইয়েন = ৷ টাকা) উঠিয়ে আনেন। জাপান তাঁকে যে দশ কোটি ইয়েন ধার দিয়েছিল তা থেকেই এ টাকা সে সময়ে ওঠানো হয়। সবই ব্যাঙ্ক-নোট। এ টাকায় অনেক আজাদী সৈন্যের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক অসামরিক ব্যক্তির পাওনা মেটানো হয়। শ্রীদেবনাথ দাশ বলেন, সতেরই অগাস্ট ব্যাঙ্কক ত্যাগ করার ঠিক আগে নেতাজী শেষ মুহূর্তে চুলালঙ্কর্ন হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দান করেন এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রতিটি অফিসার ও সৈনিককে আগামী দুই-তিন মাসের মাইনে স্যাংশন করে যান। (নেতাজী আশঙ্কা করেছিলেন বিজয়ী বাহিনী এসেই ব্যাঙ্কের টাকা আটক করবে, তাই তিনি সৈন্যদের আগামী তিন মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে দেন।)

শ্রীদাশ আরও বলেন যে, এ টাকা তিনি বর্মা-অঞ্চল থেকে আনা সম্পদ দিয়ে মেটাননি; বরং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের থাইল্যান্ড শাখায় যে আমানত ছিল তা থেকেই খরচ করবার আদেশ দিয়ে যান। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে নেতাজীর সঙ্গে একটি বড় সুটকেসে দলিলপত্র ও ব্যাঙ্ক-নোট ছিল। শেষ ক'দিনের চিত্রটি সবই ধোঁয়াটে। নেতাজী কত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন, কত খরচ করেছিলেন, এবং কত সোনাদানা-টাকা-জহরৎ তাঁর সঙ্গে ছিল,—কিছুই ঠিকমত বলা যায় না। মিত্রপক্ষের হাতে পড়ার ভয়ে কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হয়— ফলে এ বিষয়ে ধারণা করা কঠিন। শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, নেতাজী শেষ সময়ে অনেক টাকা খরচ করে যান এবং বেশ কিছু ধনসম্পদ সঙ্গে নিয়ে যান।

এ কথাও বোঝা যায় যে, নেতাজী এ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মার জবানবন্দী অনুযায়ী শেষ-যাত্রার অল্প কিছুদিন আগে নেতাজী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এই বিপুল ধনরাশির দায়িত্ব তিনি নিতে রাজি আছেন কিনা। পণ্ডিত শর্মা রাজি হতে পারেননি। শ্রীদেবনাথ দাশের জবানবন্দীতে সাইগন বিমানবন্দরেও নাকি নেতাজী তাঁকে বলেন ঐ বিপুল সম্পদ তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নন (কুশাগ্রবুদ্ধি নেতাজী কি কিছু আশঙ্কা করেছিলেন?)। কিন্তু শ্রীদাস ও মেজর আবিদ হাসান তাতে রাজী হতে পারেননি, ফলে নেতাজীকে সেগুলি সঙ্গে নিয়েই যেতে হয়েছিল।

"(iv) ভারতীয় এবং জাপানী সঙ্গীরা সাইগণ্ডে এই সম্পদ সম্বন্ধে অনেক কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। যে গাড়ীতে ঐ ধনরাশি আসছিল সেটা এসে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় বিমান যাত্রা আধঘণ্টা পিছিয়ে যায়। সকল সাক্ষীই বলেছেন যে, দ্বিতীয় গাড়ি থেকে দুটি বাক্স প্লেনে তুলে দেওয়া হয় — ওজন বেশি হয়ে যাচ্ছে বলে পাইলটের

আপত্তি সত্ত্বেও। জেনারেল ইসোদা বলেন মেজর আবিদ হাসান ছুটে এসে বলেন যে, যেহেতু দ্বিতীয় গাড়িতে দুটি বাক্সে নেতাজীর খুব মূল্যবান কিছু দ্রব্য আছে — পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের দেওয়া উপহার, তাই প্লেনটা আধঘণ্টা দেরি হল ছাড়তে। জেনারেল ইসোদাকে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়নি বাক্স দুটিতে কী ছিল, কিন্তু মেজর হাসানের কথা থেকে তিনি আন্দাজ করেছিলেন ওটা ধনভাণ্ডার। যদিও অধিকাংশ সাক্ষীই বলেছেন যে, বাক্স দুটি ছিল চামড়ার সুটকেস, প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু ক্যাপ্টেন গুলজারা সিং আর কর্নেল প্রীতম সিং-এর মতে সে দুটি ছিল ঐ মাপের কাঠের বাক্স।

মিস্টার নিগোশী বলেন, হিকারি কাইকানের কোন অফিসারের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন, নেতাজীর সঙ্গের বাক্স দুটিতে 150 কিলোগ্রাম ওজনের সোনার বাঁট ছিল। তিনি আরও বলেন, নেতাজী তাঁর সম্পদের অর্ধেক সঙ্গে নিয়েছিলেন, বাকি অর্ধেক সাইগণ্ডেই রেখে যান, সেখানকার বিভিন্ন পাওনা মেটাতে। সে যাই হোক, এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাইগণ্ড ত্যাগ করার সময় নেতাজীর সঙ্গে দুটি প্রায় 30" মাপের বাক্সতে স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য দামী সম্পদ ছিল। আগেই বলেছি, তার মূল্য এক কোটি টাকা হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু কত হবে তা-ও আন্দাজ করা যায় না — তার বিস্তারিত কোন বিবরণ সন্দেহাতীতরূপে জানা যায় না।

''(v) বিমানটি আঠারই অগাস্ট তাইহকুতে ভেঙে পড়ে। কর্নেল হবিবর রহমান বলেছেন, পরদিনই তিনি জানতে চান ওঁদের সঙ্গের মালপত্রের কী হল — বিশেষ করে দুটি সুটকেসের, যাতে সম্পদ ছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, বিমানটি সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, মালপত্রও সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; কিন্তু কিছু আগুনে পোড়া জড়োয়া গহনা পরে উদ্ধার করা গেছে। মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সে সেগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এই সম্পদগুলি বিধ্বস্ত বিমানে আশপাশ থেকে আহরণ করা হয় দু'জন জাপানী অফিসারের তত্ত্বাবধানে। তাঁরা হলেন বিমান বন্দরের নিরাপত্তা অফিসার মেজর কে. সাকাই (বিমানযাত্রী শ্রী টি. সাকাই নন) এবং বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতো।

মেজর সাকাই বলেন, দুর্ঘটনার দু'ঘণ্টা পরে তিনি অকুস্থলে এসে দেখেন, ক্যাপ্টেন নাকামুরার তত্ত্বাবধানে তাঁর লোকেরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সম্পদ আহরণ করছে। তিনি দেখলেন, সংগ্রাহক দলে লোক কম, তাই তাঁর নিজস্ব আরো ত্রিশজন লোককে ঐ কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেন, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, মেজর সাকাইয়ের তত্ত্বাবধানে এবং আদেশে লেফ্‌ট্যানেন্ট ইয়ামাশিদা ঐ সম্পদ আহরণ করেছেন। তিনি বলেন যে, কর্নেল নোনোগাকির আদেশে তিনিও ওদের সাহায্য করেন। দু'জন অফিসারই অবশ্য বলেন যে, তাঁরা কিছু অগ্নিদগ্ধ গহনা ও মূল্যবান জিনিস খুঁজে পান — নেকলেস, আংটি, মেডেল ইত্যাদি। সব কিছু তাঁরা একটি আঠারো লিটার

মাপের পেট্রোলের টিনে ভরে ফেলেন। সেটি বন্ধ করে ওপর কাগজ এঁটে দেওয়া হয় এবং সেই কাগজের ওপর দু'জন অফিসারই সই করেন ও সীলমোহর করেন।

এরপর কী হল সে সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা যাচ্ছে। মেজর সাকাই বলেন যে, ঐ মূল্যবান দ্রব্যে ভর্তি পাত্রটি মাত্র এক রাত্রি হেপাজতে রাখা হয় এবং পরদিন হেড-কোয়ার্টার্সের লে. কর্নেল শিবুয়াকে তিনি সেটি সমর্পণ করেন। অপরপক্ষে ক্যাপ্টেন নাকামুরা বলেন, বিমানবন্দরের এয়াররেড শেলটারে চার-পাঁচ দিন ঐ পাত্রটি রাখা ছিল—তারপর সেটি লে. কর্নেল শিবুয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচই সেপ্টেম্বর কর্নেল হবিবর রহমানকে ওখান থেকে বিমানযোগে টোকিওতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফরমোসার আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে লে. কর্নেল সাকাই এবং লেফ্‌ট্যানেন্ট হায়াশিদাকেও ঐ সঙ্গে টোকিওতে পাঠানো হয়, নেতাজীর চিতাভস্ম এবং সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে।

আগেই বলেছি, মেজর সাকাই এবং ক্যাপ্টেন নাকামুরা ওরফে ইয়ামামোতা বলেছেন, সম্পদগুলি তাঁরা একটি আঠার লিটার মাপের পেট্রোলের পাত্রে ভরে রেখেছিলেন। লে. কর্নেল শিবুয়া এবং হেড-কোয়ার্টার্সের স্টাফ অফিসার তাঁদের বিবৃতিতে একটি পেট্রোলের পাত্রের উল্লেখ করেছেন, এমনকি লে. কর্নেল সাকাই পাত্রটির বর্ণনায় বলেছেন, 'One baggage as big as an oil can' (একটি মাল যা একটা ক্যানেস্তারা টিনের মত বড়)। কিন্তু কর্নেল হবিবর রহমান এবং লে. হায়াশিদা বলেন যে, তাঁরা বহন করেছিলেন একটি কাঠের বাক্স।

''(vi) সাতই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে টোকিওস্থ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে ঐ সম্পদের বাক্সটি পৌঁছে দেওয়া হল। মেজর কিনোসিতা ছিলেন ডিউটি অফিসার—তিনি সেটি সে রাত্রে গ্রহণ করেন এবং পরদিন সেটি লে. ক. তাকাকুরাকে সমর্পণ করেন। তাঁরা দুজনেই বলেছেন যে, সেটি ছিল একটি কাঠের বাক্স—পেরেক দিয়ে আঁটা কিন্তু সীল করা নয়। কেমন করে সীলমোহর করা একটা পেট্রোলের টিন কাঠের বাক্সে পরিণত হল তা পরিষ্কার করে বোঝা যায় না।

লে. ক. তাকাকুরা বলেন যে, তিনি আটই সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীরামমূর্তিকে টেলিফোন করেন। সেই মতো শ্রীরামমূর্তি এবং শ্রীআইয়ার দু'জন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং নেতাজীর চিতাভস্ম ও সম্পদের বাক্সটি গ্রহণ করেন। অথচ শ্রীরামমূর্তি বলেন যে, কর্নেল রহমান টোকিওতে ফিরে আসার দু'তিন দিন পরে (যার অর্থ নয়ই অথবা দশই সেপ্টেম্বর) কর্নেল রহমান তাঁকে অনুরোধ করেন সম্পদের বাক্সটি ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে নিয়ে আসতে। সেই মতো শ্রীরামমূর্তি বাক্সটি সেখান থেকে নিয়ে আসেন। তাঁর মতে বাক্সটি ছিল কাঠের, যথেষ্ট ভারী — একজন কুলি লাগিয়ে সেটা তিনি গাড়িতে তোলেন।

অপরপক্ষে কর্নেল হবিবর রহমান বলেছেন যে, তিনি টোকিওতে আসার কয়েকদিন

পরে একদিন ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে সর্বশ্রী রামমূর্তি এবং আইয়ারের ডাক আসে — তাঁরা দু'জনেই সেখানে যান ও বাক্সটি নিয়ে আসেন। শ্রীজয়মূর্তি, অর্থাৎ শ্রীরামমূর্তির ভ্রাতা, তাঁর দাদার জবানবন্দিকেই সমর্থন করেন। অথচ শ্রীআইয়ার ঠিকমত জানাননি কিভাবে বাক্সটি হস্তান্তরিত হল। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি এবং কর্নেল রহমান যে বাড়িতে থাকতেন (সম্ভবত শ্রীআনন্দমোহন সহায়ের বাড়ির কথা বলা হচ্ছে) সেই বাড়িতে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন, কর্নেল রহমান এবং সর্বশ্রী রামমূর্তি ও জয়মূর্তি তিনজন মিলে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার পরিষ্কার করছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, কে কখন ঐ সম্পদের বাক্সটি গ্রহণ করেছিলেন তার সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। শ্রীরামমূর্তি বলেন, কর্নেল রহমান তাঁকে তখন বলেছিলেন যে, তাইহকুতে তাঁর সামনে যে বাক্সটি ভরতি করা হয়েছিল এটি সেইটিই, সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ নেই; অথচ কর্নেল রহমান বলেন, বাক্সের সীল ভাঙা দেখে এবং সেই বাক্সটি খুলে সেটা অর্ধপরিপূর্ণ দেখে এবং ওজন আন্দাজ করে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে কেউ সেখান থেকে এর কিয়দংশ সরিয়েছে!

বাক্সে যা পাওয়া গিয়েছিল তা অগ্নিদগ্ধ সোনার জড়োয়া অলঙ্কার, — তার সঙ্গে মিশেছিল অন্যান্য ধাতু ও ধ্বংসচূর্ণ (bits from the wreckage) । ওঁরা সেগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করেন — বেশী সোনা যাতে আছে, অল্প সোনা যাতে আছে এবং ময়লার সাথে মেশানে সোনা যাতে আছে, তা পৃথক করেন। তারপর তাঁরা সবগুলিকে একটি বাক্সে (পৃথক করার উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।) ভরে পেরেক মেরে দেন। এই সম্পদ ওজন করে দেখা যায় তার ওজন এগারো কিলোগ্রাম। একটি লিস্টও এবার প্রণয়ন করা হয়, কর্নেল রহমান তাতে সইও করেন। অতঃপর কর্নেল রহমান ঐ সম্পদের বাক্সটি শ্রীরামমূর্তিকে সমর্পণ করে বলেন যে, নেতাজীর আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষে কোন আন্দোলন দেখা দিলে তিনি যেন তার নেতৃবৃন্দের হাতে তা হস্তান্তরিত করেন (to be handed over to any authority which may arise in India in succesion to Netaji's Movement) । এই সময়ে শ্রীআইয়ার শ্রীরামমূর্তিকে তিনশ গ্রাম সোনা ও বিশ হাজার ইয়েন নগদ দিয়েছিলেন ঐ একই রকম নির্দেশ দিয়ে। এটা তাঁরা করেছিলেন এই আশঙ্কায় যে, এটা না করা হলে হয়তো যাবতীয় সম্পদ মিত্রপক্ষ বাজেয়াপ্ত করে ফেলবে।

(vii) শ্রীরামমূর্তি 1945 সাল থেকে 1956 সাল পর্যন্ত এই সম্পদ নিজের কাছে রাখেন। তিনি টাকাটা কোন ব্যাঙ্কে রাখেননি। কেন তিনি এ কাজ করেছিলেন তা যখন জিজ্ঞাসা করা হল তখন শ্রীমূর্তি বলেছিলেন যে, ব্যাঙ্কে রাখলে তা জানাজানি হত এবং বিজয়ী পক্ষ তা বাজেয়াপ্ত করে নিত। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কোন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেননি, বা কাউকে জানাননি। সত্যি কথা বলতে

কি, এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তিনি ঐ গচ্ছিত সম্পদের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকারই করে গেছেন। এমনকি তিনি টোকিওস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করেননি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি শ্রীআইয়ারের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এবং শ্রীআয়ারই তাঁকে পরামর্শ দেন যে, যতদিন নেতাজীর চিতাভস্ম সম্বন্ধে স্থিরভাবে কোন কিছু জানা না যাচ্ছে ততদিন শ্রীমূর্তি যেন কথাটা গোপন রাখেন।

শ্রীআইয়ার 1951 সালে জাপান আসেন। তখনই প্রথম শ্রীমূর্তি ঐ সম্পদের কথা স্বীকার করেন এবং সেটি হস্তান্তরিত করবার ইচ্ছ প্রকাশ করেন। শ্রীমূর্তি স্বীকার করেন যে, তিনি শ্রীআইয়ারের এবারকার জাপান ভ্রমণের আংশিক খরচও বহন করেছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরে এসে শ্রীআইয়ার প্রধামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন ঐ সম্পদ টোকিওস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে ভারতে ফিরিয়ে আনতে। প্রধানমন্ত্রী রাজি হন। তাঁরই নির্দেশে ভারতীয় মিশন 24.9.51 তারিখে ঐ সম্পদ গ্রহণ করেন। ভারতীয় মিশনের প্রধান সচিব ভি. সি. ত্রিবেদী কর্নেল রহমানের 1945 সালে সই করা লিস্টে স্বাক্ষর দিয়ে সম্পদটি গ্রহণ করেন। সম্পদগুলি ভারতীয় মিশন পুনরায় ওজন করেন এবং আগেকার ওজনের চেয়ে এবার সামান্য কিছু বেশিই হয়।

"(viii) সম্পদগুলি ভারতবর্ষে নিয়ে আসা হল। রাষ্ট্রপতি ভবনের জাতীয় সংগ্রশালায় সেগুলি রক্ষিত আছে। আগেই বলা হয়েছে, সেগুলি কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকা। সংগ্রহশালাটি আমরা দেখেছি, দ্বিতীয়বারে নেতাজীর ব্যক্তিগত ভৃত্য কুন্দন সিংও আমাদের সঙ্গে ছিল। কুন্দন সিং অনেকগুলি জিনিস নেতাজীর বলে সনাক্ত করে। সংগ্রহশালায় যে জিনিসগুলি আমরা দেখেছি তা জড়োয়া অলঙ্কার; নানা ধরনের গহনা। অনেকেই বলেছেন এগুলি নেতাজীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ উপহার দিয়েছিল এবং সেগুলি তাঁর শেষযাত্রার সময় সঙ্গে ছিল।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ সম্পদ ও অলঙ্কারগুলি নেতাজীর সঙ্গেই ছিল, তাইহকু বিমানবন্দরে এগুলি কুড়িয়ে পাওয়া যায় এবং শ্রীমূর্তির কাছে এগুলিই ছিল। এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, 1951 সালে শ্রীমূর্তি যে সম্পদ প্রত্যর্পণ করেন তা কর্নেল রহমান স্বাক্ষরিত 1945 সালে প্রণীত লিস্টের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু নেতাজী কী পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার কত অংশ সংগৃহীত হয়েছে তা বোঝবার কোন উপায় নেই। নেতাজীর সঙ্গের দু'টি সুটকেস ওজন করা হয়নি। শুধু প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী অনুসারে আমরা জানি যে, সে দু'টি বেশ ভারী ছিল। একমাত্র একজন সাক্ষী—লে. কর্নেল নোনাগাকি বলেছেন যে, বাক্স দুটির মিলিত ওজন ছিল প্রায় 40 কিলোগ্রাম। তার ভিতর ধুলা বালিমাখা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাত্র 11 কিলোগ্রামের মতো সম্পদ পাওয়া গেছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, নেতাজী যে সম্পদ নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তার অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই সংগৃহীত হয়েছিল। ঘটনা-পরম্পরায় অনেক কিছু ফাঁক আর বিচ্যুতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিমান দুর্ঘটনার পর তার চারদিকে বেষ্টনী দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা এবং সম্পদ সংগ্রহের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। সংগ্রহের পর সে-সম্পদ বিমানক্ষেত্রের এয়ার শেলটারে একরাত ছিল কিম্বা তিন-চার দিন ছিল তাও স্পষ্ট নয়।

পাত্রটি সম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ আছে। কেউ বলেছেন সেটা ছিল টিনের ক্যানেস্তারা, কেউ বলেছেন, কাঠের বাক্স। যদি প্রথমে পেট্রোলের ক্যানেই সেগুলি তোলা হয়ে থাকে এবং সীলবদ্ধ করা হয়, তা'হলে কে সেটা খোলে আর কী জন্যই বা সেগুলি একটি কাঠের বাক্সে রাখে তা বোঝা যাচ্ছে না। শ্রীরামমূর্তিকে টোকিওতে যে বাক্সটি দেওয়া হল তাতে সীলকরা ছিল না, শুধু পেরেক আঁটা ছিল। যদিও মেজর তাকাকুরা বলেছেন যে, তিনি চিতাভস্মের সঙ্গেই সম্পদের বাক্সটি সর্বশ্রী রামমূর্তি ও আইয়ারকে হস্তান্তরিত করেছিলেন, কিন্তু রামমূর্তি বলেন যে, তাঁকে বেশ কিছুদিন পরে এসে ঐ সম্পদের বাক্সটি নিয়ে যেতে বলা হয় এবং তাই তিনি নিয়েছিলেন।

কর্নেল রহমান আবার বলেছেন যে সর্বশ্রী মূর্তি ও আইয়ার সংযুক্তভাবে সম্পদের বাক্সটি গ্রহণ করেন। আবার শ্রীআইয়ার বলেন, তাঁকে আদৌ ডাকা হয়নি; তিনি ঘটনাচক্রে ওঁদের তিনজনকে স্বর্ণালঙ্কারগুলি পরিষ্কার করেত দেখেন এবং এ বিষয়ে জানতে পারেন। জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সে কোন রসিদ নেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়নি। শ্রীমূর্তি বলেন যে, বাক্সটি দেখে কর্নেল রহমান কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি, এবং বলেন, এই বাক্সটিতেই তাইহকুতে সম্পদ গুছিয়ে রাখা হয়েছিল; অথচ কর্নেল রহমান বলছেন, তিনি লক্ষ্য করে দেখেছিলেন বাক্সের অর্ধেক খালি, সেটি ওজনে কম, বেশ বোঝা যায় তার থেকে মাল সরানো হয়েছে।

সুতরাং কোন বিষয়েই কিছু নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না; তাইহকুতে কী পরিমাণ সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল, কখন ও কেন পাত্রটি বদল করা হল, তা থেকে কিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিনা, এবং কে টোকিওতে এটি গ্রহণ করেছিলেন আর কবে! বিভিন্ন নথিপত্র দেখে আমাদের এইটুকুই মনে হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি না। এ বিষয়ে যদি আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে হয় তা'হলে এর জন্য একটি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান কমিটি প্রণয়ন করা উচিত। সেই কমিটি শুধু নেতাজীর সঙ্গে নিয়ে-যাওয়া সম্পদের অনুসন্ধান করবে না, আজাদ হিন্দ্ সরকারের যাবতীয় সম্পদের বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখবে। অবশ্য আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, এতদিন পরে সে তদন্তে কোন লাভ হবে কিনা — কারণ অধিকাংশ কাগজপত্রই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

কমিটি উপসংহারে বলেছেন, 'বিভিন্ন নথিপত্র থেকে আমাদের এইটুকুই মনে হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি না।' কিন্তু কথাটা কি ঠিক? কমিটি যেটুকু নথিপত্র প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমাদের মনে হয় কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসেই আসতে পারি —

(ক) সংশ্লিষ্ট ভারতীয় এবং অভারতীয় একাধিক ব্যক্তি যথাকর্তব্য করেননি। তাঁরা এতদূর পদস্থ, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান যে, এই কর্তব্যহানিকে অজ্ঞতা বা অনবধানতা আখ্যা দেওয়া যায় না — অর্থাৎ তাঁরা উদ্দেশপ্রণোদিতভাবে কর্তব্যহানি করেছেন!

(খ) এক বা একাধিক ব্যক্তি এই সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন। এদুটি স্বতঃসিদ্ধান্ত অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্লেষণ করলে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় —

(i) তথাকথিত দুর্ঘটনা বিমানবন্দরের এলাকাতেই হয়েছে; সুতরাং বিমান-বন্দরের কর্তৃপক্ষ যদি বিধ্বস্ত বিমানের চতুর্দিকে কর্ডনিং করে বিক্ষিপ্ত মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ না করে থাকেন তবে তাঁদের কর্তব্যহানি হয়েছে।

(ii) মেজর সাকাই এবং ক্যাপ্টেন নাকামুরা সম্পদগুলি পেট্রোলের টিনে ভরে তা সীলমোহর করেছিলেন বলেছেন এবং ফরমোসা হেড-কোয়ার্টার্সের প্রধান লে. জে. শিবুয়াও তাঁর বিবৃতিতে সীলমোহর করা টিনের কথাই বলেছেন। এক্ষেত্রে শেষোক্ত অফিসারের উচিত ছিল সীলমোহরাঙ্কিত পেট্রোলের ক্যান হস্তান্তরের রসিদ গ্রহণ করা। এ পর্যায়ে সেটা হঠাৎ কাঠের বাক্সে পরিণত হওয়ার দায়িত্ব লে. জে. শিবুয়ার।

(iii) কর্নেল হবিবর রহমান ছিলেন নেতাজীর নির্বাচিত অ্যাডজুট্যান্ট। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির দেখাশোনা করা তাঁর কর্তব্য ছিল। নেতাজীর প্রতি কর্তব্য, পূর্ব-এশিয়াবাসীদের প্রতি কর্তব্য এবং মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য। তাঁর উচিত ছিল তাইহকুতে প্রথম সুযোগেই সম্পদের বাক্স — তা সে পেট্রোলের ক্যানই হোক অথবা কাঠের বাক্সই হোক —কাগজ সেঁটে তার ওপর নিজের সই দিয়ে দেওয়া। মানসিক বিপর্যয় যতই হোক, তিনি যোদ্ধা — এ কাজে গাফিলতি করে তিনি অন্যায় করেছেন।

(iv) শ্রীরামমূর্তি নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখেননি, এ অর্থ গচ্ছিত রাখা কথা প্রকাশ করেননি, অথবা তিনি ও শ্রীআইয়ার সমস্ত ঘটনাটাই 1951 সাল পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। আমাদের মতে তাতে তাঁরা কিছুই অন্যায় করেননি। তাঁরা যে কোনও মুহূর্তে নেতাজির আবির্ভাব আশা করেছিলেন বলেই হয়তো এ কাজ করেন। এজন্য কেউ তাঁদের দোষারোপ করবে না।

(v) কিন্তু শ্রীরামমূর্তি তাঁর নিজের জবানবন্দী অনুসারে অনুরুদ্ধ হয়ে একাই গিয়েছিলেন টোকিও ইম্পিরিয়াল হেড-কোয়ার্টার্স থেকে নেতাজীর সম্পদ গ্রহণ করতে। তাঁর কথা অনুযায়ী তাই যদি তিনি করে থাকেন তা'হলে তাঁর উচিত ছিল, ইম্পিরিয়াল

হেড-কোয়ার্টার্সে জাপানী কর্তৃপক্ষের সম্মুখে পেরেক-আঁটা (সীল করা নয়) বাক্সটি খুলে ভিতরের মালপত্র লিস্ট মিলিয়ে দেখা, ওজন করা এবং লিস্টে জাপানী অফিসার লে. ক. তাকাকুরার স্বাক্ষরসমেত বাক্সটি তাঁর সম্মুখে সীল করা। এ কাজ তিনি যদি করতেন তা'হলে কেউ বলতে পারত না তিনি ঐ সম্পদের কিয়দংশ আত্মসাৎ করেছেন, কোন সাক্ষী সঙ্গে না নিয়ে, কোন প্রমাণ না রেখে তাঁর নিজের জরানবন্দি অনুসারে কেন তিনি ঐ সম্পদ নিয়ে নিজের হেপাজতে গোপন করে রাখলেন তার কৈফিয়ৎ তাঁর কাছে ভারতবর্ষ দাবি করতে পারে।

✡ ✡ ✡

নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ — এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে — তা আমরা পর্যায়ক্রমে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করছি; কিন্তু একটি রচনার সম্বন্ধে আমি বাগ্‌বিস্তার করিনি—সেটি হচ্ছে শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধ। এগুলি আনন্দবাজার পত্রিকায় (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ইংরেজিতে) ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'নেতাজী রহস্য' নামে গ্রন্থাকারেও এটি প্রকাশিত হয়েছে।

ড. সিংহ বিভিন্ন দেশে নিজে গিয়েছেন, নেতাজীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন বলে দাবি করেন। প্রবন্ধে তাঁর ফরমোসা দ্বীপ (1964), জার্মানী ('47), রাশিয়া ('55) প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলা আছে। তিনি এ গ্রন্থে বলেছেন, তাইহকু বিমান দুর্ঘটনায় যে নেতাজীর মৃত্যু হয়নি তার সন্দেহাতীত প্রমাণ তাঁর হাতে আছে। তাঁর মতে নেতাজী তাইহকু থেকে লে. জে. শীদেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেনে চলে যান। দাইরেনে নেতাজীকে সে সময়ে দেখেছেন এমন লোকের কথাও তিনি বলেন। তিনি নাকি দাইরেনে তোলা নেতাজীর একটি ফটোও দেখেন। সেখানে নেতাজী বন্দী হন। তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। 1950-51 সালে নেতাজী নাকি সাইবেরিয়া অঞ্চলে ইয়াকুর্টস্ক বন্দী-শিবিরে 45 নং সেলে আবদ্ধ ছিলেন। ড. সিংহ দাবি করেছেন, "ভারতে প্রত্যাবর্তন করে .....নেতাজী সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে জওয়াহরলালজীকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিলাম। জওয়াহরলালজীর কাছ থেকে এ সম্পর্কে কোন উত্তর না পেয়ে বুঝলাম যে, তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চান না। এবং নেতাজী প্রশ্নের পুনরবতারণা করা তাঁর পছন্দ নয়।"

তাঁর এই প্রশ্নাবলী এত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট যে, স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হবার পর ভারত সরকার কেমন করে নিরাসক্ত নির্বিকার থাকলেন। হয় তাঁর সূত্র অবলম্বন করে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল, অথবা তার তীব্র প্রতিবাদ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নেহেরু সরকার দুটোর একটাও করেননি।

এ গ্রন্থ রচনাকালে সংবাদ পেয়েছি বর্তমান একজনের কমিশন ড. সিংহকে সাক্ষী দিতে ডেকেছেন। ফলে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। এবার

তদন্ত যা হচ্ছে তা 'অনুসন্ধান কমিটি' করছেন না, করছেন 'কমিশন'—সবকিছুই এবার প্রকাশ্যে হবে। দেশের সংবাদপত্রসমূহ যদি সহযোগিতা করেন তবে আমরা সব কিছুই ক্রমে ক্রমে জানতে পারব।

বর্তমান অবস্থায় ঐ গ্রন্থটি সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি যে, ড. সিংহ তাঁর প্রবন্ধে সংগৃহীত সংবাদগুলি ঠিকমত পরিবেশন করেননি। তথ্য পরিবেশনের আঙ্গিক আশানুরূপ হয়নি। উচ্ছ্বাস আরও কম হয়ে যদি তথ্যের পরিচয় বেশি করে থাকত, আমাদের মনে যেসব প্রশ্ন জাগছে সেগুলি যদি লেখক নিরসনের চেষ্টা করতেন, নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিকের মত যদি পর পর তথ্যগুলি সাজিয়ে দিতেন, তা'হলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হতাম। কয়েকটি উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে:

1. লেখক বলেছেন, "তাইপেতে অনুসন্ধানের সময় আমি নিজে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাহাড়ের চূড়া ও রানওয়ের কয়েক ডজন ফটো তুলেছি। 1944 সালে পাহাড়-চূড়ায় বিমানে দুর্ঘটনা-স্থলের যে ফটো আমি তুলেছি তা নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রদর্শিত রানওয়েতে দুর্ঘটনার —যা 18.8.45 সালে হয়েছিল বলে কথিত— ফটোর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ফটোগ্রাফের পটভূমিকায় য়ুয়ানসান পাহাড়ের দৃশ্য নেতাজী তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ফটো ও আমার তোলা ফটোর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত।" (5/24)

ইতিপূর্বেই বলেছি, লেখক তাঁর তোলা সেই ফটোটি আমাদের দেখবার সুযোগ দেননি। আশা করি বিচারপতি খোসলাকে তিনি সেটি দেখাবেন, তাঁর 'কয়েক ডজন ফটো' সমেত।

2. লেখক বলেছেন, "1945 সালের আঠারই অগাস্ট ফরমোসা দ্বীপের যে জায়গাটায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন বলে খবর বেরিয়েছিল, ঠিক সেইখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম 1964 সালের সতেরই নভেম্বর (5/1)। আমার পূর্বে আমাদের কোন দেশবাসীই তাইপেতে সংঘটিত এই রহস্যজনক দুর্ঘটনার মূল নথিপত্র সংগ্রহে যত্নবান হননি দেখে আমার বিস্ময় জাগে।" (5/2)

বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে. ড. সিংহ 1964 সালেও শ্রীহারিন শাহ্-এর 1956 সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির সংবাদ রাখতেন না। রাখলে, এ জাতীয় ' পাইওনিয়ার ওয়ার্কার' হিসাবে আত্মপ্রচারের চেষ্টা তিনি করতেন না; না রাখলে বলব, এতবড় দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত তিনি নন। পূর্বপ্রকাশিত সহজলভ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন না করে — পূর্বসূরীদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে এ জাতীয় গবেষণা সম্ভবপর নয়!

3. লেখক বলেছেন, "জেনারেল পাও প্রেসিডেন্ট জেনারেলশিমো চিয়াং কাইশেক এবং সমাজ, রাজনীতি এবং সমর বিভাগীয় সর্বস্তরের নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর পূর্বনির্দিষ্ট সময়মত তিনি ফরমোসা দ্বীপে সংরক্ষিত জাপানীদের গোপন নথিপত্র, এমনকি গুপ্তচর-সূত্রে প্রাপ্ত অতি গোপনীয় দলিল-দস্তাবেজ আমার

সামনে পেশ করলেন। যে কোনো দলিল পরীক্ষানিরীক্ষা করা, এমনকি প্রয়োজনবোধে ফটো নেবার অধিকারও আমাকে দেওয়া হয়েছিল।" (5/5)

অথচ আশ্চর্য, লেখক তাঁর সংগৃহীত একটিও নথিপত্র দলিল-দস্তাবেজের উল্লেখ করেননি, একটিও ফটোস্ট্যাট কপি প্রকাশ করেননি। এমন দুর্লভ সুযোগ যদি তিনি সত্যিই পেয়ে থাকেন, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল না করে কেন তিনি ক্রমাগত আপ্তবাক্যের মত তার অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিটুকুই জানতে দিলেন পাঠককে? তাঁর প্রবন্ধ ছাপিয়েছে যে দৈনিকপত্র তাঁরা নিশ্চয়ই সেসব ফটোস্টাট কপি ছাপাতে কসুর করত না। অন্তত অর্থাভাবের অজুহাত ঐ সমস্ত বিখ্যাত দৈনিকপত্র দিত না। লেখক তাঁর ফরমোসায় সংগৃহীত কোন তথ্যের মূল নথি বা প্রমাণ আমাদের জানতে দেননি। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর চাঞ্চল্যকর কথোপকথনের বিবরণ পাতার পরে পাতা ছেপে গেছেন। যেন তিনি তথ্যপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ লিখছেন না—তিনি যেন কোন রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের গোয়েন্দা গল্পলেখক!

আশা করি বর্তমান কমিশনের সামনে তাঁর নিজ স্বীকৃতি অনুযায়ী সংগৃহীত মূল তথ্য দাখিল করে এ অভিযোগের জবাব তিনি দেবেন।

4. লেখক ভাগ্যবান। তিনি এমন নাপিতের সন্ধান পেয়েছেন যিনি 1949 সালে নেতাজীর চুল কেটেছেন, এমন চীন-যুদ্ধ ফেরত ভারতীয় সামরিক অফিসারের সন্ধান পেয়েছেন যিনি নেতাজীর হস্তাক্ষরে 'বস্‌পমনিসে মায়্‌ জয়হিন্দ্‌' (মনে রেখো আমার জয়হিন্দ্‌) সংগ্রহ করে এনেছেন, এমন ফটোগ্রাফারের সন্ধান পেয়েছেন যিনি 1948 সালে আলখাল্লা-পরা নেতাজীর ফটো তুলেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা বর্তমান অবস্থায় করতে অসমর্থ। আমরা শুধু আশা করব ড. সিংহ তাঁর দীর্ঘ অনুসন্ধানের যাবতীয় তথ্য, নথীপত্র , দলিল ও ফটোগ্রাফ জনসাধারণের সামনে দাখিল করবেন। তাঁর সংগৃহীত সূত্র থেকে নেতাজী রহস্যে যদি সামান্যতমও আলোকপাত হয় তা'হলে তাঁর শ্রম সার্থক হবে—আমরাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানাব।

✡ ✡ ✡

নেতাজীর শেষ অভিযাত্রা বিষয়ে এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তা আপনাদের সামনে ক্রমান্বয়ে পেশ করবার চেষ্টা করেছি। ঐ সমস্ত তথ্য-সাক্ষ্য-নথিপত্র বিচার করে শেষ সিদ্ধান্তে আসবার অধিকার আপনাদের—গ্রন্থারম্ভেই আপনাদের জুরি হিসাবে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। প্রতিশ্রুতি মত আমি আমার নিজস্ব মতামত আপনাদের ওপর আরোপ করতে চাই না—আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই প্রভাবিত করতে চাই না; কিন্তু বিচারক যেভাবে জুরিমহোদয়গণের সম্মুখে সমস্ত বিষয়টির পর্যালোচনা করে তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানান, আমিও তেমনি বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলি এবার আপনাদের সম্মুখে রাখতে চাই।

আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন যে, আমাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নথিপত্র ভাল করে তল্লাশি করা হয়নি। মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল যে অনুসন্ধান চালিয়েছিল তার বিক্ষিপ্ত অংশ মাত্র আমরা এখানে-ওখানে দেখেছি — পূর্ণ রিপোর্টটি আজও আমরা দেখতে পাইনি। জানি না, শাহ্‌নওয়াজ কমিটি সেই সম্পূর্ণ রিপোর্টটি আদৌ দেখেছিলেন কিনা, দেখলেও কোন উপকার তাতে হয়নি — কারণ ঐ কমিটির আচরণ থেকে আশঙ্কা হয় যে, সেটি বস্তুত ছিল ট্যাক্স-পেয়ারের পয়সায় গড়া একটি 'হিজ মাস্টারস্ ভয়েস্ কমিটি'!

আপনারা একথাও সংবাদপত্র মারফত জেনেছেন যে, অতি সম্প্রতি ভারত সরকার পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি. ডি. খোসলাকে 'একজনের তদন্ত কমিশন' গঠন করতে আহ্বান করেছেন। কমিশন গঠিত হয়েছে, এবং তাঁদের কাজও শুরু হয়েছে। এই দ্বিতীয় তদন্তের জন্য কয়েক বৎসর ধরেই দাবি পেশ করা হচ্ছিল—কিন্তু সরকার ছিলেন নির্বিকার। অধ্যাপক সমর গুহ, শ্রীঅমিয় বসু প্রমুখ কয়েকজন এম. পি.-র উদ্যোগে 1968 সালে সংসদের 350 জন এম. পি. রাষ্ট্রপতিকে এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন এবং শাহ্‌নওয়াজ কমিটির রিপোর্ট যে দেশবাসী মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি সেই পুরাতন সত্যকে পুনর্বার জানিয়ে একটি নতুন কমিশন গঠনের দাবি পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সচিব সেই স্মারকলিপির প্রথম স্বাক্ষরকারী অধ্যাপক গুহকে 24.5.68 তারিখে জানিয়েছিলেন, "নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আবার তদন্তের যে দাবি করা হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের মনোভাব স্পষ্টভাবেই 1968 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংসদে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকের সন্দেহ দূর করার জন্য বাইশ বছর পর তদন্ত করে নতুন আর কী তথ্য পাওয়া যাবে?" অর্থাৎ এতাবৎকাল ভারত সরকার যা বলে এসেছেন রাষ্ট্রপতিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন।

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, 1952 সালের পাঁচই মার্চ সংসদে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলরাল দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যু সম্বন্ধে কোন তদন্ত করা হবে না এবং তারপর তাঁর সেই সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বেই তিনি বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত, বামপন্থী দলগুলি কলকাতার মনুমেন্টের তলায় লক্ষ লোকের সমাবেশে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে সে সময় সাধারণ নির্বাচন ছিল প্রত্যাসন্ন।

এবারও, এই 1970 সালেও প্রায় অনুরূপ একটি রাজনৈতিক কারণে সরকার পূর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করে কমিশন গঠন করেছেন বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা শ্রীখগেন দে সরকার বলেছেন, (আনন্দবাজার, 16.10.70) "দ্বিতীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি তদন্তের দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) কয়েকজন

রাজনৈতিক নেতাকে কথাই দিয়েছিলেন। গত বছরে উত্তেজনাপূর্ণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনকয়েক তখনও বাকি।"

সে যাই হোক, এবার আর অনুসন্ধান কমিটি নয়, পুরোপুরি কমিশন। এবার তার কর্ণধার সরকারের বশম্বদ কোন কর্মচারী নন, হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাই আমরা সর্বান্তকরণে আশা করব—এই সুযোগে দেশবাসী তাদের প্রিয় নেতার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে। দেশবাসী এজন্য সকৃতজ্ঞচিত্তে অধ্যাপক সমর গুহ, শ্রীঅমিয় বসু প্রমুখ ঐ 350 জন সংসদ সদস্যকে অকুণ্ঠ ভাষায় ধন্যবাদ জানাবে।

✡ ✡ ✡

তবু এ পর্যন্ত যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি তার ওপর ভিত্তি করে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি?

প্রথমত বলব, নেতাজী যে একেবারে শেষ পর্যায়ে কতিপয় উচ্চপর্যায়ের জাপানী জঙ্গী অফিসারের সহায়তায় এবং জাপান সরকারের জ্ঞাতসারে মাঞ্চুরিয়ার দিকে আত্মগোপনের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য। এ তথ্যটি আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করেননি। শাহ্‌নওয়াজ কমিটির সভ্যদ্বয়, জওয়াহরলাল প্রভৃতি যাঁরা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, তাইহকুতে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তাঁরাও বিনা প্রতিবাদে এ তথ্যটা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে এটা আমাদের এক নম্বর অভ্যুপগম বা হাইপথেসিস্।

দ্বিতীয়ত বলব, নেতাজীর ঐ আত্মগোপনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নতুন ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নবোদ্যমে শুরু করা, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোন প্রশ্ন তাঁকে আদৌ প্রভাবিত করেনি। এ তথ্যটা হাইপথেসিস্ নয়, 'অ্যাক্সম' পর্যায়ের—স্বতঃসিদ্ধ। এটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ত মেনে নিতে হবে মন্ত্রগুপ্তিতে নেতাজী ছিলেন স্বভাবত সিদ্ধপুরুষ। তাঁর আসন্ন গোপন পদক্ষেপের পূর্ণস্বরূপ অপ্রয়োজনে তিনি কাউকে বলে যেতেন না। এ-ক্ষেত্রেও বলে যাননি। জানি না, হয়তো এ-ক্ষেত্রে কর্নেল হবিবর রহমান তার একমাত্র ব্যতিক্রম। নেতাজীর এই মন্ত্রগুপ্তির কথাটি আমরা আগেই প্রতিষ্ঠা করেছি, নেতাজীর '41 সালের গৃহত্যাগের প্রসঙ্গে, কিয়েল বন্দর থেকে ডুবোজাহাজে রওনা হবার স্মৃতিচারণে।

ঐ তিনটি তথ্যকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য, এবং তাই অনিবার্যভাবে আর একটি তথ্যকে মেনে নিতে হবে। সেটি নিম্নোক্তরূপ—

জাপান সরকার যে মুহূর্তে নেতাজীর আত্মগোপনে সাহায্য করতে স্বীকৃত হল সেই মুহূর্তেই সে নিশ্চয়ই একটি কৈফিয়ৎ খাড়া করে রাখে। সে জানত — এক সপ্তাহের মধ্যে মিত্রপক্ষের বিজয়ী-বাহিনীর কাছে তাকে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাদের

কৈফিয়ৎ দিতে হবে — সহযোগী রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে। জাপান কিছুতেই বলতে পারে না যে বেতারে আত্মসমর্পণ-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পরে সে ইঙ্গো-মার্কিন ব্লকের এক নম্বর শত্রু সুভাষ বসুকে মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যেতে সাহায্য করেছে। এ সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই আসছি আমরা — নিতান্ত লজিক্যাল কনক্লুশন। ফলে, জাপান সরকার নিশ্চয়ই নেতাজীর মৃত্যুর কথা রটনা করতে একটা পরিকল্পনা করেছিলেন।

নেতাজী যেহেতু সহস্র লোকের জ্ঞাতসারে সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙ্কক বিমানবন্দর থেকে উড়োজাহাজে করে যথাক্রমে ষোলই এবং সতেরই অগাস্ট নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হয়েছিলেন, সুতরাং সবচেয়ে সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ হবে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘোষণা। জাপান সরকারের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণও 'লজিক্যাল কনক্লুশন' — যুক্তিনির্ভর অনুসিদ্ধান্ত।

আমরা জেনেছি, জাপান সরকারের তরফে ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি এবং সম্ভবত হাচাইয়া ও ইসোডা সাইগঙে এ পরিকল্পনা নেতাজীর সঙ্গে যুক্তি করে তৈরি করেন। কারণ এ ছাড়া উচ্চপর্যায়ের অন্য কোন জাপানী অফিসারের সঙ্গে নেতাজী যোগাযোগ করতে পারেননি, এ তথ্য আমরা জেনেছি। ফলে এই চূড়ান্ত গোপন পরিকল্পনার কথা জানতেন—নিশ্চিতভাবে নেতাজী ও ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি এবং সম্ভবত হাচাইয়া, ইসোডা এবং কর্নেল রহমান।

কিন্তু পরিকল্পনাটি কী ছিল? কোথায় বিমান দুর্ঘটনা হবে? কে-কে মারা যাবেন? কে-কে জীবিত থাকবেন? কোথায় নেতাজীর তথাকথিত মৃতদেহ দাহ করা হবে?

বেশ বোঝা যায়, সাইগঙের সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে অত্যল্প সময়ের ভিতর এই পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্ত এবং বিস্তারিত রূপ দেবার অবকাশ নেতাজী পাননি। ইতিপূর্বে দু'বার তিনি প্রায় একইভাবে আত্মগোপন করে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছেন, কিন্তু সেই দুবারই তিনি বিস্তারিত নির্দেশ রেখে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, যে-সুযোগ এবার তিনি পাননি। তা না পান, কিন্তু কুশাগ্রবুদ্ধি সুভাষচন্দ্র ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অন্তত এটুকু অনুধাবন করেছিলেন যে :

(i) তাঁর এবারকার বিমান দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু পৃথিবী সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না—বিশেষ করে ইঙ্গো-মার্কিন ব্লক। ঠিক যে মুহূর্তে তাঁর আত্মগোপনের চূড়ান্ত প্রয়োজন, সেই মুহূর্তেই এমন কাকতালীয় দুর্ঘটনা তাঁর চিরশত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই সহজে মেনে নেবে না, যদি না দুর্ঘটনাটিকে রীতিমত বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া যায়।

(ii) দ্বিতীয়ত তিনি জানতেন যে, মাঞ্চুরিয়ার অজানা রণভূমিতে পৌঁছে নূতন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে, রুশ-সরকারের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে তাঁর স্বতই কিছু সময়

লাগবে। মাঞ্চুরিয়ায় তখনও যুদ্ধ চলছিল, ফলে তিনি পৌছানো মাত্র যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন না। এই অবস্থায় যদি ইঙ্গো-মার্কিন ব্লক তাঁর মৃত্যুর কথা অবিশ্বাস করে রুশ-সরকারের কাছে তাঁর গ্রেপ্তারের দাবি জানায়, অথবা সেখানে যদি গোয়েন্দা পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে তবে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই বানচাল হয়ে যাবে।

উপরোক্ত দুটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে নেতাজী নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যাতে তাঁর মৃত্যু-রটনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। আমাদের উপরোক্ত অনুমান দুটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, নেতাজী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—

1. যাত্রীসমেত বিমান সমুদ্রে পড়বে না, পড়লে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেটি ভেঙে পড়বে লোকালয়ে। এমন লোকালয়ে যেখানে শুধু জাপানী সামরিক অফিসাররাই তার প্রত্যক্ষদর্শী হবে—অপরিচিত সাধারণ মানুষের যেখানে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

তাইহকু বিমানবন্দর এমন একটি স্থান।

2. নেতাজীর মৃত্যুর অন্তত একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভারতীয় সাক্ষী থাকবে।

3. তথাকথিত মৃতদেহ দাহের সময়ে বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকবে।

4. যেহেতু তাইহকু বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা ঘটবে, তাই নেতাজীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কিছু কিছু উদ্ধার করা যাবে।

আমাদের উপরোক্ত এক নম্বরের অনুমান যে যুক্তিনির্ভর তার প্রমাণ শ্রী এস. এ. আইয়ারের স্মৃতিকথা। এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পারি শ্রী এস. এ . আইয়ার — যিনি শ্রবণমাত্র মনে করেছিলেন বিমান দুর্ঘটনা একটা নিছক মিথ্যা রটনা — তিনি কিভাবে এটা মেনে নিলেন। কী যুক্তিতে, কী বিশ্লেষণে।

'হঠাৎ মনে হল প্লেনটা নিচের দিকে নামছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা পাঁচটা। বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করল উড়োজাহাজ। আমরা সবাই নেমে পড়ি। এ কোথায় এলাম? শুনলাম, ক্যান্টন বিমান-ঘাঁটি। ক্যান্টন! চীন-গণতন্ত্রের জনক সান-ইয়াৎ-সেনের কর্মক্ষেত্র! আমাকে নিয়ে কর্নেল টি. একটি করোগেট-টিনের ছাউনিতে বসালেন। সেটা যেন আগুনের ফার্নেস। আমি এককোণায় চুপ করে বসে রইলাম। এতক্ষণে টি. নেতাজীর প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললেন এবং সেটা ক্যাপ্টেন আয়োগি অনুবাদ করে শোনালেন।

" কর্নেল টি. আমাকে কী বললেন তা জানবার আগে একটা কথা বলে নিই।

"সত্যি কথা বলতে কি আমি রিয়ার অ্যাডমিরালের ঐ চরমতম দুসংবাদটা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি। প্রথমটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম; কিন্তু সমস্তটা দিন এ নিয়ে চিন্তা করতে আমার মনে হয়েছে এটা বোধ হয় একটা জাপানী প্রচার। নেতাজীর স্বার্থেই এ আষাঢ়ে গল্প জাপানীরা প্রচার করেছে। মিত্র বাহিনীর কাছে ওদের তো একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এ তারই ভূমিকা।

"ক্যান্টন বিমান-বন্দরে পৌঁছে কর্নেল টি. এতক্ষণে বললেন আপনাকে খুলেই বলি—আপনি জানেন, — সতেরোই সন্ধ্যাবেলা নেতাজী সাইগঙ থেকে যাত্রা করেন। ওঁর বিমানটি সে রাত্রেই তুরেনে পৌঁছায়। রাতটা সেখানেই অতিবাহিত করেন। পরদিন অর্থাৎ আঠারই সকালে ওখান থেকে যাত্রা করেন এবং বিকাল নাগাদ ফরমোসা দ্বীপের তাইহকুতে পৌঁছান। অল্পক্ষণ পরেই প্লেনে পেট্রোল ভরে নিয়ে ওঁরা আবার রওনা হন; তার কয়েক মিনিট পরেই প্লেনটা ভেঙে পরে। তাতেই নেতাজী—

" আমি প্রশ্ন করলাম প্লেনটা নিশ্চয় সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে?

"এটা একটা টোপ। আমি আশা করছিলাম, জবাবে উনি বলেবেন—হ্যাঁ—কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর এ-কথা শুনলেই স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস পড়বে আমার, বুঝব সবটাই বানানো গল্প। নেতাজী নিশ্চয়ই মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে গেছেন, তারই জন্য এ আষাঢ়ে গল্প।

"দুর্ভাগ্য আমার। জবাবে উনি বললেন, না সমুদ্রে পড়েনি। প্লেনটা এরোড্রমের অদূরে মাটিতেই ভেঙে পড়ে। নেতাজী আর হবিব দু'জনেই আহত হন। নেতাজীর আঘাতটা খুব বেশী। জেনারেল শীদেয়ী ঘটনাস্থলেই মারা যান। নেতাজী আর হবিবকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাদের মেডিক্যাল অফিসার যথাসাধ্য করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। নেতাজীর শেষ পর্যন্ত.....

"আবার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, হবিবও কি মারা গেছে?

"আবার একটা 'লীডিং কোশ্চেন'। আবার আশা করছিলাম উনি বলবেন, হ্যাঁ, কর্নেল হবিবর রহমানও মারা গেছেন। ওঁরা বাধ্য হয়ে দু'টি দেহই সৎকার করে ফেলেছেন।

"কিন্তু না। এবার আমাকে হতাশ হতে হল। জবাবে উনি বললেন, না হবিব বেঁচে আছেন। তাঁর আঘাত অতটা গুরুতর নয়।

"এতক্ষণে আমার মনে প্রথম উদয় হল, তবে তো এটা রটনা নয়। মিথ্যা রটনা হলে প্লেনটা সমুদ্রে পড়ত, অন্তত হবিব ভাইও মারা যেত। এইবার আমার হাত-পা অবশ হয়ে এল।"

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, দুর্ঘটনার চূড়ান্ত রূপায়ণ না করতে পারলেও উপরোক্ত চারটি মোদ্দা কথা নেতাজীই স্থির করে যান। যার ফলে স্থির হয়—

(i) বিমান দুর্ঘটনা হবে তাইহকুতে—বিমানবন্দরের মিলিটারি এলাকার চৌহদ্দিতে। তাইহকুতে দুর্ঘটনা ঘটলে জাপান সরকারকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কোনভাবেই প্রমাণ হবে না যে, জাপান সরকার নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যেতে সাহায্য করেছিল—যেহেতু তাইহকু বিমানবন্দর সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাবার পথে পড়ে এবং সেখানে পেট্রোল নিতে সচরাচর বিমান অবতরণ করত।

(ii) নেতাজীর একমাত্র ভারতীয় সহযাত্রী কর্নেল হবিবর রহমানকে জীবিতাবস্থায় সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যেতে হবে, মৃত্যুসংবাদ বহন করে — প্রধান সাক্ষী হিসাবে।

(iii) তাইহকুতে নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু হলে তাইহকুর হেড-কোয়ার্টার্স থেকে টোকিওতে সে বার্তা জানানো হবে। টোকিও থেকে নির্দেশ যাবে মৃতদেহ টোকিওতে পাঠিয়ে দিতে। সেখানে একটি গলিত অগ্নিদগ্ধ শব মহাসমারোহে দাহ করা হবে।

(iv) কর্নেল রহমানের কাছে নেতাজীর ব্যক্তিগত সম্পদ — যার কথা বহু লোক জেনে ফেলেছে—তা কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

✡ ✡ ✡

যে চিন্তাধারা নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি তা যদি বাস্তব হয় এবং যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক — তা'হলে আমাদের এই পর্যায়ে একটি কথা ভেবে দেখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নেতাজী অন্তর্ধান করলে তারপর তাইহকুতে পরবর্তী কার্যক্রম কীভাবে রূপায়িত হবার ব্যবস্থা করে গেলেন ওঁরা? তাইহকু বিমান-বন্দরের কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত এ পরিকল্পনার কথা কিছুই জানেন না। নেতাজী এবং হবিবর দোভাষী ছাড়া তাইহকু বিমানবন্দরে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিতে পারেন না। তা'ছাড়া তাঁদের নির্দেশ তাইহকুর জঙ্গী অফিসারেরা মানবেনই বা কেন? অপরপক্ষে ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি, হাচাইয়া বা ইসোডা তাইহকুতে যাননি — বিস্তারিত লিখিত নির্দেশ দেবার সময়ও ছিল না, বোধ করি তাতে তাঁরা রাজিও হতেন না। (আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, শ্রী এ. এন. সরকারকে সংবাদবাহক হিসাবে সিঙ্গাপুরে এসে নেতাজীকে মৌখিক জানাতে হয়েছিল যে, জাপান সরকার তাঁর আত্মগোপনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে।) এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই যে লে. জেনারেল শীদেয়ী সর্বময় কর্তা কাউন্ট তেরাউচির আদেশমত তাইহকু কর্তৃপক্ষকে যাবতীয় মৌখিক নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। লে. জেনারেল শীদেয়ী জার্মান ভাষা জানতেন এ প্রমাণ পেয়েছি, ফলে নেতাজী অনায়াসেই তাঁকে দোভাষী হিসাবে ব্যবহার করে তাইহকু বিমান বন্দরের অফিসারদের মৌখিক নির্দেশ দিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

✡ ✡ ✡

এই ঘটনা পরম্পরা যদি আপনাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয় তা'হলে সমস্ত অমীমাংসিত গলদের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করি—

(ক) নেতাজীর চতুষ্কোণ হাতঘড়ি কর্নেল রহমানের অধিকারে আসার কারণ খুঁজে পাই।

(খ) নেতাজীর সঙ্গে জে. শীদেয়ী, পাইলট, কো-পাইলট, রেডিও অপারেটর — যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া নেতাজীর অন্তর্ধান সম্ভবপর হত না — তাঁদের মৃতদেহের

সন্ধান না পাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝতে পারি।

(গ) তাইহকু থেকে যে বিভ্রান্তিকর তারবার্তাটি গোয়েন্দা বিভাগ আবিষ্কার করেছিল — যাতে বলা হয়েছিল, যে নেতাজীর মৃতদেহ বিমানে টোকিও প্রেরিত হয়েছে — তার বিভ্রান্তির নিরসন হয়।

(ঘ) নেতাজীর তথাকথিত মৃতদেহ দাহের তারিখটা কর্নেল রহমান মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর কেমন করে ভুলে গেলেন তার কারণ পাই।

(আমরা ধরে নিচ্ছি, মূল পরিকল্পনায় স্থির হয়েছিল নেতাজীর মরদেহ টোকিওতে দাহ করা হবে; কিন্তু অকুপেশন আর্মি টোকিওতে আশঙ্কাতীতভাবে দ্রুত উপনীত হওয়ায় টোকিওর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাইহকুতেই সেই তথাকথিত দাহকার্যের আদেশ দেন। ফলে কর্নেল রহমান নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী দাহের দিন স্থির করতে যান-- যে তারিখটি পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় তিনি পরে বদলাতে বাধ্য হন।)

(ঙ) জেনারেল আন্ডো ও ইসায়ামা কেন নেতাজীর তথাকথিত মৃতদেহের প্রতি সৌজন্যসূচক আচরণ করতে ভুলে যান তার অর্থ বুঝি।

(চ) কর্নেল রহমানের ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় 'আর্ন'-এর সম্মুখে বসে ফটো তোলার কারণ বোঝা যায়। (অন্য সাক্ষীরা যে ভবিষ্যতে কাঠের বাক্সের কথা বলবেন তা তিনি কেমন করে জানবেন?)

(ছ) চিতাভস্ম তাইহকু থেকে টোকিও নিয়ে যাবার বর্ণনায় বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীতে যে মৌল অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছিল তার যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়।

(জ) রাষ্ট্রপতি ভবনে বর্তমানে নেতাজীর যেসব ব্যক্তিগত দ্রব্য সংরক্ষিত আছে সেগুলি কিভাবে এসেছে তা বোঝা যায়।

যে চিন্তাধারা নিয়ে আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি, সেই সূত্র ধরে যদিও আরও অগ্রসর হই তা'হলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে নেতাজী কোন পর্যায়ে অন্য সহযাত্রীদের ত্যাগ করে শীদেয়ী সমেত মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যান।

সাইগঙ থেকে বিমানপথে তুরেনের দূরত্ব প্রায় তিনশত মাইল। সাইগঙ থেকে ওঁরা যে সন্ধ্যা পাঁচটায় রওনা হন তার সন্দেহাতীত প্রমাণ এবং একাধিক ভারতীয় সাক্ষী আছে। ফলে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে বিমানটি নিশ্চয়ই তুরেনের বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল। আমরা জানি, বিমানেই তাঁরা বেতারযোগে সংবাদ পেয়েছিলেন যে মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ান বাহিনী অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে এবং পোর্ট আর্থারের পতন আসন্ন (পরদিন প্রভাতে পোর্ট আর্থারের হাত বদল হয়)। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে সে সময় প্রতিটি মিনিট ছিল অত্যন্ত মূল্যবান।

নেতাজীর সমস্ত পরিকল্পনাটির সাফল্য তখন নির্ভর করছিল নেতাজীর আশু

মাঞ্চুরিয়া গমনে। সময়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়ে ছুটছিলেন। এ অবস্থায় সন্ধ্যা ছ'টায় তিনি হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেবেন এমন সিদ্ধান্ত করায় আমাদের ভুল হবে। সেটা নেতাজীর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই আশা করছি, খুব সম্ভব তুরেনে অন্য যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে, প্লেন বদল করে, অন্য একটি বিমানে লে. জেনারেল শিদেয়ী সহ নেতাজী তৎক্ষণাৎ তাইহকুর দিকে যাত্রা করেন। এ কার্যে তাঁকে বিমান চালনায় সাহায্য করেন পাইলট, কো-পাইলট, রেডিও অপারেটার এবং গানম্যান, যথাক্রমে তাকিজাওয়া, আইয়োয়াগি, তোমিনাগা ও অনামা গানম্যানটি। এইজন্যই হয়তো তুরেনে নেতাজীর রাত্রিবাসের কোন সাক্ষী এবং প্রমাণ অনুসন্ধান কমিটি খুঁজে পাননি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় রওনা হলে সেই রাত্রেই (17.8.45) রাত দশটার মধ্যে তাঁরা তাইহকুর বিমানবন্দরে উপনীত হন। ওঁরা নিশ্চয়ই তাইহকুর সবচেয়ে বড় হোটেল—প্রেসিডেন্ট হোটেলে, অথবা রেলওয়ে হোটেলে (ইতিপূর্বে নেতাজী একবার এখানে উঠেছিলেন বলে প্রমাণ পেয়েছি।) ওঠেননি। কারণ আত্মগোপনের পর্যায় তখন তাঁর শুরু হয়ে গেছে ফলে বিমানবন্দরে কোন 'বিলেটে' হয়তো তাঁরা রাতটা কাটান। জার্মান ভাষাবিদ জে. শিদেয়ীর মাধ্যমে নেতাজী তাইহকু বিমানবন্দরে বিশ্বাসভাজন দু-একজনকে পরিকল্পনায় তাঁদের কী ভূমিকা নিতে হবে তা বুঝিয়ে বলেন। তাঁদের বলা হয়, পরদিন (18.8.45) বেলা এগারোটা-বারোটা নাগাদ একটি 97-2 স্যালি বম্বার প্লেনে কয়েকজন জাপানী অফিসার আসবেন, তাঁদের সঙ্গে থাকবেন একজন ভারতীয় — নেতাজীর অ্যাডজুট্যান্ট কর্নেল হবিবর রহমান। সেই বিমানটিকে রানওয়ের কাছেই অগ্নিদগ্ধ করতে হবে এবং প্রচার করতে হবে ঐ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী ও কর্নেল রহমান আহত হয়েছেন। তারপর টোকিও ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্সে তারবার্তা পাঠাতে হবে যে, মধ্যরাত্রে হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। এর প্রত্যুত্তরে টোকিও থেকে তৎক্ষণাৎ তারবার্তায় আদেশ আসবে 'মৃতদেহ বিমানযোগে টোকিওতে পাঠিয়ে দাও।' তখন আর একটি তারবার্তায় জানাতে হবে, 'বিমানযোগে মৃতদেহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এই নির্দেশ দিয়ে সম্ভবত লে. জে. শিদেয়ী সহ নেতাজী ঐ কয়জন বিমানযাত্রীর সাহায্যে 18.8.45 তারিখে সকাল সাতটা নাগাদ তাইহকু বিমানবন্দর ত্যাগ করে দাইরেনের দিকে যাত্রা করেন। পাঠক এই পর্যায়ে আর একবার বম্বার মেকানিক শ্রীসাতো কাজোর (সাক্ষী নং 40) জবানবন্দীটি লক্ষ্য করে দেখতে পারেন। শ্রীকাজো ঐদিন সকালে তাইহকু বিমানবন্দরে কার্যরত ছিলেন — তিনি একজন স্বতঃপ্রণোদিত সাক্ষী, অর্থাৎ জাপান সরকারের মাধ্যমে সাক্ষী দিতে আসেননি। তিনি যা জানেন তাই শাহনওয়াজ কমিটিকে জানাতে এসেছিলেন সংবাদপত্রের বিবৃতি পড়ে। তিনি বলেছিলেন, আঠারই অগাস্ট সকাল সাতটায় তিনি একজন জাপানী জঙ্গী অফিসার এবং

একজন অ-জাপানী যাত্রীকে একটি প্লেনের যাত্রী-হিসাবে দেখেন। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি অবিকল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রধান চন্দ্র বোসের মত দখতে। পরে একজন নাকি শ্রীকাজোকে বলেন উনি চন্দ্র বোসই।

এই পর্যায়ে সম্ভবত আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন — এই যদি সত্য ঘটনা, তাহলে অন্য বিমানযাত্রীদের আঘাত কেমন করে হল? মেজর কোনোর হাত দুটি কেমন করে পুড়ে গেল? কর্নেল রহমানের আঘাতচিহ্নের কারণ কী?

আমি প্রতিপ্রশ্ন করব, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার যাত্রী কে কে ছিলেন তা আপনারা কেমন করে জানলেন? ঐ তথ্যটির মূল উৎস কোথায়?

তার জবাব, জাপান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রক তাঁদের হাজির করেছিলেন। শাহ্নওয়াজ কমিটি স্বীকৃত তেরো অথবা চৌদ্দজন বিমানযাত্রীর ভিতর কর্নেল রহমান ছাড়া ছ'জন জাপানী দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান। কমিটি তার ভিতর সার্জেন্ট ওকিস্তা ছাড়া (যদিও তিনি 1956-এ জাপানেই ছিলেন) বাকি পাঁচজনের সন্ধান পান। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এই পাঁচজনের কেউই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি দেখে সরাসরি সাড়া দেননি। জাপান সরকার তাদের পাঁচজনকে কমিটির সামনে হাজির করেছিল। সুতরাং ঐ বিমানযাত্রীদের অস্তিত্বের মূল উৎস জাপান সরকার — আমাদের বর্তমান থিয়োরী মতে যে জাপান সরকার এ ষড়যন্ত্রের অন্যতম নিয়ামক। সাইগঙ থেকে বিমানটি যখন যাত্রা করে তখন নেতাজী ও কর্নেল রহমান ছাড়া পাঁচজন ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রী দেবনাথ দাশ, গুলজারা সিং, প্রীতম সিং, আবিদ হাসান এবং এস. এ. আইয়ার। এঁদের মধ্যে কেউই বিমানযাত্রীদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন বলে শুনিনি। একমাত্র শ্রীআইয়ার বলেছেন, লে. জে. শিদেয়ী যে নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন তা তাঁর জানা ছিল (বর্তমান কমিশন যদি ঐ পাঁচজনের কাছ থেকে এই প্রশ্নটির জবাব জানতে চায় তা'হলে একটা প্রকাণ্ড সূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে।) ফলে একমাত্র জাপান-সরকার প্রদত্ত নথি ছাড়া এবং জাপান সরকারের হাজির করা সাক্ষীদের জবানবন্দি ছাড়া আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই যে, কর্নেল সাকাই ও নোনাগাকি, মেজর কোনো ও তাকাহাসি এবং ক্যাপ্টেন আরাই সত্যই 18.8.45 তারিখে তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন।

ভাষান্তরে বলা যায়, জাপান সরকার নেতাজীর সঙ্গে এবং নেতাজীরই স্বার্থে যে ষড়যন্ত্র করেছিল তারই মর্যাদা রক্ষার্থে হয়তো ঐ কয়জন সাক্ষীকে খাড়া করা হয়েছে — হয়তো মেজর কোনোর হাত দু'টি দগ্ধ হয়েছিল অন্য কোনও স্থানে। হাসপাতাল রেকর্ডে এই সব রোগীর নাম নেই। নেতাজীর তথাকথিত মৃতদেহ (হোক তা কফিনে আবদ্ধ) ঘিরে এই কয়জন কোন গ্রুপ ফটো তোলেননি। অর্থাৎ সাক্ষীদের নিজস্ব জবানবন্দী ছাড়া তাঁদের একজনও যে 1944 সালের অগাস্ট মাসে তাইহকুতে উপস্থিত ছিলেন তার কোন

প্রমাণ নেই। তাইহকু হাসপাতালের, চিকিৎসা ব্যবস্থার, মৃতদেহের সৎকারের বর্ণনায় তাঁদের জবানবন্দিতে যথেষ্ট বৈপরীত্য। বিমান দুর্ঘটনার বর্ণনায় — বিশেষ করে নেতাজীর দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের জবানবন্দিতে আশমান-জমিন ফারাক।

সবচেয়ে মজার কথা, কে কবে কিভাবে জাপানে ফিরে আসেন সে কথা বলেননি। আরও লক্ষণীয়, শাহ্‌নওয়াজ কমিটি আটই মে থেকে নয়ই জুন একমাসকাল ধরে টোকিওতে অনুসন্ধান চালালেন — সে সংবাদ বারে বারে দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হল—কমিটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শীদের আহ্বান জানালেন, অথচ সার্জেন্ট ওকিস্তা জাপানে উপস্থিত থেকেও সাড়া দিলেন না।

ফলে এঁদের জবানবন্দী ও আঘাতচিহ্নের ওপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে তা আপনারা দয়া করে বিবেচনা করবেন।

আর কর্নেল রহমানের আঘাত-চিহ্ন? তার জবাব তো আপনারা ইতোপূর্বেই শুনেছেন, নেতাজীর অপর একজন ভক্তের মুখে।

✡ ✡ ✡

এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে প্রতিটি বিভ্রান্তির সদুত্তর আমরা পেয়েছি; কিন্তু এবার আমাদের একটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হবে। এমনও তো হতে পারে, নেতাজী যেখানে, যেভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা রটনা করতে বলেছিলেন নিয়তির এক প্রচণ্ড পরিহাসে ঠিক সেখানেই সেইভাবেই বাস্তবে দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। কী বললেন? এ আমার উদ্ভট কল্পনা? এমন, কাকতালীয় ঘটনা বাস্তবে ঘটে না? না, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। নিয়ম মনে চলে না বলেই তা অ্যাকসিডেন্ট! ফলে এ সম্ভাবনাটিকেও আমরা তৌল করে দেখব—

মনে করি, সতেরই সন্ধ্যায় নেতাজী তুরেন থেকে কোন কারণবশত রওনা হতে পারেননি। আঠারই প্রত্যুষে তিনি রওনা হয়েছিলেন। পৃথক বিমানে নয়, ঐ 97-2 স্যালি বম্বারে। ফলে হয়তো তাঁর ইচ্ছা ছিল আঠারই মধ্যাহ্নে কর্নেল রহমান এবং অন্য যাত্রীদের তাইহকুতে রেখে তিনি শিদেয়ীকে নিয়ে মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যাবেন। ধরা যাক, ছোট্ট তুরেন বন্দরে তিনি উপযুক্ত দ্বিতীয় বিমান পাননি, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও সতেরই সন্ধ্যায় তুরেন ত্যাগ করতে পারেননি। আরও মনে করি, সেই প্রচেষ্টায় আঠারই মধ্যাহ্নে তাঁর সেই 97-2 স্যালি বিমানটি সত্য সত্যই তাইহকুতে দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

নিম্নলিখিত যুক্তির বিশ্লেষণে আমরা উপরোক্ত সম্ভাবনাকে অপ্রমাণ করতে পারি —

(i) সে ক্ষেত্রে নেতাজীর মৃতদেহ টোকিও পাঠিয়ে দেওয়া হত। কারণ, নেতাজীর সত্যি সত্যি মৃত্যু হলে তাইহকুর কর্তৃপক্ষ (যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, ঐ রাত্রেই মৃত্যুর মিথ্যা পরিকল্পনা হয়েছে, এবং বাস্তবে সেই ঘটনা ঘটাটা একটা প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর ব্যাপার) সম্ভবত ঐ দিনই প্লেনে একজন বিশ্বস্ত সংবাদবাহককে টোকিওতে পাঠিয়ে দিতেন

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে (কারণ টেলিগ্রাফে বিভ্রান্তির নিরসন হবে না—ঐ জাতীয় মিথ্যা টেলিগ্রাফ পাঠানোর পরিকল্পনাই ছিল।)

(ii) যদি ধরে নিই তাইহকুর কর্তৃপক্ষ এটুকু বুদ্ধির পরিচয় দেননি এবং টোকিও কর্তৃপক্ষ তাইহকু থেকে প্রেরিত তারবার্তাটিকে গুরুত্ব দেননি (অর্থাৎ তাঁরা মনে করেছিলেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী মিথ্যা তারবার্তাই পাঠানো হয়েছে।) তা'হলে তাইহকুর বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপারটা জেনারেল অ্যান্ডো ও ইসায়ামার গোচরে আনতেন এবং তাইহকুতেই যথোচিত মর্যাদায় তাঁর দাহকার্য সম্পন্ন করা হত।

(iii) বাস্তবে নেতাজীর মৃত্যু হলে দুর্ঘটনার বর্ণনায়, হাসপাতালের চিকিৎসায়, ক্রিমেটোরিয়ামে দাহকার্যে এবং চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দিতে ঐ জাতীয় বৈপরীত্য থাকত না।

(iv) কর্নেল রহমান বলতেন না—নেতাজীর মৃত্যুর পর ডাক্তার তাঁকে একটি চতুষ্কোণ ঘড়ি দিয়েছিলেন যাতে একটা বেজে ছয় মিনিট হয়েছে।

(v) নেতাজীর মৃতদেহের একাধিক ফটো থাকত। অন্তত চাদরে ঢাকা (জাপানীরা নাকি মৃত মানুষের ফটো তোলে না!) একটি মৃতদেহ ঘিরে সকল সহযাত্রীদের একটি ফটো থাকত।

(vi) নেতাজীর ডেথ-সার্টিফিকেটে তাঁর নাম-ধাম পরিচয় কোনক্রমেই বিকৃত হত না।

(vii) জেনারেল শিদেয়ীর মরণোত্তর সম্মানপ্রাপ্তিতে জাপান সরকার আপত্তি করত না।

(viii) সর্বোপরি, জাপান সরকার এই বিমান দুর্ঘটনার একটি তদন্ত করত।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আমি ধরে নিয়েছি যে, জাপানের কেন্দ্রীয় অফিস যখন টেলিগ্রাফ করেছিল (উনিশে সকালে) যে, নেতাজীর দেহ তাইহকুতে দাহ করা হোক, তখন জাপান কর্তৃপক্ষ ঘটনাচক্রে জানত না যে, নেতাজীর সত্য সত্যই মৃত্যু হয়েছে। তা যদি জানত, তাহলে নেতাজীর মরদেহ নিশ্চয়ই টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হত। ছোট মাপের একটি কফিন বানাতে সুদক্ষ জাপানী ছুতোরের দু'তিন ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, নিতান্ত নিয়তির পরিহাসে নেতাজীর পরিকল্পনার সঙ্গে হুবহু খাপ-খাওয়া কোন দুর্ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি। **Q.E.D**।

✡ ✡ ✡

আপনি যদি এ পর্যন্ত আমার যুক্তির বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে থাকেন, তা'হলে **আপনাকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসতে হবে—**

18.8.45-এ তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু হয়নি। তিনি লে. জেনারেল শিদেয়ীকে সঙ্গে করে ঐ সময় মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলে যান।

তারপর কী হল?

এরপর আমাদের চিন্তাধারাকে আমরা প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত করতে বাধ্য হব:

1. নেতাজী আজও (1970) জীবিত আছেন।

2. নেতাজী 18.8.45 তারিখের বিমান দুর্ঘটনায় মারা না গেলেও পরবর্তী কোন সময়ে মারা যান।

দু'টি বিকল্প সম্ভাবনাকে এবার বিশ্লেষণ করা যাক:

1. যদি ধরে নিই নেতাজী আজও (1970) জীবিত আছেন—

আপনারা যদি ঐ 'হাইপথেসিস্'টি দিয়ে আমাকে বিশ্লেষণ করতে বলেন তা'হলে আমি প্রথমেই আপনাদের সাবধান করে বলব, এ ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ড প্রতিপ্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আপনাদের; বলতে হবে — কেন তা'হলে নেতাজী এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করলেন না? 1945 সালে তাঁর বয়স ছিল আটচল্লিশ বছর, বর্তমান তাঁর বয়স তিয়াত্তর। নেতাজীর মতো একজন কর্মানুরাগী ব্যস্ত মানুষ কী কারণে সংক্ষিপ্ত মানবজীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বছর আত্মগোপন করে থাকবেন?

আমি তো ঐ কারণটিকে চারটি মাত্র বিকল্প সম্ভাবনায় বিভক্ত করতে পারছি — আধিভৌতিক কারণ, আধিদৈবিক কারণ, আধ্যাত্মিক কারণ এবং রাজনৈতিক কারণ। নেতাজী আজও জীবিত আছে এটা ধরে নিলে ঐ চারটি বিকল্প সম্ভাবনার একটিকে আপনাদের মেনে নিতেই হবে।

(ক) আধিভৌতিক কারণ: অর্থাৎ আত্মপ্রকাশে তাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে কিন্তু পার্থিব বাধায় তিনি আত্মপ্রকাশে অসমর্থ:

ড. সত্যনারায়ণ সিংহ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন নেতাজী সাইবেরিয়া অঞ্চলে—সম্ভবত ইয়াকুর্টস্ক্ বন্দিশিবিরের 45 নং সেলে আবদ্ধ আছেন (বা প্রবন্ধ রচনাকালে ছিলেন)। ড. সিংহ নাকি নানান গোপন সূত্রে এ-সংবাদ পেয়েছেন। বলেছেন, 1945 সালে সোভিয়েট রাশিয়া সফরকালে তিনি প্রবাসী বাঙালী শ্রীঅবনী মুখার্জির পুত্রের (রাশিয়ান স্ত্রী ফিটিংগফের পুত্র—গোগা) কাছে সংবাদ পান যে, শ্রীমুখার্জি এবং সুভাষচন্দ্র উভয়েই সাইবেরিয়ায় বন্দী আছেন। ড. সিংহ পরিবেশিত এই সংবাদটি নিম্নোক্তরূপ:

'গোগা বললেন—জ্ঞানের জগতের লোক বলে স্ট্যালিনের শুদ্ধিকরণে বাবা আত্মসমর্পণ করেননি। যুদ্ধের সময় সাইবেরিয়ায় কমিন্টার্নের নির্বাসিত বিদেশী হোমরাচোমরাদের মস্কোতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পাওয়া গেল পঞ্চাশের দশকে। বাবা সেইসব প্রত্যাগত বন্দীদের কাছে শুনলেন যে, সাইবেরিয়ার ইয়াকুর্টস্ক্ বন্দিশিবিরে তাঁরা একজন অতি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতাকে দেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নাকি বিশ্বযুদ্ধ চলা-কালে আমাদের (রাশিয়ানদের) শত্রু জার্মান ও জাপানীদের সাহায্য করেছেন। বাবার বুঝতে দেরি হল না যে, তিনি আর কেউ নন — স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি

প্রার্থনা করে বাবা স্ট্যালিনকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। আর সেই অপরাধেই বাবাকে স্ট্যালিন ফ্যাসিবাদী বলে চিহ্নিত করলেন। পত্রটি পাঠানোর পরের দিনই রুশ গোয়েন্দা পুলিস বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আজও তিনি ফেরেননি।"

ড. সিংহ পরে লিখেছেন, "ভারতে প্রত্যাবর্তন করে গোগার সঙ্গে অভাবনীয় সাক্ষাৎকার এবং নেতাজী সম্পর্কে তাঁর কাহিনী জানিয়ে জওয়াহরলালজীকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিলাম। জওয়াহরলালজীর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বুঝলাম যে তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চান না। এবং নেতাজীর প্রশ্নের পুনঃ অবতারণা করা তাঁর পছন্দ নয়।"

ড. সিংহ ব্যক্তিগত পত্র লিখেই ক্ষান্ত হননি। হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডের মতো বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এ অভিযোগের কথা দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। অভিযোগ মিথ্যা হলে ভারত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন।

ড. সিংহ তাঁর প্রবন্ধে আরও বলেছেন, "আমি গোগাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি নিশ্চিত জান যে, সুভাষবাবু ইয়াকুর্টস্ক্ বন্দিশিবিরে আছেন?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সমসাময়িক কমিন্টার্নের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ মাঝুত খুড়োকেও ট্রটস্কীপন্থী বলে ইয়াকুর্টস্ক্-এ পাঠানো হয়েছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি ফিরে এসেছেন। তিনিও বলেন যে — ইয়াকুর্টস্ক্-এর কেন্দ্রীয় বন্দিশিবের 45 নং সেলে সুভাষবাবুকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর আমার বাবা আছেন 57 নং সেলে।

— মাঝুত কোন্ সালে সুভাষবাবুকে ইয়াকুর্টস্ক্ কারাগারে দেখেছেন?

— 1950-51 সালে।

— তাঁর সম্পর্কে আর কোন খবর তোমার জানা আছে?

— না!"

শুধু তাই নয়, বতমান খোসলা কমিশনের কাছে ড. সিংহ বলেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের রাশিয়ায় বন্দী হয়ে থাকার কথা তিনি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকেও জানিয়েছিলেন — এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গেও অনেক আলোচনা হয়েছে। রাশিয়ার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও নাকি এ-কথা জানতেন। একবার তিনি নাকি সাংবাদিকদের কাছে এ কথার ইঙ্গিতও দেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, সে সময়ে এ নিয়ে আমরা আন্দোলন করতে পারিনি। নিষ্ক্রিয় কর্তাব্যক্তিদের বাধ্য করিনি এ সূত্রটি যাচাই করে দেখতে। প্রফেসর অবনী মুখার্জী একজন বিখ্যাত প্রবাসী বাঙালী। প্রফেসর মুখার্জী বন্দী আছেন কিনা জানা ছিল অনায়াস কর্ম। কেন সে আন্দোলন হয়নি তার বিচার করা এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু নয় — সেটা নিছক রাজনীতির পর্যায়ভুক্ত। শ্রী এস. এ. আইয়ার এ সম্ভাবনাকে তাঁর গ্রন্থে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন, — বলেছেন, "নেতাজীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখতে পারে এমন

শক্তি ত্রিভুবনে কারও নেই।"

আমরা তাঁর এ-যুক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। নেতাজী অসীম শক্তিধর, তাঁর কুশাগ্র বুদ্ধি ছিল, তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর — তবু একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি মরমানুষ, পঞ্চভূতে তৈরি তাঁর দেহ। পার্থিব বাধায় তাঁকে দৈহিক অবরোধ করে রাখার ক্ষমতা একাধিক রাষ্ট্রের ছিল ও আছে। বিশেষ করে যদি তারা বুঝতে পারে এ-জন্য ক্ষমতাসীন ভারত সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই।

এ সম্বন্ধে অনর্থক জল্পনা করে লাভ নেই। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নথিপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। আমরা শুধু আশা করব, বর্তমান কমিশন এ সম্ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৌল করে দেখবেন। আমরা বরং শুধু একথা বলে যেতে চাই যে, যেহেতু 18.8.45-এ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, তাই তাঁর এ জাতীয় পরিণতির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

(খ) আধিদৈবিক কারণ: অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনায় তাঁর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার অবলুপ্তি ঘটেছে, নিতান্তই নিয়তির পরিহাসে।

এমন হতে পারে অসুস্থতা নিবন্ধন (অথবা ঔষধ প্রয়োগে কৃত্রিমভাবে) তাঁর স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। তিনি এমন এক নির্জন স্থানে (আবদ্ধ) আছেন যেখানে সভ্য জগতের সংবাদ পৌঁছায় না। তিনি আত্মবিস্মৃত, ফলে যদিচ তিনি আজও জীবিত তবু তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন না। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছারই অবলুপ্তি ঘটেছে তাঁর।

(গ) আধ্যাত্মিক কারণ: অর্থাৎ তিনি আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে সজ্ঞানে অবলুপ্ত করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের অন্তরে অতি শৈশবকাল থেকে দ্বিবিধ চিন্তাধারা কাজ করে গেছে এ-কথা তাঁর লেখায়, বক্তৃতায়, আলোচনায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপকুমারের রচনায় আমরা জেনেছি। মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং জাগতিক বন্ধনকে অস্বীকার করে পরমপুরুষের সন্ধানে অভিযাত্রা — এই দ্বিবিধ লক্ষ্যে আকৈশোর সুভাষ-মানস ঘড়ির দোলকের মত দুলেছে। জ্যামিতির ভাষায় বলা যায়, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা একটি উপবৃত্তের আকারে রূপায়িত হয়েছিল। এককেন্দ্রিক বৃত্তের চিন্তাধারায় নয় — দুইটি কেন্দ্রের আকর্ষণে তাঁর 'ইলিপ্‌টিক' জীবন রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন অন্তরের অন্তঃস্তলে একজন সর্বত্যাগী মুমুক্ষু সন্ন্যাসী। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল একটি পকেট গীতা, এবং একগুড়া রুদ্রাক্ষের জপমালা।

এমন মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, 1945 সালে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন নূতন ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে নবীন উদ্যমে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন বলেই। তারপর হয়তো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার করে তাঁকে দু-চার বছর আত্মগোপন করেই থাকতে হয়। হয়তো সে সময় তিনি শরৎচন্দ্র, গান্ধীজী অথবা শ্রীথেবরের মতো ভারতীয়

নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও রক্ষা করে চলতেন। তারপর ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার পর হয়তো তিনি অনুভব করেন, তাঁর জাগতিক প্রয়োজন শেষ হয়েছে। হয়তো এই পর্যায়ে দু-কুড়ি-সাতের এ খেলাঘরকে পিছনে ফেলে তিনি তাঁর অন্তরের দ্বিতীয় আকর্ষণে মহাপ্রস্থানের নেপথ্যে একাকী যাত্রা করেন।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ যেমন শ্রীঅরবিন্দ হয়ে দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন স্বেচ্ছাবন্দীর জীবন মেনে নেন, তেমনি হিমালয়ের নিভৃতে এমন অসংখ্য সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা জাগতিক কোন সংবাদই রাখেন না। আপন সাধনায় তাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে একীকরণ করে আত্মনিমগ্ন হয়ে আছেন। আমাদের অতিপরিচিত সুভাষচন্দ্রও হয়তো তেমনি ধ্যাননিমগ্ন সাধক সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও বিরাজ করছেন। পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাস সে-ক্ষেত্রে তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। পাকিস্তান-আগত উদ্‌বাস্তু সমস্যা, চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ, ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যা, অন্নসমস্যা এবং সর্বোপরি স্বাধীন-ভারতের এই অস্তি এবং নাস্তিদলের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের সমস্যা তাঁর কাছে পৌঁছায় না—এ-সব কথা বিন্দু হয়ে, ছায়া হয়ে, মায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে। তিনি চৈতন্যময় এক পৃথক জগতের বাসিন্দা হয়ে আজও বেঁচে আছেন।

কয়েকজন অলৌকিক শক্তিধারী সাধক এমন ইঙ্গিত করেছেন।

(ঘ) রাজনৈতিক কারণ: অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে আছেন।

যাঁরা বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় তাঁর নাম আছে বলে তিনি আজও আত্মগোপন করে আছেন, তাঁদের কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর যেমন সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও আত্মহত্যা করতে পারেন না, সুভাষচন্দ্রও তেমন অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল বর্ণিত 'নন্দলালের' ভূমিকায় আত্মহত্যা করতে পারেন না!

যাঁরা বলেন, আত্মপ্রকাশের মহালগ্ন আজও আসেনি, এই সত্তরের দশকে আসবে—আমি অন্তত তাঁদের কথায় কোন যুক্তি খুঁজে পাইনা। বরং এ-কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, তাঁরা নিজেরাও ও-কথা বিশ্বাস করেন না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ও জাতীয় কথা বলে থাকেন। সে উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হতে পারে, আত্মপ্রচার হতে পারে বা অন্য কোনভাবে স্বার্থপ্রণোদিত হতে পারে। সুভাষচন্দ্রকে সুন্দরবনে বা রাজস্থানে, তিব্বত অথবা চীনে দেখেছি বললে খবরের কাগজে নিজের নাম ছাপা যায়—কিন্তু ও-ভাবে মানুষ প্রতিষ্ঠা পায় না। সে নাম মানুষে দু'দিনেই ভুলে যায়।

এই প্রসঙ্গে আবার বলি, শ্রী এস. এম. গোস্বামী তাঁর পুস্তিকায় তেত্রিশ পৃষ্ঠায় একটি ফটো ছাপিয়েছিলেন, তাতে পিছনের সারির তৃতীয় ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা সুভাষচন্দ্রের মত। শাহ্‌নওয়াজ কমিটি এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই সঙ্গে বলা যেতে পারে, এবং আশা করি আমাদের এ-বক্তব্যে কোন প্রগল্‌ভতা (flippancy) প্রকাশ করা হচ্ছে না যে সিনেমাতে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে উপস্থাপিত করতে হলে—যেমন ধরা যাক,

রামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ, তা অনায়াসেই করা যায়। এ চরিত্রে অভিনয় করার উপযুক্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে প্রযোজকের সামনে খাড়া করা হয়। কিন্তু পর্দায় যাঁকে আমরা দেখি তিনি আসলে অন্য একজন — সত্যিকারের স্বামী বিবেকানন্দ নন।''

জবাবে বলতে ইচ্ছ করে — তবু তো মানুষ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আলোকচিত্র দাখিল করে থাকে। এমনকি আপাদমস্তক ব্যান্ডেজ জড়ানো মানুষের ফটো রিপোর্টে ছাপিয়ে বলতে চায় — ইনি অমুক ব্যক্তি — চিতাভস্মের সম্মুখে বসে আছেন। এই এক নম্বর প্রমাণ! এমনকি কাপড়ে জড়ানো পুঁটলির ছবি ছেপেও যখন দু'নম্বর প্রমাণ দাখিল করতে চান তখন মনে রাখেন না, এটা 'flippancy'-র পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে।

তাই বর্তমান লেখক জাপান ভ্রমণকালে তাঁর দুটি সংগৃহীত আলোচকিত্র সাহস করে ছেপেছেন এ গ্রন্থের প্রারম্ভে। এ-দুটি আলোকচিত্রে সাদৃশ্য দেখছি শ্রীগোস্বামী পরিবেশিত আলোকচিত্রের চেয়েও বেশি। কোন্ সূত্রে এ চিত্র দু'টি পেয়েছি সে-কথা অবান্তর।

✡ ✡ ✡

2. যদি ধরে নেওয়া যায় তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলেও নেতাজী আজ জীবিত নেই—

তা'হলে আমাদের আবার কয়েকটি বিকল্প সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখতে হবে:

(ক) নেতাজীর সঙ্গে যে বিপুল ঐশ্বর্য ছিল তার লোভে তাইহকুতে তাঁকে হত্যা করা হয়—

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে শ্রীহারিন শাহ্ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন (3/86) , ঠিক এই জাতীয় একটি কথা তাঁকে 1946 সালে বলেছিলেন ড. ক কিং ইয়েন। কিন্তু ড. ইয়েন জাপানীদের বিপক্ষদলের লোক । তাই তাঁর পক্ষে এ জাতীয় কথা বলার একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। শ্রী হারিন শাহ্ ও বিষয়ে তাঁকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি। এবং তিনি অনেক মিথ্যা কথা সজ্ঞানে লিখেছেন; ফলে ঐ উক্তিটির উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত এ জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তা কর্নেল হবিবর রহমান এবং জাপান সরকারের জ্ঞাতসারে ছাড়া হতে পারে না। জাপান সরকারের কাছে এক-কোটি টাকার সম্পদ কিছুই নয় — তার চেয়ে বেশি সে নেতাজীকে যুদ্ধ চলাকালে দিতে চেয়েছে, নেতাজী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি বলেন, একটা কেলেঙ্কারি চাপা দিতে জাপান সব জেনেশুনেও চুপ করে ছিল, তা'হলে বলব, আমরা অত্যন্ত অন্যায় কথা বলছি। বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় এবং তার পরবর্তীকালে নেতাজীর প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যে সম্মান জাপান দেখিয়েছে তাতে কোনক্রমেই বলা চলে না যে, জ্ঞাতসারে জাপান এত বড় একটা অন্যায় — একটা হত্যা এবং লুণ্ঠন — গোপন করার চেষ্টা করবে। এ কথা চিন্তা করাও পাপ।

তৃতীয়ত, কর্নেল হবিবর রহমান নেতাজীর বিশ্বস্ততম সহকারীদের মধ্যে অন্যতম। নেতাজী স্বয়ং তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন। এ কথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না যে, কোন জাগতিক লোভের বশবর্তী হয়ে কর্নেল হবিবর রহমান এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা গোপন করে যাবেন। পাঠককে আমি এখানে বিশেষ করে এই কথাটা স্মরণ করতে বলব, যে নেতাজীর অন্য কোন বিশ্বস্ত জঙ্গী সহকর্মীর আচরণে যদি পরবর্তীকালে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়ে থাকে তা'হলে সেটা হয়েছে মানব চরিত্রের ক্রমাবনতির ফলে। দু-দশ বছর পরে নূতন প্রলোভনে, নূতন পরিবেশে, নূতন মনিবের নির্দেশে নূতন লোভী মানুষে পরিণত হওয়া এক — এবং দেশপ্রেমের উন্মাদনায় বাতাবরণে মুহূর্ত-মধ্যে দেশপ্রেমিক থেকে নররাক্ষসে পরিণত হওয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। রিয়াজ, মদন, সারওয়ার, দে প্রভৃতি যারা আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে—তারা তা করেছে নিতান্ত প্রাণভয়ে। তারাও হত্যা বা লুণ্ঠন করেনি।

এ সম্ভাবনাকে আমি তো কোনক্রমেই মেনে নিতে পারি না।

(খ) তাইহকু ত্যাগ করার পরে নূতন ভূখণ্ডে ঐ একই উদ্দেশ্যে নেতাজীকে হত্যা করা হয়—

এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেতাজী ও জেনারেল শিদেয়ী যদি মাঞ্চুরিয়াতে পৌঁছে থাকেন (18.8.45 তারিখে) তা'হলে সে সময়ে ঘোর যুদ্ধের মধ্যেই পৌঁছেছিলেন। জাপান সরকারীভাবে ইতিপূর্বে আত্মসমর্পণ ঘোষণা করলেও পুরাতন সংবাদপত্রে দেখছি বাইশ/তেইশ তারিখ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী ও রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। সেই-সময়ে অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত নেতাজী এবং জেনারেল শিদেয়ীর পক্ষে কোন গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া কোনক্রমেই অসম্ভব নয়। আর তা হয়ে থাকলে তাঁদের দু'জনের এবং নেতাজীর সম্পদের যে কোন হদিশ পাওয়া যাবে না একথা বলাই বাহুল্য। প্রতিশ্রুতিমতো জাপান ও কর্নেল রহমান সে ক্ষেত্রে নীরবই থাকবেন এবং নেতাজী-রহস্য চিরদিন সমাধানের অতীত হয়েই থাকবে।

(গ) অর্থলোভে নয়, অন্য উদ্দেশ্যে যদি নেতাজীকে হত্যা করা হয়ে থাকে—

দাইরেনে অথবা মাঞ্চুরিয়ার অন্য কোথাও উপস্থিত হবার পরে যদি নেতাজী ও শিদেয়ী ইঙ্গো-মার্কিন সেনানায়কদের হাতে পড়ে থাকেন, তা'হলে এমনও হতে পারে যে, নেতাজীর মৃত্যু ঘোষণার সুযোগ নিয়ে তারা ওঁদের দুজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কোন সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে এ জাতীয় ঘটনা ঘটা প্রায় অসম্ভব, কারণ সে ক্ষেত্রে ওঁদের দুজনকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করে আনাই স্বাভাবিক; কিন্তু অধস্তন কোন জঙ্গী অফিসারের অবিমৃষ্যকারিতায় যদি ও জাতীয় ঘটনা ঘটেই থাকে তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেটা গোপন করে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকতে পারেন।

দু'চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ বন্ধ করার মত টাকা তো নেতাজীর সঙ্গেই ছিল।

এ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে অবশ্য একটি যুক্তি আছে—এ জাতীয় ঘটনা ঘটে থাকলে ইঙ্গো-মার্কিন ব্লক দীর্ঘদিন ধরে নেতাজীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা চালাত না। জাপানের প্রচারিত সংবাদ বিশ্বাস করে তদন্ত-কার্য বন্ধ করে দিত। অনুসন্ধানকার্য যে আন্তরিকতার সঙ্গে এবং দীর্ঘদিন ধরে করা হয়েছে তার প্রমাণ রয়েছে। ফলে আমরা মেনে নিতে পারি না যে, ইঙ্গো-মার্কিন সমর-নায়কদের জ্ঞাতসারে এ ঘটনা ঘটেছে। অপরপক্ষে এমন মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, নেতাজী ও জেনারেল শিদেয়ীর পরিচয় পাওয়া মাত্র কোন অধস্তন জঙ্গী অফিসার তাঁদের হত্যা করে এবং নেতাজীর অতুল সম্পদ আত্মসাৎ করে বা কয়েকজনের মধ্যে বণ্টন করে সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দেয়। জাপান সরকার এবং ইঙ্গো-মার্কিন সেনানায়করা সে সংবাদ আদৌ পাননি।

✡ ✡ ✡

নেতাজীর শ্রাদ্ধ হয়নি। রেঙ্কোজী মন্দিরের একান্তে অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রমণ যে ভস্মাধারের সম্মুখে শতাব্দীর একপাদ কাল ধরে ধূপ জ্বালিয়ে আসছেন সে চিতাভস্মকে আমরা মাথায় করে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। আমাদের মনের দ্বিধা-সঙ্কোচ যে আজও ঘোচেনি। আমরা যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না — আমাদের এই দীন-দুখিনী বাঙলা মায়ের সেই দুরন্ত দামাল ছেলেটির অবশেষ ঐ একমুঠি ছাই! আমি যদি জাপানী ভাষা জানতাম, তবে এ গ্রন্থে সেই ভাষাতেই লিখে ওদের ডেকে বলতাম — 'ওগো, তোমরা শোন। তোমরা আমাদের ভুল বুঝো না। যে সম্মান তোমরা দুর্দিনে দেখিয়েছ আমাদের বাঙলা মায়ের দু-দুটি দামাল ছেলেকে, তার কথা আমরা ভুলিনি!' ডেকে বলতাম ঐ বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ শ্রমণকে — চিতাভস্ম সত্য হ'ক আর মিথ্যা হক, তুমি যে আমাদের প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে পঁচিশ বছর ধরে প্রতিটি সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলেছ, ধূপ জ্বেলেছ এ-জন্য রইলো আমাদের শ্রদ্ধানম্র প্রণাম তোমার উদ্দেশ্যে! কিন্তু তবু কিছুতেই আমরা মেনে নিতে পারছি না—অতবড় মানুষটার ঐটুকু অবশেষ!

আমাদের তুমি ক্ষমা কর।

✡ ✡ ✡

কিন্তু নেতাজীর শ্রাদ্ধ হয়নি এটাই তো শেষ কথা নয়। শ্রাদ্ধ যে আরও অনেকদূর গড়িয়ে রেখেছি আমরা। এর পরেও যে বলতে হবে—লালকেল্লার সম্মুখে নেতাজীর মূর্তি আজও নির্মিত হয়নি; বলতে হবে, নেতাজীর পূর্বসূরী রাসবিহারীর চিতাভস্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও এবং জওয়াহরলালের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তা ভারত সরকার ফিরিয়ে আনেনি, দেওয়ান-ই-আমের চত্বরে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অনামী শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ আজও স্থাপিত হয়নি। কেন হয়নি — আমার কাছে সে কথা জানতে চেয়েছিলেন রেঙ্কোজী মন্দিরের সেই চায়ের আসরে পাঁচজন বিদেশী মানুষ। কৈফিয়ৎ

নয়, কৌতূহল। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল, জবাব আমার মুখে জোগায়নি — চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। একবার মনে হয়েছিল বলি — আপনারা ভুল শুনেছেন, নেতাজীর ছবি স্বাধীন ভারতের সরকারী অফিসের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখার কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু সাহস করে কথাটা বলতে পারিনি, — বিদেশী তো, ওঁরা হয়তো আমার এ সহজ সরল ভাষা বুঝতেন না।

সক্রেটিসকে বিষপাত্র এনে দেওয়া হয়েছিল, যীশুখ্রীষ্টের মাথায় আমরা কাঁটার মুকুট পরিয়েছি, গ্যালেলিওকে নতজানু করেছি, গান্ধীজী বা লিংকনকে গুলি করেছি, জোন অফ আর্ককে জীবন্ত দগ্ধ করেছি—সে তুলনায় কী বা এমন অসম্মান দেখানো হয়েছে নেতাজীকে? স্বাধীন ভারতের সরকারী অফিসে তাঁর ছবি টাঙানোতে পর্যন্ত আমাদের জাতীয় সরকার কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি! (আনন্দবাজার, 27.8.1970)

এই সহজ সরল কথাগুলি রেভারেন্ড মোচিজুকিকে বুঝিয়ে বলে আসতে পারিনি। তিনি আমার ভাষা বুঝতেন না। তাই সে ক্ষেদ মেটালাম — আপনাদের কাছে সে কথা বলে। আপনারা ভুক্তভোগী! আপনারা বুঝবেন।

আমার সওয়াল আমি শেষ করলাম।

পাঠক! আপনিই আমার — "ফোরম্যান অফ্ দ্য জুরি!"

বলুন, আপনারা কি একমত?

বলুন—গিল্‌টি, না নট্-গিল্‌টি?

এবং গিল্‌টি হলে — কে? বা কারা?

সমাপ্ত (?)